জীবনকথা

'.....: মানব জীবনের মধ্যে যে অংশটুকু সর্বসুন্দর, সেই অংশটুকুতে মাত্র বহু লোকের সঙ্গে আমার কারবার। আমার ভবিষ্যৎ সম্পদের স্বার্থে মন্ডিত নহে, কিন্তু সুখের সজীব পত্রপুষ্পে, সমাচ্ছন্ন শান্তির প্রফুল্ল জ্যোৎস্নায় হাস্যময়, ...[১]

জীবনের এই চিরসুন্দর ও অমিত শান্তির পূজারী প্রভাত-কুমার। জীবজগতে আশা আছে, আছে হতাশা; দুঃখ আছে, আছে আনন্দের অনুপম ঐশ্বর্য্যানুভূতি। আনন্দ থেকেই এই বিশ্বের সৃষ্টি 'আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে'। কিন্তু জীবনের প্রকৃত রূপ অবিমিশ্র আনন্দ নয়, দুঃখ সুখের টানাপোড়নে গড়ে উঠে বাস্তব জীবন। জীবনে দুঃখ কারও কাম্য নয় অথচ দুঃখের অস্তিত্বকে অস্বীকার করারও উপায় নেই, তবুও মানুষের অনিষ্ট জীবনের আনন্দানুভূতি। জীবনদরদী প্রভাত-কুমার নিত্যদিনের মানুষের গুহাহিত ঈপ্সার সার্থক রূপকার, বিশেষ করে সেই মানুষ, যে সাংসারিক অভিঘাতে সর্বদা নতশির এবং তারাই প্রভাতকুমারের সমবেদনার বৃহত্তম অংশীদার।

(১)

২২শে মাঘ ১২৭৯ সালের মাঘী সপ্তমী তিথিতে (ইংরেজী ৪ ঠা ফেব্রুয়ারি ১৮৭৩) বর্দ্ধমান জেলার কালনার কাছে, পৈতৃক ভদ্রাসন ধাত্রীগ্রামে প্রভাতকুমারের জন্ম হয়। তাঁর পিতা ৺জয়গোপাল মুখোপাধ্যায় মাতা কাদম্বিনী দেবী। প্রভাতকুমার মাতাপিতার একমাত্র সন্তান।

৺জয় গোপাল মুখোপাধ্যায় তৎকালীন ইষ্ট ইন্ডিয়া রেলওয়েতে অল্প বেতনের কর্ম্মচারী ছিলেন। তিনি ছিলেন টেলিগ্রাফ অফিসের 'Signaller-in-charge'[২]। চাকুরীটি ছিল বদলীর। এই চাকুরীর সূত্রেই ৺জয়গোপাল মুখোপাধ্যায়কে বিহারের বিভিন্ন জায়গায় যেতে হয়েছে কখনও বাঁকা, দিলদারনগর কখনও বা জামালপুর। তিনি ছিলেন সরল-হৃদয়-মহাত্মা'[৩], উদারচেতা এবং সাহিত্য রসিক। মা কাদম্বিনী দেবী ছিলেন স্নেহশীলা এবং নিষ্ঠাবতী হিন্দু। প্রভাতকুমারের জন্মকালে কাদম্বিনী দেবীর বয়স ছিল তেইশ। অপেক্ষাকৃত অধিক বয়সে সন্তান হওয়ায় তাঁর মধ্যে অপত্যস্নেহ প্রবল হয়ে দেখা দেয়। একটি মাত্র সন্তান, প্রভাতকুমার স্বভাবতই মায়ের স্নেহ-আদর-যত্ন একটু বেশী পরিমানেই পেয়েছিলেন। এই অত্যধিক স্নেহপ্রাপ্তি প্রভাত-ব্যক্তিত্বকে কোমল করে গড়ে তোলায় সাহায্য করেছে। মাকে প্রভাতকুমার দেবতাজ্ঞানেই ভক্তি করতেন এবং মায়ের প্রতি এই অবিচল শ্রদ্ধা পরবর্তীকালে তাঁর ব্যক্তিগত এবং সাহিত্যিক জীবনকে বহুলাংশে প্রভাবিত করেছে।

প্রভাত সাহিত্যে যেখানে মায়ের চরিত্র রূপায়িত হয়েছে — পরোক্ষভাবে সেখানে কাদম্বিনী দেবীর চরিত্র মাধুর্য্য হয়েছে আদর্শ ।

প্রভাতকুমারের অতিশৈশবকাল অতিবাহিত হয়েছে ধাত্রীগ্রামে । শৈশবকাল থেকেই মা বাবার সঙ্গে বেশীরভাগ থেকেছেন রেলওয়ে কোয়ার্টারে এবং চাকুরীসূত্রে বাবা যে সমস্ত জায়গায় বদলী হয়েছেন তাঁকেও সেখানে থাকতে হয়েছে । তবে কৈশোর থেকে প্রথম যৌবনকাল পর্য্যন্ত কাটিয়েছেন বিহারের জামালপুরে । তখন জামালপুরে তাঁদের অনেক আত্মীয় স্বজন ছিলেন, এঁদের মধ্যে অন্যতম তৎকালীন জামালপুর এইচ.ই. স্কুলের শিক্ষক শ্রীরাজেন্দ্র চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। আত্মীয়তাসূত্রে তিনি প্রভাতকুমারের মাসতুত ভাই । ইনি ছিলেন সাহিত্যরসিক। প্রভাতকুমারের প্রথম গল্পগ্রন্থ 'নবকথা'র [৪] অন্তর্ভুক্ত 'বঙ্কিমবাবুর কাজির বিচার' গল্পটি ইনি লিখেছেন ।

রাজেন্দ্রচন্দ্রের তত্ত্বাবধানে, ১৮৮৩ সালে জামালপুর এইচ.ই স্কুলে, পঞ্চম শ্রেণীতে প্রভাতকুমার ভর্ত্তি হন । তত্ত্বাবধায়ক রাজেন্দ্রচন্দ্রের সাহিত্যরস পিপাসা অতি কৈশোরেই যে প্রভাতকুমারের মনে সঞ্চারিত হয়েছিল এ ধারণা করা খুব অসঙ্গত হবে না । প্রভাতকুমার লিখেছেন '. . . . জামালপুরে আমার বাল্যকাল কাটিয়াছে । আমি এই স্কুলে পঞ্চম শ্রেণী হইতে প্রবেশিকা পর্যন্ত পাঠ করিয়াছিলাম ।' [৫]

শৈশবকাল থেকেই প্রভাতকুমার ছিলেন শান্তশিষ্ট । তাঁর মন ছিল সহানুভূতিপূর্ণ এবং প্রকৃত রসবোধের উত্তরাধিকারী । তখন তিনি জামালপুর স্কুলের নীচু ক্লাসের ছাত্র — একদিন কোন কারণ বশতঃ স্কুল থেকে ফিরতে দেরী হয়ে যায় । মাকে এসে জানান, প্রচন্ড খিদে পেয়েছে তক্ষুনি তাঁর খাবার চাই । প্রভাত-প্রাণ কাদম্বিনী দেবী তাড়াতাড়ি ছেলের খাবার ব্যবস্থা করেন । প্রভাত কিন্তু সামান্য কিছু খেয়েই উঠে পড়ে । মা আশ্চর্য্য হন, ছেলের এত খিদে অথচ প্রায় না খেয়েই উঠে পড়েছে । জিজ্ঞাসা করে জবাব পান — পিঁপড়ের বুঝি খিদে পায় না ? প্রথমে ছেলের কথা মা ঠিক ঠাউরে উঠতে পারেননি । কিন্তু প্রভাত যখন বলেন পিঁপড়ে ছোট বলে খায় কম কিন্তু তারও খিদের তীব্রতা কারও চেয়ে কম নয় । বেশী খায় না বলে বাইরে থেকে আমরা সেটা বুঝতে পারি না ঠিকই কিন্তু খিদে তার প্রচন্ডই লাগে । ছেলের রসিকতা বুঝতে পেরে মা হেসেই খুন । [৬]

জামালপুরের অন্য একদিনের ঘটনা — কিশোর প্রভাতকুমার স্কুলে গিয়েছেন । এরপর মুষলধারে বৃষ্টি সুরু হয়েছে । স্কুল ছুটি হয়ে গিয়েছে কিন্তু বৃষ্টি কিছুতেই থামছে না । প্রভাতকুমার স্কুলের বারান্দায় পায়চারি

করছেন, এদিকে সন্ধ্যা হয়ে আসছে। এমন সময় স্কুলের থার্ড মাষ্টার প্রভাতকুমারকে দেখতে পেয়ে অপেক্ষা করতে বলেন। ওদিকে উৎকন্ঠিত হয়ে মা ঘরে - বাইরে করছেন। সন্ধ্যার পর বৃষ্টির প্রকোপ একটু কমাতে মাষ্টারমশাই প্রভাতকুমারকে বাড়ী পৌঁছে দেন। সন্ধ্যার অন্ধকারে প্রভাতকুমারকে বাড়ী ঢুকতে দেখে মা জিজ্ঞাসা করেন কেমন করে সে একা একা বাড়ী ফিরলো। প্রভাতকুমার হাসতে হাসতে জবাব দেন সে একা আসেনি — স্বয়ং ভগবান স্কুলের মাষ্টারমশায়ের রূপ ধরে তাকে বাড়ী পৌঁছে দিয়েছেন। সব কিছুর মধ্যে এমনি একটু হাসির খোরাকের যোগান দিতে তিনি ছিলেন স্বভাবসিদ্ধ।[৭]

১৮৮৮ সালে জামালপুর এইচ.ই. স্কুল থেকে প্রভাতকুমার দ্বিতীয় বিভাগে এনট্রান্স পরীক্ষায় পাশ করেন এবং উচ্চতর শিক্ষার জন্য পাটনা কলেজে এফ.এ.ক্লাসে ভর্ত্তি হন। ১৮৯১ সালে ঐ কলেজ থেকে তৃতীয় বিভাগে এফ.এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন এবং বি.এ.ক্লাসে 'বি' কোর্সের (বিজ্ঞানের) ছাত্র হিসাবে ভর্ত্তি হন। ছাত্র হিসাবে তিনি যে খুব মেধাবী ছিলেন এমন কথা বলা যায় না। ১৮৯৩ সালে বি.এ.পরীক্ষায় তিনি অকৃতকার্য্য হন। অসুস্থতার জন্য পরের বছর পরীক্ষা দিতে পারেন নি। 'আমি গতবারে অসুস্থতার জন্য পরীক্ষা দিতে পারি নাই, তাহার পূর্ববার অকৃতকার্য্য হইয়াছি - এবার পরীক্ষা দিতে যাইতেছি। আমি Patna College - এ পড়িতাম। গতবারের percentage ছিল বলিয়া এবারে কলেজে উপস্থিত থাকিতে হয় নাই।'[৮] যাহোক ১৮৯৫ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে তিনি আবার বি.এ. পরীক্ষা দিবার জন্য পাটনায় যান। ১৩ই ফেব্রুয়ারি ১৮৯৫ সালে তিনি বি.এ. পরীক্ষা দেবার জন্য বাঁকীপুরে যান এবং ১৫ই ফাল্গুন ১৩০১ তিনি পরীক্ষান্তে দিলদারনগরে ফিরে আসেন। সেবারকার পরীক্ষা সম্বন্ধে লিখেছেন —'আমি পরীক্ষা কেমন দিলাম যদি জানিতে চাহেন, তবে বলি ভালও নহে, মন্দও নহে। যদি জিজ্ঞাসা করেন, উত্তীর্ণ হইবার আশা করি কিনা, তবে বলি, করি, না ও করি। প্রকৃতিবিজ্ঞানের প্রশ্নপত্র বড় কঠিন হইয়াছিল, তাহাতে একটু সন্দেহ আছে।'[৯] পরীক্ষা সম্বন্ধে প্রভাতকুমারের মনে বরাবরই একটু ভীতি ছিল। পরীক্ষান্তে তাঁর মনোভাব —' আমার এখন মনের যেরূপ ভাব, আপনি সেরূপ কখনও অনুভব করেন নাই বোধ করি। চারি পাঁচ মাস ক্রমাগত পরিশ্রম করিয়া, পরীক্ষা দিয়া, মাথার প্রকান্ড বোঝা নামাইয়া, মনটা কিরূপ হয় তাহা আপনি জানেন কি? মনে হয় —' এ কি মুক্তি — একি পরিত্রাণ'। এখন আর দিবস গননা নাই, বেড়াইতে যাইবার সময় ঘড়ি লইয়া যাইতে হয় না, কারণ দুই পাঁচ ঘন্টা দেরী হইলেও কোন ক্ষতি নাই। শয়ন করিবার সময় বালিসের নীচে দিয়াশলাই ঠিক করিয়া রাখিতে হয় না কারণ ভোরে উঠিবার প্রয়োজন নাই। কেহ পথে গল্প করিলে, পালাইবার ছুঁতা খুঁজিতে হয় না, কেহ ভোজনের নিমন্ত্রণ করিলে উপদ্রব বলিয়া মনে হয় না।'[১০] ঐ বছরই তিনি বি.এ. পরীক্ষায় পাস করেন।

পাটনা কলেজে পঠদ্দশায় প্রভাতকুমারের জীবনে দুইটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটেছিল। প্রথমতঃ '২০শে অগ্রহায়ণ- ১২৯১'[১১] সালে হালিসহর নিবাসী অন্নদাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়ের দ্বিতীয়া কন্যা ব্রজবালা-দেবীর সঙ্গে বিবাহ - বন্ধনে আবদ্ধ হন। অন্নদাপ্রসাদ কর্ম্মসূত্রে বহুদিন জামালপুরে ছিলেন, ব্রজবালা দেবীর বাল্যাবস্থায় জামালপুর এইচ.ই.স্কুলের বালিকা-শাখায় পড়াশুনা করেছেন। প্রভাতকুমারও তখন এই স্কুলের দ্বিতীয় শ্রেণীর ছাত্র। ব্রজবালা দেবীকে তিনি প্রথম দেখেছিলেন স্কুলের এক পারিতোষিক বিতরণ সভায়। '..... এইখানেই, একদিন আমার জীবনের ভবিষ্যৎ সঙ্গিনীকে দেখিয়াছিলাম। আমি তখন দ্বিতীয় শ্রেণীতে পড়ি। আমাদের পারিতোষিক বিতরণ হইতেছিল। আমাদের স্কুলের শাখাস্বরূপ একটি বালিকা বিদ্যালয় ছিল, বালিকারাও পারিতোষিক লইতে আসিয়াছিল। দূরে, একটি কপাটের কাছে দণ্ডায়মানা, একটি বৃহচ্চক্ষু বালিকাকে দেখাইয়া আমার এক সঙ্গী বলিয়াছিল, — ঐ .....র বোন, — দেখিলাম, কিন্তু তখন কে জানিত — ইত্যাদি ইত্যাদি।'[১২] ব্রজবালা দেবী তখন নেহাতই বালিকা এবং প্রভাতকুমারও সবেমাত্র কৈশোর অতিক্রম করে যৌবনে পদার্পণ করেছেন। এই বয়সে যে স্বাভাবিক ভাবাবেশ এবং রোমান্টিকতা মনে জাগে ব্রজবালা দেবী দর্শনে প্রভাতকুমারের মনেও সেই ধরণের রোমান্টিকতা গুঞ্জরিত হয়েছিল। কিশোর প্রাণের সেই চাঞ্চল্য একদিন বাণীরূপ নিয়ে তাঁর প্রথম কবিতা সৃষ্টিকে সম্ভব করে তুলেছে। '..... আমার প্রথম কবিতা ২৬ এ বৈশাখ ১২৯৬ সালে লিখিয়াছিলাম তা এই :-

কি ক্ষণে দেখিনু তোরে,
হরে নিলি প্রাণ মন!
জনমে ভুলিব কিরে
সে হাসি মাখা আনন?
কেন বা হেরিনু তোরে?
কি ফল লভিনু হায়?
পুনঃ চাহি হেরিবারে,
প্রাণ সদা তোরে চায়।
প্রাণ কেন চায় তোরে?
কেন ভাবি দিবা নিশি?
কেন বা মনেতে পড়ে
সে চারুবদন হাসি?
কিছু না বলিতে পারি,
আশাতে বাঁধিয়া বুক,

তোর নাম গান করি
আমার অমিত সুখ ।

এই প্রসঙ্গে বলি কৈশোরের বা প্রথম যৌবনের আমার ঐ স্বপ্ন সফল হইয়া আমার জীবনকে মধুময় করিয়াছে ।'[১৩]

ষোল সতেরো বছর বয়সে লেখা প্রভাতকুমারের এই কবিতায় ভাব - ভাষার ঐশ্বর্য্য আশা করা বৃথা । তবুও নারী এবং প্রকৃতির সৌন্দর্য চিরকাল যে কবি মনকে আকৃষ্ট করে তার পরিচয় প্রভাতকুমারের প্রথম কবিতাতেই আমরা পাই । তাঁর মনে কবি হবার বাসনা এই প্রথম থেকেই দানা বাধতে থাকে । 'চিরনব' নামক কবিতাটি কার্ত্তিক ১২৯৭ সালে' ভারতী ও বালক' পত্রিকায় প্রকাশিত হয় । এ ছাড়া কিছু কিছু কবিতা প্রকাশের জন্য সুনামে বা বেনামে ইতঃপূর্বে বিভিন্ন পত্রিকায় পাঠিয়েছিলেন ; ১৮৯৪ সালে 'মানসী' নামে একটি কবিতা 'শ্রীমতী সৌদামিনী গুপ্তা' এই নাম সই করে 'নব্যভারত' পত্রিকায় প্রকাশের জন্য পাঠান কিন্তু অমনোনীত হয়ে ফিরে আসে । এই ছদ্মনাম গ্রহণ প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথকে জানিয়েছেন —' .... আমি এক বৎসর পূর্বে আপনার মানসী সম্বন্ধে একটি কবিতা লিখিয়াছিলাম । যে লাইনটার গোড়ায় x দাগ রহিয়াছে , ঐ লাইনটা হঠাৎ কেমন করিয়া মাথায় আসিয়া দেখা ছিল। তাহার পর কবিতাটা লিখিলাম । ঐ লাইনটার জন্যই , নীচে শ্রীমতী সৌদামিনী গুপ্তা ' সহি করিয়া উহা নব্য ভারতে পাঠাইয়াছিলাম , কিন্তু সম্পাদক মহাশয় সেটি লন নাই । ..... কবিতাটা এই :—

মানসী ।

বহুবার শুনিয়াছি বাস-তীর স্নানে
কোকিলের প্রেমগীতি ; জ্যোৎস্না নিশীথে
পাপিয়ার 'পিউ কাহাঁ নভঃ-নাট্যশালে,
দূরাগত বীণার ঝঙ্কার , যাহা চিতে
অপূর্ব উল্লাসমধু দেছিল ঢালিয়া ,
.....
.....
.....
x কিন্তু মম প্রিয়তম কণ্ঠস্বর ছাড়া ,
আর কিছু শুনি নাই এমন মধুর ।

' প্রিয়তমা কণ্ঠস্বর' লিখিলে , আমি নীচে নিজের নাম দিতে পারিতাম , ...![১৪]

প্রসঙ্গত স্মরণ করা যায় 'শ্রীজানোয়ার মোহন শর্ম্মা' ছদ্মনামে ১৩২২ সালে প্রভাতকুমার 'সুমুলোম পরিণয়' নামক প্রহসনটি লিখেছিলেন।

১৩০৪ সালের 'কুন্তলীন পুরস্কার' প্রতিযোগিতায় 'রাধামণি দেবী' এবং 'শশিভূষণ' এই দুইটি ছদ্মনামে 'পূজার চিঠি' নামক দুইটি পত্র রচনা করেন। 'রাধামণি দেবী ছদ্মনামে লিখিত রচনাটি প্রথম এবং 'শশিভূষণ' ছদ্মনামের রচনাটি ষষ্ঠ স্থান অধিকার করেছিল। এই ছদ্মনাম ব্যবহারের কারণ বিশ্লেষণ করে কৃষ্ণবিহারী গুপ্ত মহাশয়ের কাছে বলেছিলেন-' ..... কিন্তু তখন আমি ছিলাম কবি, সুতরাং গল্পে নিজের নাম না দিয়া শ্রীরাধামণি দেবী একটি কাল্পনিক নাম সহি করিয়া দিয়াছিলাম। তাহার পূর্ব বৎসর কুন্তলীনের বাৎসরিক পুরস্কারের বিষয় ছিল 'পূজার চিঠি' - স্ত্রী যেন প্রবাসী স্বামীকে বাড়ী আসিবার জন্য পত্র লিখিতেছে, এটা ওটা জিনিষের সহিত এক বোতল কুন্তলীন আনিতেও অনুরোধ করিতেছে - এইরূপ পত্র রচনা করিতে হইবে। শ্রীমতী রাধামণি দেবীর বেনামীতে আমি একখানা পত্র রচনা করিয়া পাঠাইয়া দিয়াছিলাম, উহা প্রথম পুরস্কার প্রাপ্ত হয়। সেইজন্য ওই নামটির উপর কেমন মায়া হইয়া যায়, গল্পের ছদ্মনাম স্বরূপ উহাই ব্যবহার করি।'[১৫]

এই ছদ্মনাম গ্রহণ প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথকেও জানিয়েছেন - ' আপনার মনে আছে কিনা বলিতে পারিনা, সেদিন Park street এ যাইবার সময় গাড়ীতে আপনাকে বলিয়াছিলাম যে, আমার একটি রচনা (ছদ্মনাম - রাধামণি দেবী) কুন্তলীনের প্রথম পুরস্কার প্রাপ্ত হইয়াছে। সে বহি বাহির হইয়াছে, এই ডাকে পাঠাইলাম, ষষ্ঠ পুরস্কার পত্রখানিও আমার লেখা (ছদ্মনাম শশিভূষণ)। অতএব আমার দুইটি পড়িবেন। ....।'[১৬] স্বনামে রচনা প্রকাশে কিছুটা সংকোচ প্রথম জীবনে যে তাঁকে ছদ্মনাম গ্রহণে প্রকারান্তরে প্রেরণা দিয়েছিল গদ্য রচনা প্রসঙ্গে পরবর্তীকালে তাঁর বিবৃতি অনুধাবনে এই ধারণা স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

জীবনসঙ্গিনী ব্রজবালা দেবীর সাহচর্য্য প্রভাতকুমারের জীবনে সাহিত্যসৃষ্টির এক নূতন প্রেরণা দান করে। ব্রজবালা দেবী ছিলেন সুরূপা শান্তস্বভাবা এবং সাহিত্য আলোচনায় তাঁর রুচি ছিল না। সাধারণ নারী-সুলভ অলংকারপ্রিয়তা বা অকারণ স্তুতি কোনটিই তিনি পছন্দ করিতেন না। প্রভাতকুমার জানিয়েছেন -'.... আমার সৌভাগ্যবশতঃ আমার স্ত্রী বস্ত্রালঙ্কার এবং পাড়ার স্ত্রী মহলে পশার, ইহার জন্য মোটেই লালায়িত নহেন।'[১৭] ব্রজবালা দেবী নিজে সাহিত্যসৃষ্টি না করলেও অন্তরালে থেকে তাঁকে যে উৎসাহ-দান করেছেন গদ্যলেখার প্রসঙ্গে অন্যত্র প্রভাতকুমার একথার স্বীকৃতি জানিয়েছেন।' বাস্তবিক আমি গল্প লেখাটা নিতান্ত ধৃষ্টতা বিবেচনা করিতাম, যদি নিম্ন লিখিত ঘটনাটি না ঘটিত। গতকল্য দ্বিপ্রহরে আমি আমার প্রকোষ্ঠের কপাট ঠেলিলাম, খিল বন্ধ ছিল। বাহিরের দিকে একটি জানালা, সেটি খোলা থাকে। আমি বাড়ীর বাহিরে যাইয়া সেই জানালার কাছে

দাঁড়াইলাম । দেখিলাম ব্রজদা কাগজ কলম লইয়া লিখিতেছেন , আমাকে দেখিয়াই কাগজগুলা উল্টাইয়া দিলেন । কি লিখিতেছেন জিজ্ঞাসা করিয়া, উত্তর পাইলাম না । আমি গোয়েন্দার চক্ষুতে দেখিতে লাগিলাম , উপরের পাতলা কাগজখানা ফুঁড়িয়া উল্টা লেখা পড়া গেল —'দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ'। তাঁহার বিদ্যা কতদূর জানেন ? বাঙ্গালায় আখ্যানমঞ্জরী এবং ইংরেজীতে রয়েল রিডার নং টু— নিউ সীরিস । তবে বাঙ্গালায় বিস্তর নভেল গলাধঃকরণ করিয়াছেন । অনেক সাধ্য-সাধনায় এ পর্য্যন্ত তাহা দেখিতে পাই নাই , বলেন —' আমার আবার বুদ্ধি আছে , আমি আবার গল্প লিখব — আ আমার কপাল । সুতরাং বলুন , আমি যে গল্প লিখিয়াছি , তাহাতে আমার বিশেষ দোষ আছে কি ? তাঁহার চাড়ের কথা আর কি বলিব , তাঁহার একটা পেন্সিল আমার কাছে ছিল , আমি সেটাতে লিখিতাম টিখিতাম , কাল সন্ধ্যা বেলা তিনি সেটা কাড়িয়া লইয়াছেন । আর্যনারীর এ কেমন প্রথা !!!! কি সাজা সমুচিত , তাহাই ভাবিতেছি ।'[১৮] শুধু সাহিত্য সাধনায় নয় ব্রজবালা দেবীর সাহচর্য্য এবং সহযোগিতা প্রভাতকুমারের দাম্পত্য জীবনকেও মধুময় করে তুলেছিল ।

(২)

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ দশক , রবীন্দ্রনাথ(১২৬৮ - ১৩৪৮) এই সময়ে বাংলার সাহিত্যের আসরে সুপ্রতিষ্ঠিত । বস্তুতঃ 'মানসী' (১২৯৭, ইং ১৮৯০) কাব্যগ্রন্থ প্রকাশের পর রবীন্দ্রনাথের কবিপ্রতিভা এবং কাব্যশিল্প বাংলা সাহিত্যের আসরে এক বিতর্কিত প্রশ্ন হয়ে দেখা দেয় ।রবীন্দ্রনাথের বিস্ময়কর তরুণ প্রতিভাকে ঘিরে বাংলা সাহিত্য রসিকেরা দুইটি দলে বিভক্ত হয়ে পড়েছেন । একদল প্রাচীনপন্থী তাঁদের যোগ্যতম মানস প্রতিনিধি বঙ্কিমচন্দ্র, অন্যদল নবীনপন্থী রবীন্দ্রপ্রতিভার পূজারী । বঙ্কিমচন্দ্র জীবনসায়াহ্নে উপনীত একনিষ্ঠ সাহিত্যসাধনা এবং শিল্পসৃষ্টির পরিবর্তে হিন্দুধর্মের ব্যাখ্যায় অভিনিবিষ্ট, অন্যদিকে ব্রাহ্মধর্মপ্রভাবিত জোড়াসাঁকোর ঠাকুরপরিবারে নবীন চিন্তাধারা বিকশিত হয়ে উঠেছে ।[১৯] সংক্ষেপে বলিতে গেলে পিছাইয়া - পড়িতে - চাওয়া হিন্দু সমাজ ও আগাইয়া চলিতে চাওয়া ব্রাহ্মসমাজের এই আদর্শ ঘটিত দ্বন্দ্বই ঊনবিংশ শতাব্দের শেষ কয় বছরে বাংলার ও ভারতের সাংস্কৃতিক ইতিহাসের গতি নিয়ন্ত্রিত করিয়াছে ।[২০]

প্রভাতকুমার তখন বি.এ. ক্লাসের ছাত্র (১৮৯১ - ৯৫)। ছাত্রাবস্থাতেই তিনি রবীন্দ্রনাথ সম্পাদিত 'সাধনা' (১২৯৮ - ১৩০২) পত্রিকার বিশেষভাবে রবীন্দ্ররচনার একনিষ্ঠ পাঠক । 'সাধনা' পত্রিকার উপর তাঁর গভীর মমতা এবং প্রীতির কথা জানা যায় যখন পত্রিকার প্রকাশ বন্ধ হয়ে যাবে শুনে রবীন্দ্রনাথকে চিঠি লেখেন —'.....সাধনা আর বাহির হইবেনা শুনিয়া কান্না পাইতে লাগিল । কোন আত্মীয় কিম্বা প্রিয় বন্ধুর মৃত্যু সংবাদ শুনিলে যেরূপ হয় [অর্থাৎ] মনে হইল। পত্রিকাটি সম্পর্কে তাঁর মনে যথেষ্ট মমত্ববোধ ছিল, এবং . . .

সমসাময়িক অন্যান্য পত্রিকা থেকে 'সাধনা' যে উৎকৃষ্ট পত্রিকা, পরিচিত মহলে নির্ভীকভাবেই তাঁর এই অভিমত প্রকাশ করতেন। স্বাভাবিকভাবেই রবীন্দ্র-বিরোধী দল এতে ক্ষুন্ন হতেন এবং অনেক সময়ে রবীন্দ্রনাথের সমর্থক হিসাবে তাঁকে বিদ্রূপের সম্মুখীন হতে হয়েছে। সাধনা প্রকাশের চতুর্থ বা শেষ বৎসর (১৩০২), ভাদ্র, আশ্বিন ও কার্তিক মাসের সংখ্যাগুলি একত্রে প্রকাশিত হয়েছিল। সাধনা প্রকাশের এই দুর্বিপাকের কথা শুনে রবীন্দ্রনাথকে জানিয়েছেন — '..... এবার শত্রুপক্ষ হাসিবে। সাধনা ত্রৈমাসিক হইবে শুনিয়া একজন বলিয়াছিল — 'এবার হয়ে এসেছে, ক্রমে ষান্মাসিক হবে, বাৎসরিক হবে, ঘর থেকে বছর বছর এতগুলি করে টাকা গুণতে হয়।' আমি সগর্বে বলিয়াছিলাম — who the devil cares for ? এবার আমি সে ব্যক্তির কাছে মুখ তুলিতে পারিব না। পুরাতন সাধনাগুলি পড়িয়া রহিয়াছে, দেখিলেও প্রাণটা কেমন করিয়া ওঠে।

সাধনাই যদি না বাহির হইল, তবে আমার লেখাগুলি পথে ফেলিয়া দিবেন, সে আর কি হইবে ?' [২১] অবশ্য এই দুঃখ তাঁকে বেশীদিন সহ্য করতে হয় নাই। রবীন্দ্রনাথ মারফৎ তিনি 'ভারতী' পত্রিকাগোষ্ঠীর সঙ্গে কিছুদিনের মধ্যেই পরিচিত হন এবং উক্ত পত্রিকাতেই তাঁর পরবর্তী রচনাগুলি প্রকাশিত হতে থাকে।

রবীন্দ্রপ্রতিভায় আকৃষ্ট প্রভাতমন কবির ব্যক্তিগত সান্নিধ্যলাভের জন্য ব্যাকুলতা অনুভব করে এবং দিলদারনগর থেকে নিয়মিতভাবে চিঠিপত্রে কবির সঙ্গে সংযোগ রক্ষা করে চলেন। প্রভাতকুমারের বিনীত চরিত্রের আন্তরিকতায় কবিও আকৃষ্ট হন এবং উভয়ের মধ্যে অন্তরঙ্গতা স্থাপিত হয়। রবীন্দ্রনাথের প্রতি তাঁর হৃদয়ের অকৃত্রিম শ্রদ্ধা ও ভালবাসার নিদর্শন হিসাবে মাঝে মাঝেই উৎসব উপলক্ষে প্রীতি উপহার পাঠাতেন। এমনকি কবিকে উপহার দেবার জন্য একটি হরিণশিশু পালন করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথকে লেখা তাঁর একটি পত্রে এই ঘটনার সমর্থন আছে। '... আপনার জন্য আমি শিশুহরিণী পালন করিতেছি। যদি বাঁচে ত আপনার জন্য পাঠাইয়া দিব। শাবক হরিণ - বাঁচান সহজ নহে শুনিয়াছি।' [২২] দুঃখের বিষয় - হরিণ শাবকটিকে প্রভাতকুমার বাঁচাতে পারেন নাই।

রবীন্দ্রনাথের প্রতি আন্তরিক প্রীতি বশতঃ কবি শিলাইদহে জমিদারী তদারক করতে গেছেন জানতে পেরে আত্মীয়বৎ উৎকণ্ঠিত হয়ে লিখেছেন — '..... যদি কোন দিন ঈশ্বর না করুন - আপনার শরীর অসুস্থ হয়, তবে আপনাকে দেখিবে কে ? চাকর বাকরে কি করিবে ? আপনি বঙ্গদেশের পল্লীতে

জমিদারী তদারক করিয়া বেড়াইতেছেন — কোনদিন জ্বরে না পড়েন, এই আমার ভয়। আমি ও বৎসর পূজার সময় বঙ্গদেশ হইতে এমন লাস্টিং ম্যালেরিয়া সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছিলাম যে, তাহার দায়ে আমার একটা বৎসর জলে গেল, এবং এখনও মধ্যে মধ্যে বেগ পাইতে হয়। বঙ্গদেশের নাম শুনিলে আমার বুকের রক্ত শুকাইয়া যায়।....[২৩] প্রসঙ্গত স্মরণ করা যায় তৎকালীন প্রবাসী বাঙ্গালীদের মনে বাংলাদেশের আবহাওয়া সম্পর্কে যে ম্যালেরিয়া-ভীতি ছিল প্রভাতকুমারের মনও সেই আশংকামুক্ত ছিল না।

কর্মব্যস্ত রবীন্দ্রনাথের পক্ষে প্রভাতকুমারের চিঠিপত্রের সময়মত উত্তর দেওয়া হয়ত সবসময় সম্ভব হয়ে ওঠেনি কিন্তু স্বভাবতই নিরভিমান প্রভাতকুমার এ সম্পর্কে অনুযোগ উত্থাপন করেন নাই। উপরন্তু কবিকে জানিয়েছেন — '.... মনে করিবেন না যে আমি আপনার পত্র না পাইয়া, নিজেকে অকহেলাসর্প কর্তৃক দংশিত জ্ঞান করিয়া কলম বন্ধ করিয়াছিলাম। হরিবোল হরি — আপনি কখনও এ ভ্রমে পতিত হবেন না। আপনি যতদিন না গলবস্ত্র হইয়া আমাকে পত্র লিখিতে বারণ করিবেন, ততদিন আমি পত্রলেখা ছাড়িব না। পূজার কোন নিয়ম নাই — থাকিতে পারেও না। এই রকম করিয়া আমি প্রতিভার প্রতিভার পূজা করিতেছি — আপনি জ্ঞাত হউন, প্রতিভার পূজা করিয়া আমার আত্মসম্মান অক্ষুন্ন থাকে —।....![২৪] প্রভাতকুমার রবীন্দ্রপ্রতিভাকে অকুণ্ঠভাবে শ্রদ্ধা জানিয়েছে।

নিজের একটি কবিতা পুস্তক প্রকাশ করবার ব্যয়ের পরিমান জানার জন্য ১৩০০ সালের জ্যৈষ্ঠ মাসে দিলদারনগর থেকে প্রভাতকুমার কলকাতায় এসেছিলেন, সাহিত্য পত্রিকার অফিসে। সেই সূত্রে 'সাহিত্য' পত্রিকার তৎকালীন সম্পাদক সুরেশ সমাজপতি মহাশয়ের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ-আলাপ হয়। সমাজপতি মহাশয় ছিলেন রূঢ় সমালোচক এবং কিছুটা রবীন্দ্রবিরোধী দলেরও বটে। রবীন্দ্রনাথের 'হিং টিং ছট' কবিতাটি 'সাধনা' পত্রিকায় শ্রাবণ ১২৯৯ সালে প্রকাশিত হয়। কবিতাটি চন্দ্রনাথ বসু মহাশয়কে ব্যঙ্গ করে লেখা এই অনুমানে রবীন্দ্রনাথের প্রতি অনেকে বিরূপ হয়েছিলেন। রবীন্দ্রবন্ধু নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত মহাশয় এই ভ্রান্ত ধারণার বশবর্তী হয়ে 'সাহিত্য' পত্রিকায় ফাল্গুন ১২৯৯ সালে 'তর্কবৈচিত্র্য' নামে বিনাস্বাক্ষরে একটি প্রবন্ধ লেখেন। রবীন্দ্রনাথ এই ব্যাপারে নিজ বক্তব্য জ্ঞাপন করে বৈশাখ ১৩০০ সালে 'সাহিত্য' সম্পাদক সুরেশ সমাজপতিকে একটি পত্র লেখেন এবং চন্দ্রনাথ বসু মহাশয় যে তাঁর ব্যঙ্গস্থল নন একথা জানান। কিন্তু সমাজপতি মহাশয় কিছু বিরূপ মন্তব্য সহকারে রবীন্দ্রনাথের পত্রটি প্রকাশ করে (জ্যৈষ্ঠ ১৩০০) তাকে লোকসমক্ষে হেয় প্রতিপন্ন করার চেষ্টা করেন। রবীন্দ্রভক্ত প্রভাতকুমারের পক্ষে তাই সমাজপতি মহাশয়কে সুনজরে দেখা সম্ভব হয় নাই এবং 'সাহিত্য' পত্রিকাতে না লেখার জন্য রবীন্দ্রনাথকে অনুরোধ করেন।

রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে পরিচিতির উত্তরপূর্বে প্রভাতকুমারের মনে কবি হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হবার বাসনা আরও দৃঢ়তর হয়ে উঠেছিল। অন্যত্র তিনি তাঁর কবি জীবনের প্রারম্ভের কাহিনী এই ভাবে বিবৃত করেছেন —'.... সে বোধহয় ১৮৯৬ সালের কথা। আমি তখন কবি-যশঃপ্রার্থী নব্য যুবক। মাসিক পত্রে মাঝে মাঝে আমার দু একটা কবিতা বাহির হয়। রবীন্দ্রবাবুর সহিত আলাপ করিয়া লইয়াছি, মাঝে মাঝে ঠাকুর বাড়ীতে গিয়া তাঁহার এক আধ ঘন্টা নষ্ট করিয়া দিই। সেই বৎসর চৈত্র সংক্রান্তির দিন, মাথায় এক খেয়াল উঠিল। একটা পাত্রে খানিকটা খুনখারাপী রঙ গুলিয়া খান কতক পোষ্ট কার্ড তাহাতে বেশ করিয়া ভিজাইয়া লইলাম। তখন রং বেরঙের প্রাইভেট পোষ্টকার্ড বাজারে পাওয়া যাইত না, এক পয়সার টিকিটও ওঠে নাই। পোষ্টকার্ডগুলি শুকাইলে, এক একখানিতে এক একজন বড় সাহিত্যিকের নাম ও ঠিকানা লিখিলাম। ভিতরে নববর্ষের অভিবাদন সূচক দুই লাইন কবিতা — তাহা প্রত্যেক সাহিত্যিকের জন্য স্বতন্ত্র ভাবে রচনা করিয়াছিলাম।' [২৫]

রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে প্রভাতকুমারের আন্তরিকতা স্থাপিত হলেও তিনি কোনদিনই রবীন্দ্রপ্রতিভার সঙ্গে নিজের তুলনা করেন নাই। তাঁর কবিতার ভাব, ভাষা এবং গঠন পারিপাট্য যে রবীন্দ্রনাথের তুলনায় দীনহীন তিনি একথা অকপটেই কবিকে জানিয়েছেন। রবীন্দ্রনাথের 'নিরুদ্দেশ যাত্রা' কবিতার ভাবের সঙ্গে তার 'প্রহেলিকা' কবিতার ভাবের মিল সত্ত্বেও সুন্দর না হওয়ার কারণ — রবীন্দ্রনাথকে বলেছেন — '.... আমার ভাবটা ঐ, কিন্তু আমি ভাষার পরিপাট পরিচ্ছদ কোথায় পাইব? 'মেঘচুম্বিত অস্তগিরির চরণতলে' আমার মাথায় কেমন করিয়া আসিবে?' [২৬] অন্যত্র লিখেছেন '..... এই পত্রে আমি যে ইংরেজি কথা ব্যবহার করিলাম, তাহার ঠিক বাঙ্গলা পাইলাম না। ইংরাজী কথা না আনিলে ভাল করিয়া ভাব ব্যক্ত করিতে পারি না। আপনারা বঙ্গ সাহিত্যের অভিভাবক বলিয়া এ বিষয়ে আমার আরও ভয়।' [২৭] রবীন্দ্রনাথের শ্রেষ্ঠত্ব তিনি অকপটেই স্বীকার করে নিয়েছেন।

১৩০১ সালের চৈত্র মাস। প্রভাতকুমার আটটি ইংরেজী কবিতার বঙ্গানুবাদ করেন এবং নববর্ষের প্রীতি - উপহার স্বরূপ সেইগুলি কবির কাছে পাঠাতে মনস্থ করেন। তন্মধ্যে একটি কবিতা 'সাধনায়' প্রকাশের জন্য কবিকে অনুরোধও করেছিলেন। 'আমি আটটি ইংরেজী কবিতা বাঙ্গালায় অনুবাদ করিয়াছি। নবীন বর্ষের নবীন প্রভাতে সেগুলি আপনার হস্তে উপহার দিব মনে করিতেছি। ..... আপনি কোথায় আছেন জানিতে পারিলে, সেগুলি ১লা বৈশাখই আপনার হস্তে পৌঁছিতে পারে।' [২৮] ১৩০২ সালের বৈশাখ সংখ্যায় প্রভাতকুমারের 'প্রেম - পঞ্জিকা' কবিতাটির প্রকাশে মনে হয় কবি তাঁর অনুরোধ রক্ষা করেছিলেন।

রবীন্দ্রপ্রতিভা এবং রচনার একান্ত ভক্ত হলেও প্রভাতকুমারের মনে যখনই কবির কোন রচনার ভাব ভাষা ছন্দ ইত্যাদির ব্যাপারে কোন সংশয় জেগেছে তখনই সেগুলির আলোচনা করতে কিন্তু সংকোচবোধ করেননি। রবীন্দ্রনাথের 'সোনার তরীর' 'দেউল' কবিতাটির ছন্দ , 'শৈশব - সন্ধ্যা' কবিতার ভাষা 'রাজা ও রাণীর' নাটকের অংশ বিশেষের ভাব ইত্যাদি সম্পর্কে নিজস্ব মতামত রবীন্দ্রনাথকে জানিয়েছেন ।

' .... সোনার তরীর 'দেউল' গান করিতে করিতে একটা স্থানে আসিয়া বাধা পায় —

ডুবিয়া গেল চির অন্ধকারে ।

ডু বি য়া গে ল চি র অ ন্ধ কা রে

এটা অবশ্য এরূপ হইতে পারে —

কিন্তু এইরূপ হইলেই ভাল হয় —

ডু বি য়া গে ল সু চি র অন্ ধ কা রে

'শৈশব সন্ধ্যা'য় কতকগুলি সুন্দর শব্দ ও ছবির পরে পুকুরের পাড়ে আসিয়া সব মাটি করিয়া দিয়াছে । এইরূপ একটা দোষ স্বপ্নপ্রয়াণ কাব্যে দেখিয়াছিলাম — অনেক ভাল ভাল কথার পরে শেষকালে' ফুলেদের সৌরভ রেরোয়'। 'বল কোন পারে ভিড়িবে তোমার সোনার তরী' — আমি আমাদের পুস্তকের ভিড়িবে কাটিয়া লাগিবে করিয়া দিয়াছি । রাজা ও রাণীতে কুমার সেনের উক্তিতে 'চুরি করে দেখিত মিলন' কথা কয়টা আপত্তিজনক । বঙ্গদেশের একটা ঘৃণ্য প্রথাকে কবিতা রাজ্যে উৎখাত প্রতিরোপন করাটা ভাল হয় নাই ।.' ২৯

আবার কখনও রবীন্দ্রকাব্যের অতীন্দ্রিয় ভাব - ভাবনার সম্যক উপলব্ধিতে ব্যর্থ হয়ে নিঃসঙ্কোচে কবির কাছে ভাবটুকু বুঝিয়ে দিতে অনুরোধ করেছেন । 'মানসী' কাব্যের একটি কবিতার ভাব অনুসরণে ব্যর্থ হয়ে জানিয়েছেন —

' সকলে দেখিতেছিল সেই মুখচ্ছবি ।

সেই কোন ? এ কবিতার নায়িকা কে ? যদি মানবী হয়, সমস্ত কবিতাটির সহিত এ কল্পনাটার ভাল সামঞ্জস্য করিতে পারি না । এ কবিতার নায়িকা বর্ণনায় সীমাবদ্ধ individuality নাই একটা ব্যাপ্তি রহিয়াছে — তাই মানবী কিনা সন্দেহ হয় ।' ৩০

অন্যত্র তাঁকে বলতে শুনি — ' .....বৈষ্ণবশাস্ত্রের অন্তর্নিহিত নিত্যধর্ম কি , তাহা আমাকে সংক্ষেপে ~~xxxxxx~~ বুঝাইয়া দিবেন রবীন্দ্রবাবু- আপনার যখন অবসর

হইবে, সেই সময় লিখিবেন — আমি ধৈর্য্যের সহিত অপেক্ষা করিয়া থাকিব। আমি যখন বৈষ্ণব কবিতা পাঠ করি, বা কবিত্বে মুগ্ধ হই, — তখন রাধা এবং কৃষ্ণকে নায়ক নায়িকা মাত্র হিসাবে দেখিয়া থাকি। আর আমার মনে হয়, রাধা কৃষ্ণের উপাখ্যান কবিকল্পনা মাত্র। ভাগবতের উপাখ্যানও তাহাই। ৩১

বৈষ্ণবধর্মের অন্তর্নিহিত নিত্যxxx ধর্মসম্পর্কে প্রভাতকুমারের প্রশ্নের উত্তরে রবীন্দ্রনাথ পতিসর থেকে এক দীর্ঘ পত্রে তাঁকে বৈষ্ণবধর্মের মূলতত্ত্বটি সংক্ষেপে সংক্ষেপে বোঝাবার চেষ্টা করে লিখেছিলেন।—

—' বৈষ্ণবধর্মের মূলতত্ত্বটি আমি যেরূপ বুঝি তাহা সংক্ষেপে বলিতে চেষ্টা করিব। অধিকাংশ ধর্মশাস্ত্রেই ঈশ্বরের সহিত বাধ্যবাধকতার সম্বন্ধ উপলব্ধি করিবার উপদেশ আছে। তিনি পিতা আমি পুত্র অতএব তিনি আরাধ্য।..

বৈষ্ণবধর্মে এই বাধ্যবাধকতার সম্বন্ধ অতিক্রম করিয়া ঈশ্বরের সহিত একটি অহৈতুকি সম্বন্ধ স্থাপন করিতে চাহে। আমি তাহাকে কেন চাহি তাহা আমি জানি না, তাহাকে নহিলে আমার চলেনা — পৃথিবীতে আর কিছুতেই আমার চরম পরিতৃপ্তি নাই।

অতএব পৃথিবীতে যে ভালবাসার কোন যুক্তিসঙ্গত হেতু দেখা যায় না — যাহার সহিত পূর্বকৃত কোন সম্বন্ধ বন্ধন বিচ্ছিন্ন করিয়া দুরূহ দুরাশার আত্মবিসর্জন করিতে যায় বৈষ্ণব কবিগণ পৃথিবীর সেই ভালবাসাকেই পরমাত্মার প্রতি আত্মার অনিবার্য নিগূঢ় স্ব ভালবাসার আদর্শ রূপক স্বরূপে ব্যবহার করিয়াছেন।......' ৩২

রবীন্দ্র মননে বৈষ্ণব কবিতার শুধু কবিত্ব নয় রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলার নিগূঢ় দর্শন পরিস্ফুট কিন্তু প্রভাত মানসে রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলার মানবিক আবেদন প্রাধান্য পেয়েছে। তাঁর সহজ সরল সাধারণ চিন্তাধারা দর্শনের গভীরে প্রবেশ করিতে চায়নি। এই দৃষ্টিভঙ্গীর পার্থক্য উভয়ের রচনায় ভিন্ন স্বাদ এনেছে।

রবীন্দ্রকাব্যের ভক্ত পাঠক হলেও প্রভাতকুমার তাঁর পাঠ্যক্রমকে এখানেই সীমাবদ্ধ রাখেন নি। মধুসূদন দত্তের কাব্যসম্ভার, দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'স্বপ্নপ্রয়াণ' কাব্য, দেবেন্দ্রনাথ সেন, মানকুমারী বসুর কবিতাবলী এবং নবীন চন্দ্র সেনের কাব্যও তাঁর অধিগত ছিল, এই সকল কাব্য কবিতা পাঠে তাঁর ব্যক্তিগত মতামত ... ইতস্তত: বিক্ষিপ্ত ভাবে রবীন্দ্রনাথকে জানাতে এবং কবির বক্তব্য জানতে চেয়েছেন। '....কুরুক্ষেত্র কাব্য সম্বন্ধে আপনার মত শুনিতে বড় ইচ্ছা হয়। কলিকাতা রিভিউ হইতে আরম্ভ করিয়া

কুরুক্ষেত্রের বড় প্রশংসা। আমি যদি লোকের কাছে ইহার প্রতিবাদ করি, তবে সকলে আমাকে উপহাস করিবে। আপনাকে আমি গোপনে বলিতেছি, বইখানা আমার মোটে ভাল লাগে নাই। কাব্যের হিসাবে ইহা আমার মতে একটা গজকচ্ছপগোছ হইয়াছে। ..... 'চোরের বেটা চোর' 'সাধুর বেটী সাধু' ইত্যাদি গ্রাম্য ধরণের উক্তি প্রত্যুক্তিতে ব্যাপারটা আমার বড়ই হাস্যকর বোধ হইয়াছে। এই সমস্ত বিষয়ে তিলোত্তমা এবং মেঘনাদের ভাষা ব্যবহার না করিলে, ঐরূপই হইবে, ইহাই আমার বিশ্বাস। ..... তিন বৎসর পূর্বে শ্রীমতি মানদাসুন্দরী কুমারী নব্যভারতে একটা ওড্ লিখিয়া অভিমন্যুকে ডিফেন্ড করিয়াছিলেন।' ৩৩ 'ইতঃপূর্বে 'সুপুপ্রয়াণ'এর কাব্য ভাষা সম্পর্কে তাঁকে মত প্রকাশ করতে দেখেছি। এখানেও নবীনচন্দ্র সেনের 'কুরুক্ষেত্র' কাব্যের ভাষা সম্পর্কে যে মন্তব্য করেছেন পরবর্তীকালে অনেক কাব্যসমালোচকগণের আলোচনায় তাঁর এই বক্তব্যের সমর্থন পাওয়া যায়।

কবি দেবেন্দ্রনাথ সেন মহাশয়ের কাব্যপ্রতিভায় প্রভাতকুমারের শ্রদ্ধাবোধ যে কত গভীর ছিল পরবর্তীকালে গয়া অবস্থানকালে, কৃষ্ণবিহারী গুপ্ত মহাশয়ের কাছে তাঁর কবিজীবনের বিবৃতি প্রসঙ্গে সে কথার উল্লেখ করেছেন।

'..... ১৮৯১ কিংবা ১৮৯২ সালে মাঝে মাঝে আমি গাজিপুরে যাইতাম তখনকার দিনে আমার মনে কবি হইবার দুরাকাঙ্ক্ষা জাগরূক ছিল। মাসিক পত্রে কবিতা ছাপাইয়া নিরীহ পাঠকমনের উপর সেকালে অনেক অত্যাচার করিয়াছি। গাজিপুরে গোলাপ ক্ষেত্র দেখিয়া একটা সনেট লিখিয়াছিলাম, প্রস্ফুটিত ক্ষেত্রের বর্ণনায় লিখিয়াছিলাম, —

' যেন হায় প্রেয়সীর প্রেমলিপিখানি
ফুটিয়াছে ভাবপুষ্পে মাধুরী হিল্লোলে।'

উপমাটির নূতনত্বে সাহিত্য জগৎকে স্তম্ভিত করিয়া দিবার অভিসন্ধি করিতেছি এমন সময় একদিন সদ্যপ্রাপ্ত ভারতীর মোড়ক খুলিয়া দেখি 'গাজিপুর' নামক দেবেন্দ্রবাবুর একটি কবিতা প্রকাশিত হইয়াছে। তাহার আরম্ভটি এইরূপ —

এবে গোলাপে গোলাপে ছাইয়া ফেলেছে
এ মধু কানন দেশ,
সখি তুমিও আমিও গোলাপী অধরে
ধরিয়া গোলাপী বেশ।

এই কবিতাটির পাশে আমার সনেটটি হংসের পাশে যেন বকটির মত বলিয়া মনে হইতে লাগিল। সুতরাং সে যাত্রা, সাহিত্য - জগৎকে মার্জনা করিলাম। সেটি আর কাগজে পাঠাইলাম না।' ৩৪

বৈশাখ ১৩০২ সালে প্রভাতকুমার পাটনা কলেজ থেকে বি.এ. পাশ করেন। পরীক্ষার দুশ্চিন্তা কেটে গেলেও ভবিষ্যৎ জীবনের চিন্তায় তিনি কিছুটা বিব্রত বোধ করেন। পরীক্ষার ফল প্রকাশিত হবার পর লিখেছিলেন —' আমি বাঁচিলাম। ক'দিনই বা বাঁচিব ? — নূতন নূতন দুইচারিদিন। তাহার পর অনুচিন্তারূপ দৈত্য আসিয়া আমাকে ঘোড়া করিয়া চাবুক হাতে লইয়া পিঠে চড়িবে। .... এই নূতন দৈত্যের মহাভারে মস্তক আবার ধূলায় লুণ্ঠিত হইবে।'[৩৫]

পূর্বে বলা হয়েছে প্রভাতকুমারের আর্থিক অবস্থা ছিল অতি সাধারণ পিতার আয়ের উপরই মোটামোটি ভাবে তাঁদের নির্ভর করতে হত। উপরন্তু এই সময়ে তিনি একটি পুত্র সন্তান লাভ করেছেন। খুব স্বাভাবিকভাবে কিছুটা উপার্জনের কথা তাঁকে তখন ভাবতে হয়েছে। অন্যদিকে সাহিত্য সেবার বাসনাও তাঁর মনে প্রবলাকার ধারণ করে। পুস্তকাকারে প্রকাশ করার মত কিছু কবিতা ইতিমধ্যে রচনা করলেও অর্থাভাবে ভবিষ্যৎকালে প্রকাশের আশায় তিনি সেইগুলি রেখে দেন।

রবীন্দ্রনাথকে লিখিত প্রভাতকুমারের এই সময়ের পত্রগুলিতে উভয়ের মধ্যে কিছু সাহিত্য আলোচনার সংবাদ আছে। অনুমান করা হয়ত অসঙ্গত হবে না যে এই আলোচনাধারা অনুসরণে রবীন্দ্রনাথ, প্রভাতকুমারের সাহিত্যিক প্রতিভার সঠিক পথটিকে উপলব্ধি করতে পেরে তাঁকে গদ্য রচনার নির্দেশ দেন। পরবর্তীকালে প্রভাতকুমার তাঁর গদ্য রচনা প্রসঙ্গে কৃষ্ণবিহারী গুপ্ত মহাশয়ের কাছে বলেছিলেন — '... রবিবাবুর দ্বারা উদ্বুদ্ধ হইয়াই আমি গদ্য রচনায় হাত দিই।'[৩৬] এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথকে লিখিত প্রভাতকুমারের একটি পত্রের অংশবিশেষ অনুধাবনযোগ্য। প্রভাতকুমার লিখেছেন —

' .... না রবিবাবু, আমি কখনও গদ্য লিখিতে আজও চেষ্টা করি নাই। এ সম্বন্ধে আমাকে যদি আপনার কিছু বলিবার থাকে, তবে তাহার জন্য সাগ্রহে প্রতীক্ষা করিয়া রহিলাম। গদ্য লিখিতে হইলে এক গল্প লেখা নয়ত —ঐতিহাসিক দার্শনিক ইত্যাদি কোন বিষয়ের আলোচনা করা, কিন্তু ইহার জন্য ঘটে কিঞ্চিত বিদ্যা থাকা প্রয়োজন, আমার তাহা নাই। আমি পাঠ্যপুস্তকের বাহিরে বড় বেশী কিছু পড়ি নাই — আমি বড় 'অলস বালক' ছিলাম। এইবার আমি এই আলস্য ত্যাগ করিব। আমার শব্দভাণ্ডার বড়ই দরিদ্র, সেইজন্য সংস্কৃত পড়িব। ভাবভাণ্ডারে কিছু সঞ্চয় করিবার জন্য ইংরাজী পড়িব। আমার জীবিকার একটা স্থায়ী বন্দোবস্ত হইলে এই কাজে লাগিব, মাতৃভাষার সেবা করিবার জন্য প্রাণপণ করিব। কিছু করিতে পারিব এমন আশা নাই, তবে চেষ্টা করিয়া জীবন সার্থক করিব। আমার অধিক অর্থের প্রয়োজন নাই —.....

- - - - -- আমি চাই অল্প অর্থ – অধিক অবসর । তাহাই আমার অভিষ্ট সিদ্ধির অনুকূল হইবে । যতদিন ভাসিয়া ভাসিয়া বেড়াইব, ততদিন কার্যে মন লাগিবেনা । ... ৩৭

পত্রটিতে একদিকে যেমন তাঁর গদ্য রচনায় সংকোচ প্রকাশিত হয়েছে অন্যদিকে তার ভবিষ্যৎজীবনের সত্যকারের ইচ্ছাটিও সুপরিস্ফুট । বিশেষ অর্থশালী হয়ে ভোগবিলাসের জীবন যাপনে তার যেমন অনাস্থা তেমনি একনিষ্ঠ সাহিত্যসেবী হয়ে বঙ্গ সাহিত্যভান্ডারকে পূর্ণতর করার একান্ত ইচ্ছাটিও ফুটে উঠেছে । পরবর্তী জীবনে আমরা দেখতে পাই সাহিত্য সেবার জন্য তিনি জীবনের অনেক সুখসম্ভাবনাকে স্বেচ্ছায় বিসর্জন দিয়েছেন ।

প্রভাতকুমার তাঁর গদ্য লেখার প্রথম প্রয়াসের কথা এইভাবে রবীন্দ্রনাথকে জানিয়েছেন —

' প্রিয় রবিবাবু,

এই ডাকে বাঙ্গালা গদ্য লেখায় আমার প্রথম উদ্যম আপনার নিকট পাঠাইলাম ।

গায়ে পড়িয়া – আপনি আমায় ভাল করিয়াই জানেন, সুতরাং বিস্মিত হইবেন না – ইহার একটু ইতিহাস আপনাকে শুনাইয়া দিই । আপনার পত্র পাইবার দুইদিন আগে ইহা আরম্ভ করিয়াছিলাম, গতকল্য প্রভাতে ইহা শেষ করিয়াছি । যখন আরম্ভ করি, তখন গল্পাংশ ঠিক করি নাই, — এটা না হয়'মন্থলি প্যাকেটটে' লিখিয়া পাঠাইবেন । ইহা আমার ভাল লাগিয়াছে, এবং আমার স্ত্রীর ভাল লাগিয়াছে । কাউপর কবি নিজের রচনা সম্বন্ধেলিখিয়াছেন : I praise them ,and Mrs. Unwin praises them her praise and my praise put together is fame enough for me.

সুতরাং আমার যশোলিপ্সা তৃপ্ত হইয়াছে, এখন ইহাকে আপনি ইচ্ছা করিলে জানালা গলাইয়া বাগানে ফেলিয়া দিতে পারেন ।' ৩৮

এই চিঠিটি লেখার তিন দিন পর অর্থাৎ ২৯ জ্যৈষ্ঠ, ১৩০২ দিলদারনগর থেকে রবীন্দ্রনাথকে পুনরায় লিখেছেন — .....' আপনাকে আমি 'বেনামী চিঠি' নামক যে একটি গল্প পাঠাইয়াছি তাহা পাইয়াছেন বোধ হয় । সাধনার জন্য প্রবন্ধ ভ্রম করিয়া পাছে সাধনার কার্যাধ্যক্ষ মহাশয় তাহা খুলিয়া ফেলেন, তাই উপরে'গোপনীয়' লিখিয়া দিয়াছিলাম । যাহা হউক আমার বিদ্যা প্রকাশ হইয়া পড়িয়াছে —.....' ৩৯

73941
27 MAR 1981

উপরের পত্রাংশদুটি থেকে প্রমানিত হয় যে আন্তরিক উদ্যম এবং রবীন্দ্রনাথের প্রেরণা থেকে প্রভাতকুমারের প্রথম গল্প 'বেনামী চিঠি'র সৃষ্টি সম্ভব হয়েছিল।

মৃদু ব্যঙ্গ মিশ্রিত কৌতুককর গল্প 'বেনামী চিঠি' নববিবাহিত কলেজে পড়া এক তরুণ গোপনে নববধূর সঙ্গে মিলিত হবার আশায় শ্বশুরালয়ে গমন করে। কিন্তু সেখানে শ্যালিকাদের জ্বালাতনে অতিষ্ট হয়ে পাল্টা আক্রমন করলে তাদের মধ্যে একজন তরুণের পিতাকে গোপনে মিথ্যা খবর পাঠায় যে তার ছেলে বিলাত যাচ্ছে। খবর পেয়ে তরুণের পিতা হন্তদন্ত হয়ে ছুটে আসেন। ইত্যবসরে শ্বশুরের অর্থে তরুণ সত্য সত্যই বিলাত যাওয়ার ব্যবস্থা করে ফেলে। পুত্র শ্বশুরের অর্থেই বিলাত যাচ্ছে এই সংবাদ পেয়ে উৎকণ্ঠিত পিতা অচিরেই আন্তনা লাভ করেন।

পরবর্তীকালে হাস্যরসিক প্রভাতকুমারের যে পরিচয় আমরা পাই প্রথম গল্পেই তার ছায়াপাত ঘটেছে।

'মনীষা - মন্দিরের'র প্রবন্ধকার কৃষ্ণবিহারী গুপ্তের কাছে একদা প্রভাতকুমার বিবৃত করেছিলেন যে' শ্রীবিলাসের দুর্বুদ্ধি' গল্পটি তাঁর সর্ব প্রথম লিখিত ও প্রকাশিত রচনা।' বেনামী চিঠি' গল্পটি ১৩০৫ সালের ভাদ্রমাসে 'প্রদীপ' পত্রিকায় প্রকাশিত হলেও উল্লিখিত পত্রের বক্তব্যেই প্রমাণিত হয় তাঁর এই বিবৃতি ভ্রান্তিজনক।'[৪০]

(৩)

বি.এ. পাশ করার পর অভিভাবকদের তাড়নায় 'ন্যক্কারজনক আইন' পড়িবার জন্য ভাগলপুর আসিতে প্রস্তুত'[৪১] হন। ১৩০২ সালের ৫ই আষাঢ় দিলদারনগর ছেড়ে ভাগলপুর আসার পথে জামালপুরে নামেন। জামালপুর এইচ.ই.স্কুলে তখন ছয় মাসের জন্য একজন সহকারী প্রধান শিক্ষকের পদ খালি থাকাতে নিজে উদ্যোগী হয়ে সেই পদটি গ্রহণ করেন। এখানে মাসিক বেতন পেতেন পঞ্চাশ টাকা। শিক্ষকতার পদ গ্রহণ করাতে তখনকার মত আইন পড়ার হাত থেকে রেহাই পান। এই স্কুলে তিনি ১৩০২ সালের আষাঢ় মাস থেকে ফাল্গুন মাস পর্য্যন্ত শিক্ষকতা করেন। ১৩০২ সালের ১১ ফাল্গুন রবীন্দ্রনাথকে জানিয়েছেন –

'....প্রায় দুই সপ্তাহ হইল, জামালপুরের কর্ম ত্যাগ করিয়া এখানে আসিয়াছি।[৪২]

এই সময়কার অনিশ্চয়তাপূর্ণ কর্মজীবনের মধ্যেও প্রভাতকুমারের রঙ্গরসপূর্ণ জীবনদৃষ্টির সুন্দর পরিচয় পাই রবীন্দ্রনাথের কাছে লেখা একটি চিঠি থেকে। রবীন্দ্রনাথকে তিনি লিখেছেন — 'আপনার চিঠিখানির যদি প্রাণ

থাকিত তবে সে আজ হাসিতে হাসিতে অজ্ঞান হইয়া যাইত। চিরদিন সে আমার ধুতি-শার্ট-চাটি পরিহিত ভালমানুষ ভদ্রলোকটি দেখিয়াছে, আজ আর তেমন দেখিল না। আজ দেখিল আমার মাথায় টুপী, অঙ্গে চাপকান, পরিধানে পেন্টালুন, গম্ভীর মাতব্বর মাষ্টার মহাশয় হইয়া পড়িয়াছি। ...... আমি শুভাকাঙ্ক্ষীদের উপদেশ মত প্রাণপণে গম্ভীর হইতে চেষ্টা করিতেছি, কিন্তু কৃতকার্য্য হইতে বড় পারি নাই। ছেলেরা হাসিলে গোল করিলে, খুব ক্রোধ করিবার চেষ্টা করি, কিন্তু আমারও হাসি পায়। ছেলেদের মধ্যে শয়তানের সুপ্রকাশ অংশটুকু, আমার পক্ষে অশোভন বলিয়া বোধ হয় না ......এতদিন পরে আমি পরের দাস হইলাম কিন্তু সরস্বতী দেবীর পবিত্র মন্দিরে দাস হইয়াও সুখী হইয়াছি। ..... এইবার আমি অবসর মত গদ্যপ্রবন্ধ লিখিবার চেষ্টা করিব।'[৪৩] পত্র মধ্যে প্রভাতকুমারের শুধু রঙ্গরস পূর্ণ জীবনদৃষ্টি নয়, শিশুজীবনের চাঞ্চল্যের প্রতি তাঁর প্রচ্ছন্ন সহানুভূতিও এখানে ব্যঞ্জিত হয়েছে। প্রসঙ্গত স্মরণ করা যায় শিশুদের দুরন্তপনার প্রতি রবীন্দ্রনাথের মনেও যথেষ্ট আনুকূল্য লক্ষ্য করা গেছে। গদ্য রচনায় উদ্যোগী হওয়ার কথাও এই সময় থেকে তিনি ভাবতে শুরু করেন।

এই সময়ের পর থেকেই প্রভাতকুমারের লেখনীমুখে গল্প গদ্য প্রবন্ধ নিবন্ধ রচিত হতে থাকে। অবশ্য প্রাথমিক পর্য্যায়ের গল্পরচনায় তাঁকে ছদ্মনাম ব্যবহার করতে দেখা যায়। রচনায় ছদ্মনাম ব্যবহার সম্পর্কে পরবর্তীকালে কৃষ্ণবিহারী গুপ্তের কাছে যে বিবৃতি দিয়েছিলেন তার অংশ বিশেষ উদ্ধৃত হল —

'...... আমার প্রথম বয়সের লেখা গল্প' ভুলভাঙ্গা' যখন ভারতীতে বাহির হয়, তখন ভারতীতে আমার নাম ছিল না — সে বৎসর ভারতীর কোন প্রবন্ধের নিম্নেই লেখকের নাম থাকিত না।...'[৪৪]

প্রভাতকুমারের প্রথম পর্য্যায়ের অন্যতম গদ্য রচনা রবীন্দ্রনাথের 'চিত্রা' কাব্যের আলোচনা। প্রভাতকুমার রচিত 'চিত্রা' নামধেয় রচনাটি 'দাসী' পত্রিকায় যে ১৮৯৬ সালে প্রকাশিত হয়। রচনাটির প্রকাশ সম্পর্কে পরবর্তীকালে কৃষ্ণবিহারী গুপ্তের কাছে প্রভাতকুমার যে বিবৃতি দিয়েছিলেন তাঁর ছদ্মনাম গ্রহণ প্রসঙ্গে সেই বিবৃতির অংশ বিশেষ স্মরণ করা যেতে পারে।

'.... কিন্তু তখন আমি ছিলাম কবি', সুতরাং গল্পে নিজের নাম না দিয়ো শ্রীরাধামণি দেবী একটি কাল্পনিক নাম সহি করিয়া দিয়াছিলাম। তাহার পূর্ব বৎসর কুন্তলীনের বাৎসরিক পুরস্কারের বিষয়ছিল 'পূজার চিঠি' — স্ত্রী যেন প্রবাসী স্বামীকে বাড়ী আসিবার জন্য পত্র লিখিতেছে, এটা

ওটা জিনিষের সহিত এক বোতল কুন্তলীন আনিতেও অনুরোধ করিতেছে — এইরূপ পত্র রচনা করিতে হইবে। শ্রীমতী রাধামণি দেবীর বেনামীতে আমি একখানি পত্র রচনা করিয়া পাঠাইয়া দিয়াছিলাম, উহা প্রথম পুরস্কার প্রাপ্ত হয়। সেই জন্য ঐ নামটির উপর কেমন মায়া হইয়া যায়, গল্পের ছদ্মনাম স্বরূপ উহাই ব্যবহার করি। ....'দাসী'তে চিত্রার এক সমালোচনা লিখিয়া পাঠাই। তাহাতে কোন নাম দিই নাই, আর 'প্রদীপে'র জন্য ওই গল্প রচনা করি। কিন্তু গল্পের কথা রবীন্দ্রবাবুকে আমি জানাই নাই। সেই সংখ্যা 'প্রদীপ' 'ভারতী'তে সমালোচনা করিয়া রবিবাবু (তিনি তখন 'ভারতী'র সম্পাদক) আমার গল্পটির সুখ্যাতি করিয়াছিলেন। পরবর্তী ভাদ্রের 'প্রদীপে' আর একটি গল্প ছাপা হইল, 'বেনামী চিঠি', তাহাও ওই রাধামণির বেনামীতে। রবিবাবু এবারও 'ভারতী'তে ইহার প্রশংসাপূর্ণ সমালোচনা করিলেন। তখনও তিনি জানেন না যে, আমিই রাধামণি। দুইবার এইরূপ অনুকূল সমালোচনা হওয়াতে আমার বুক বাড়িয়া গেল। দ্বিতীয় বৎসর 'প্রদীপে' নিজ মূর্ত্তি ধরিয়াই বাহির হইলাম। 'অঙ্গহীনা' এবং 'হিমানী' গল্প দুইটি আমার স্বাক্ষরযুক্ত হইয়া বাহির হইল .....'[৪৫] সম্ভবত: সঠিকভাবে স্মরণ না থাকায় প্রভাতকুমারের এই বিবৃতিতে একটু ভুল লক্ষ্য করা যায়। ইতঃপূর্বে 'দ্বিতীয় বিদ্যাসাগর' (ভারতী ভাদ্র ১৩০২) এবং 'নীলকুল বাসুদেব ব্রতকথা' (ভারতী, পৌষ ১৩০২) রচনা দুইটি প্রভাতকুমারের স্বনামেই প্রকাশিত হয়েছে।

রবীন্দ্রনাথের সংস্পর্শে এসে এবং তাঁরই নির্দেশে প্রভাতকুমারের সাহিত্যিক প্রতিভা ফুলে ফলে পল্লবিত হতে থাকে। এ সময় থেকে একাধারে তিনি যেমন গদ্য রচনা রীতিমতভাবে শুরু করেন অন্যদিকে কবিতা রচনাও অব্যাহত গতি পায়। অবশ্য প্রায় সব রচনাতেই রবীন্দ্রনাথের সংশোধনের সুযোগ থেকে যেত। রবীন্দ্রনাথকে লিখেছেন — '...... দুইচারি দিন পরে আমার হাতের-লেখা কয়েকখন্ড কাগজ আপনার হাতে পৌঁছিবে। তাহাতে থাকিবে —' 'দ্বিতীয় বিদ্যাসাগর' — বিদ্যাসাগর মহাশয় সম্বন্ধে একটি অপ্রকাশিত রহস্যজনক ক্ষুদ্র গল্প। এ গল্পটির সত্যতার সম্বন্ধে আমার কোন সন্দেহ নাই। আর থাকিবে —' নীলকুল বাসুদেবের ব্রতকথা'। আর থাকিবে' অনুবাদ ও অনুকরণের চারিটি কবিতা, খুব ফাঁক ফাঁক করিয়া লেখা সংশোধন করিয়া দিবার যথেষ্ট স্থান থাকিবে। এগুলি অগ্রহায়ণের সাধনার জন্য।'[৪৬] এরপর 'সাধনা' বন্ধ হয়ে যাওয়ায় রচনা দুইটি 'ভারতী'তে প্রকাশিত হয়েছিল যথাক্রমে ১৩০২ সালের অগ্রহায়ণ ও পৌষ সংখ্যায়।

সম্ভবতঃ চাকুরীর মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ায় ১৩০২ সালের মাঘ মাসের শেষদিকে প্রভাতকুমার জামালপুর স্কুলের শিক্ষকতা ছেড়ে দিয়ে দিলদারনগরে স্ত্রী-পুত্রের কাছে চলে আসেন। সাংসারিক দায় দায়িত্ব থাকা সত্ত্বেও তিনি তখন বেকার — স্বাভাবিকভাবে তাঁর মানসিক স্থৈর্য্য বিচলিত হবার কথা। কিন্তু এই অবস্থা - বিপাকেও তাঁর হাস্যরসিক মেজাজের পরিচয় পাই। রবীন্দ্রনাথকে জানিয়েছেন —' কি বলিব আমার ছেলে পড়িতে শেখে নাই। তাহার সম্প্রতি জজ হইবার সম্ভাবনা হইয়াছে মাত্র। বাবাজীবন যদি আপনার আশীর্বাদে এবং রাই-চরণের কল্যাণে শীঘ্র জজ হইতে পারেন, তবে ব্রহ্মজ্ঞানীকে লইয়া আমি গিয়া বৃন্দাবনে শেষদশাটা যাপন করি। আর কিছু না হউক, চাকরির জন্য দরখাস্ত করিয়া নিম্নে আমার আছে, ঐ সম্মান, মহাশয় হইতে আপনার সুবোধ ভৃত্য লিখিতে এড়াইয়া যাই।' [৪৭] এস্থলে একদিকে নিজ স্ত্রী পুত্রের প্রতি মমত্ববোধ যেমন প্রকাশিত অন্যদিকে চাকুরী অন্বেষণে ব্যস্ত - বিরক্ত দরখাস্তকারীর ক্রমবর্দ্ধমান বিতৃষ্ণা পরিস্ফুট হলেও তাঁর রসবোধ অক্ষুন্ন।

ব্যক্তিগতজীবনে কোন স্থায়ী কর্মের সংস্থান করতে না পারলেও তাঁর সাহিত্যসাধনার গতি কিন্তু রুদ্ধ হয়নি।' কাহিনী' কবিতাটি (পরবর্তীকালে 'হোলি - কাহিনী' নামে ১৩০৪ চৈত্র সংখ্যা'প্রদীপে' প্রকাশিত হয়েছে) রচনা করেন এই সময়ে। কবিতাটির রচনা প্রসঙ্গে তাঁর মানসিক পটভূমিকা এরকম ভাবে বিবৃত করেছেন —

' .... এখন আপনাকে ইহার জন্মইতিহাস বলি। কবিতাটি প্রায় সত্যঘটনায় প্রতিষ্ঠিত — মথুরাপ্রসাদ স্বয়ং কবি এবং কিষানপ্রসাদ তাহারই বন্ধু বীরেশ্বর বা অতুল। কবিতার সঙ্গে ঘটনার প্রভেদ এই যে ঈশ্বরেচ্ছায় মথুরাপ্রসাদ এখনও মরে নাই, এবং সেদিন কিষান প্রসাদের সাধ্য হয় নাই তাহাকে ধরিয়া রাখিতে। আমার বন্ধু স্বাস্থ্যলাভ উপলক্ষে কৈলোয়ার স্টেশনের দুই মাইল দূরে পল্লীগ্রামে বাস করিতেছিলেন। বাড়ীটা শোণ নদের তীরেই ছিল বটে। তিন বৎসরের কথা, দোলের দুই এক দিন পূর্বে বাঁকীপুর হইতে আমি সেখানে উপস্থিত হই —' অশ্বারোহণে ' নহে — রেলগাড়ীতে।' বৎসরকাল' নহে, দুই তিনি দিন পূর্বে পত্রে লিখিয়াছিলাম, বসন্ত পূর্ণিমার রাত্রে আর কোথাও থাকিবনা। বন্ধু কিছুতেই ছাড়িবেন না, মাংসাদি আনাইয়া আহারের সু - উত্তম বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন, আমিও থাকিব না। কোন মতেই তাঁহাকে আঁটিতে না পারিয়া অবশেষে বললাম — দেখ অতুল, আমি যদি আজ রাত্রে কলেরায় এখানে মরে যাই তবে ভূত হয়ে ঐ শোণের চড়ায় অন্ধকার রাত্রে যেতে দিলনা রে যেতে দিল না রে বলে চীৎকার করে ছুটোছুটি করে বেড়াব, তখন মুস্কিলে পড়বে, তোমার এখানে বাস করা অসম্ভব হয়ে দাঁড়াবে। একথা শুনিয়া'কিষণ প্রসাদ' আমার মুখ চাপিয়া ধরিলেন এবং আঙ্গিতে দিলেন। আমি তাঁহার স্ত্রী জাতিসুলভ Sensitiveness জনিত ভয় দেখিয়া এই কবিতা লিখিব বলিয়া

শাসাইয়া রাখিয়াছিলাম, তাহাই কার্যে পরিণত করিয়াছি।' ৪৮

'হোলি - কাহিনী' প্রভাতকুমারের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবিতা। একটি দীর্ঘদিন প্রবাস জীবন - যাপনান্তে গৃহাভিমুখী এক নববিবাহিত যুবকের বন্ধু পথিমধ্যে বন্ধুত্বের দোহাই দিয়া একদিনের জন্য তার যাত্রাকে স্থগিত করে কিন্তু দুর্ভাগ্য বশত: ঐ নববিবাহিত যুবকটির মৃত্যু ঘটে — এবং তার প্রিয়া মিলন আশায় বঞ্চিত আত্মাটি প্রতিরাত্রেই — 'যেতে দিলি নারে' বলে এক করুণ কান্নার মধ্যে দিয়ে শোণের উপকূলকে ব্যথাতুর করে তোলে।

জামালপুরে শিক্ষকতা কার্য সমাপ্তির পর (মাঘ ১৩০২) ন্যূনাধিক ফাল্গুন ১৩০৩ সাল পর্যন্ত স্ত্রী পুত্রের সঙ্গে তিনি দিলদারনগরে ছিলেন। ইতিমধ্যে সম্ভবত: রবীন্দ্রনাথ মারফৎ 'ভারতী' পত্রিকাগোষ্ঠীর সঙ্গে তাঁর পরিচয় ঘটে। এবং এই পরিচয় সূত্রে 'ভারতী'র কার্যালয় থেকে লেখবার জন্য প্রভাতকুমারের কাছে অনুরোধ আসে। রবীন্দ্রনাথকে জানিয়েছেন —

'ইতিমধ্যে ভারতী কার্যালয় হইতে লিখিবার জন্য এক নিমন্ত্রণ পত্র পাইয়াছি। তাঁহারা আমাকে চিনিলেন কেমন করিয়া? নিশ্চয় ইহা আপনার খেলা।' ৪৯

ভারতী কার্যালয়ের সঙ্গে পরিচয় এবং ঘনিষ্টতা প্রভাতকুমারের ভবিষ্যৎ জীবনে এক বিরাট পরিবর্তন আনে। এখানেই তিনি তদানীন্তন ভারতী'র সম্পাদিকা সরলা দেবীর সঙ্গে বিশেষ ভাবে পরিচিত হন — যে পরিচয় তার ব্যক্তিগত এবং সাহিত্য জীবনের ধারাকে নূতন পথে চালিত করেছিল।

দিলদারনগরে থাকাকালীন প্রভাতকুমার তাঁর ভবিষ্যৎ সাহিত্যিক জীবনকে রূপ দেবার জন্য আকুল হয়ে ওঠেন। কিন্তু সাহিত্যিক জীবনকে সুন্দরভাবে পরিচালনা করার মত কোন কর্ম্মসংস্থান তখনও তিনি করে উঠতে পারেন নি। এজন্য একসময়ে তিনি ভাবেন অধ্যাপনায় নিজেকে নিয়োজিত করতে পারলে অধিক অবসর পাবেন — এবং তার সাহিত্যচর্চ্চাও নির্বিঘ্নে চলবে। কিন্তু অধ্যাপনা বৃত্তির জন্য এম.এ. পাশ করতে হলে যে অর্থের প্রয়োজন তার সংকুলান কোথা থেকে হবে? এ ব্যাপারে তার মানসিক অবস্থার একটা অন্তরঙ্গ চিত্র পাই। রবীন্দ্রনাথকে লিখেছেন —

'.... 'দাসী' সম্পাদক শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে আপনার আলাপ আছে। এলাহাবাদে 'কায়স্থ পাঠশালা' নামক বেসরকারী কলেজের তিনি প্রিন্সিপ্যাল। তাঁহার সাহায্যে আমি এলাহাবাদে দুই তিনটি বড় বড়

প্রাইভেট ট্যুশন অনায়াসে যোগাড় করিতে পারিব এবং মিয়োর সেন্ট্রাল কলেজে সুচ্ছন্দে আমার এম.এ. পড়া চলিবে। রামানন্দবাবু সাহিত্যসেবী আপনার নামেরপ্রভাবে তাঁহার কাছে আমার বেশ প্রতিপত্তি হইবে। আপনি কেবল চিঠিতে তাঁহার কাছে আমাকে ভাল করিয়া introduce করিয়া দিবেন, বাকী সব আমি ঠিক করিয়া লইব। এখন যে আন্দাজটির উপর আমি নির্ভর করিতেছি, তাহা সত্য কিনা যেন আগামী পত্রে জানিতে পারি।

আমি বহু সৌভাগ্যবলে আপনাকে বন্ধুরূপে পাইয়াছি। আজ নিভৃতে আপনার কাছে আমার জীবনের প্রিয় স্বপ্নগুলি বলিয়া যাই। আমি সারাজীবন আমার মাতৃভাষার সেবায় নিযুক্ত থাকিব। আমার জীবনের মূর্তিমতী কবিতা সুন্দরীকে সুশিক্ষিতা করিয়া তাঁহাকে আমার intellectual companion করিয়া লইব। 'পরিচয়ে' সঙ্গিনী এবং একাকীতা কবিতা দুইটিতে এই বিষয়ে আমার একান্ত আকুলতা আপনি লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন। আমার এই স্বপ্ন দুইটি সফল হইবার পক্ষে এম.এ. পাশ করা নিতান্ত আবশ্যকীয়। গণিত বা বিজ্ঞানে এম.এ. পাশ করিলে অল্পদিনে আমি কোনও বেসরকারী কলেজে অধ্যাপক হইতে পারিব। দিবসে দীর্ঘ অবসর, বৎসরের এক তৃতীয়াংশ কাল অবকাশ, এমন সুবিধা আর কোথায় হইবে? কোন ভাবনা নাই কোনও দায়িত্ব নাই, ...? ৫০

অধ্যাপনার জীবন সম্মুখে তার এখানে কিছুটা উজ্জ্বল প্রকাশ পেলেও মাতৃভাষার প্রতি সুগভীর প্রীতি, অধিক অর্থে অনীহা এবং কবিতা রচনার প্রতি অত্যধিক আগ্রহ সুপরিস্ফুট। কবিতা রচনার প্রতি অত্যধিক আগ্রহী হওয়ায় তিনি এসময় থেকে কবিতার ছন্দ চর্চ্চায় অত্যধিক মনোযোগ দেন। এ প্রসঙ্গে তিনি রবীন্দ্রনাথের সাথে পত্রে যোগাযোগ করেন।

'..... আপনি বলেন আপনার ছন্দে হ্রস্বদীর্ঘের মারপ্যাঁচ নাই। নিম্নে আপনাকে আক্রমন করিতেছি, আপনি আত্মরক্ষা করুন।

আপনার মতে

রাজার ছেলে ফিরেছি দেশে দেশে
সাত সমুদ্র তের নদীর পার।

ইহার ভিতর যুক্তাক্ষর ছাড়া সবই একমাত্রা। তাহা হইলে প্রথম ছত্রে বারোটি অসংযুক্তাক্ষর, সুতরাং ১২ মাত্রা, দ্বিতীয় ছত্রে ১১টি অসংযুক্ত, একটি যুক্ত সুতরাং ১১ + ১ X ২ = ১৩ মাত্রা সুতরাং ছন্দ পতন হইয়াছে।

আমার মতে দেখুন,

আমি যেখানে দীর্ঘ পড়ি, তাহা দুই মাত্রা, যুক্তাক্ষরও দুইমাত্রা, আর

সব একমাত্রা , সুতরাং প্রথম ছত্রে —

রাজার ছেলে ফিরেছি দেশে দেশে
সাত সমুদ্র তেরো নদীর পার ।

১ + (দ্র =) ২ + ২ X ২ = ১৫ মাত্রা , সুতরাং ছন্দ ঠিক আছে । " মু" র পর যুক্তাক্ষর রহিয়াছে , সুতরাং "মু" গুরু , দীর্ঘ করিবার প্রয়োজন হইল না ।' [৫১]

তবে একমাত্র সত্য ছন্দের মাত্রা ইত্যাদির ঠাঁট বজিয়ে রাখতে গিয়ে — তাঁর অনেক কবিতাই রসোত্তীর্ন হতে পারেনি ।

১৩০৩ সাল থেকে দেখা যায় কবিতা রচনার সঙ্গে সঙ্গে সমালোচনামূলক রচনায় তিনি যেমন ব্রতী হয়েছেন অন্যদিকে ছোটগল্প রচনা কৌশল অধিগতের জন্য রবীন্দ্রনাথের সাহায্যপ্রার্থী হয়ে তাঁকে লিখেছেন — ' ..... ছোটগল্প লিখিবার হদিশও আমাকে শিখাইয়া দিলেন না । আশা করি পত্রে এ বিষয়ে কিঞ্চিত লেক্‌চার পাঠাইবেন অবসরমত ।' [৫২] অন্যত্র —

'আপনি যে ছোটগল্পগুলি লিখিয়াছেন , তাহার আদর্শ পাশ্চাত্য সাহিত্য হইতে গ্রহণ করিয়াছেন না আপনার নিজের সৃষ্টি তাহা জানিতে ইচ্ছা করি । আপনার সমস্ত ছোটগল্পগুলির এক দীর্ঘ সমালোচনা করিবার চেষ্টায় আছি । যদি ইহার আদর্শ পাশ্চাত্য সাহিত্য হইতে লইয়া থাকেন , তবে তাহা কোন ভাষার সাহিত্য এবং ছোটগল্প লেখায় বিশেষ পারদর্শী কোন কোন লেখক , তাঁহাদের পরিচয় আমাকে জানাইবেন । ইংরাজীতে লক্ষ্মীছাড়া লক্ষ্মীছাড়া Bow Bell Novelettes পড়িয়াছি সেগুলা ছোট বটে কিন্তু আপনার ছোটগল্প জাতীয় নহে — আমি জানিতে চাহি , কোনও প্রতিভাশালী ইংরাজী ফরাসী বা জর্মান লেখক ঐ জাতীয় গল্প লিখিয়াছেন ও লিখিতেছেন কি না । ..... ' [৫৩]

দেখা যায় এসময়েও প্রভাতকুমারের ছোটগল্পের রস রীতি সম্পর্কে খুব সুস্পষ্ট ধারণা হয় নাই তবে তিনি তার জ্ঞান ভান্ডারকে পূর্ণ করে নেবার জন্য সদা সর্বদা চেষ্টা করে চলেছেন ।

এবৎসর তাঁর প্রকাশিত গদ্য রচনা মাত্র দুইটি।

১। ছেলে মানুষ করা (প্রকাশ 'ভারতী' আশ্বিন, ১৩০৩)
২। ভূত না চোর ?(গল্প প্রকাশ,- ঐ,- চৈত্র, ১৩০৩)

অবশ্য বেশ কয়েকটি কবিতা এই বৎসর (১৩০৩ সাল) প্রকাশিত হয়েছে যেমন :—

১। আলোক (প্রকাশ ঐ, ভারতী, বৈশাখ, ১৩০৩)

২। অতৃপ্তি (,, ,, চৈত্র, ১৩০৩)

৩। ক) করযোড়ে করি প্রার্থনা তোরে
খ) প্রেম ও আশা
গ) নাম লেখা
} অনুবাদ কবিতা। প্রকাশ ভারতী, ফাল্গুন, ১৩০৩

৪। অবসান (ভারতী, ভাদ্র, ১৩০৩)

সম্ভবতঃ অর্থাভাবে প্রভাতকুমারের এম.এ. পড়া শেষ পর্যন্ত হয়ে ওঠেনি। ইত্যবসরে তিনি Indian Secretariat এ Clerkship পরীক্ষা দিয়ে উত্তীর্ন হন। এই সরকারী কার্যোপলক্ষে তাঁকে কিছুদিন সিমলায় অস্থায়ীভাবে বসবাস করতে হয়। সিমলাতে তিনি Office of the Commissary General - in Chief এ কাজ করতেন। চাকুরীর এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলে রবীন্দ্রনাথকে জানিয়েছেন —' শুনিয়া সুখী হইবেন, আমি কৃতকার্য হইয়াছি। দুই চারি বা ছয় মাসের মধ্যে Indian Secretariate হইতে আমাকে ডাকিয়া লইবে। সে কার্যে আমাকে ৭ মাস সিমলা পাহাড়ে এবং ৫ মাস কলিকাতায় থাকিতে হইবে, সিমলায় অবস্থান কালীন বেতন দ্বিগুণের কিছু বেশী পাওয়া যাইবে। ৫০/৬০ টাকায় আরম্ভ করিতে হয়, কিন্তু শেষে আশা অনেক, Indian Secretariate এ ৭০০/৮০০ পর্যন্ত বাঙ্গালীতে পাইতেছে।' [৫৪] চাকুরী প্রাপ্তিতে কর্ম-সংস্থানজনীত মানসিক শান্তি লাভ করিলেও সাহিত্য রচনায় তিনি আরও মগ্ন হয়ে ওঠেন। শুধু সাহিত্য রচনা নয় সাহিত্যিকগণের সঙ্গে ব্যক্তিগতভাবে পরিচিত হবার জন্য তিনি ছিলেন সমপরিমানে আগ্রহী। ইতোপূর্বে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে আলাপ এবং অন্তরঙ্গতা স্থাপিত হয়েছে। নিজ চেষ্টায় কবিবর হেমচন্দ্রের সঙ্গে তিনি পরিচিত হন। 'আমি তখন আলিপুরে আমার মাতুলালয়ে থাকি। কয়েকমাস পরে, একদিন রবিবার প্রাতে, আমি আমার মামাতো ভাই ও ভগিনীপতি, তিন বায়ুনে মিলিয়া হেমবাবুকে দেখিবার জন্য খিদিরপুর যাত্রা করিলাম।' [৫৫] কবিবর হেমচন্দ্রের সঙ্গে সাক্ষাৎকারের কিছুদিন পরেই নূতন চাকুরী নিয়ে প্রভাতকুমার সিমলায় চলে যান। সাহিত্যরসিক এবং গুণগ্রাহী তদানীন্তন নাটোরের মহারাজা জগদিন্দ্রনাথ রায় মহাশয়ের সঙ্গে এখানেই তাঁর পরিচয় এবং অন্তরঙ্গতা স্থাপিত হয়। বায়ুপরিবর্তনের জন্য মহারাজ তখন কিছুদিনের জন্য সিমলায় গিয়েছিলেন। প্রভাতকুমার নিজ আগ্রহেই মাঝে মাঝে মহারাজের সিমলাস্থিত আবাসস্থলে উপস্থিত হয়ে তাঁর সঙ্গে সাহিত্যালোচনায় যোগ দিতেন। এখানেই প্রভাতকুমারের' সিমলা - শৈল' নামক ভ্রমন কাহিনী মূলক রচনাটির সৃষ্টি। রচনাটি ১৩০৪ সালের ফাল্গুন মাসে'প্রদীপ' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। রচনাটিতে

সিমলার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য বর্ণনার সঙ্গে লেখকের ইতিহাস প্রীতির পরিচয় আছে। এখানকার প্রবাসী বাঙ্গালীদের জীবন যাত্রার মনোজ্ঞ বিবরণ থাকলেও বাংলা সাহিত্য পাঠে তাদের অনীহা প্রভাতকুমারকে ব্যথিত করেছে।

মহারাজ জগদিন্দ্রনাথ রায়ের মৃত্যুর পর তাঁর স্মৃতিচারণকালে সিমলায় উভয়ের প্রথম সাক্ষাৎ পরিচয়ের বিবরণ সুন্দরভাবে প্রভাতকুমার লিপিবদ্ধ করেছেন —'..... তাঁহার সহিত প্রথম সম্পর্ক - সে আজ ২৯ বৎসর পূর্বের কথা — ইংরাজী ১৮৯৭ সালে, বোধ হয় জুন কিংবা জুলাই মাস। আমি তখন সুদূর পাঞ্জাবে — সিমলা শৈলে, ভারতীয় সেক্রেটারিয়েট দপ্তরে একজন ক্ষুদ্র কেরাণী। শুনিলাম, নাটোরের মহারাজা সপরিবারে বায়ু পরিবর্তনে আসিয়াছেন। রাণী ভবানীর বংশধর সিমলায়! তাঁহাকে একবার দেখিতে হইবে ত! শুধু চোখের দেখা — দূর হইতে দেখিব মাত্র। একজন ক্ষুদ্র কেরাণী, সে যে মহামহিমান্বিত রাণী ভবানীর বংশধর নাটোরাধিপতির সহিত সাক্ষাৎভাবে পরিচিত হইবার স্পর্ধা রাখিবে — এ তো অতি হাস্যজনক কথা — নিছক বাতুলতা! সুতরাং সে আকাঙ্ক্ষা মনে স্থান দিই নাই। কিন্তু ক্রমে শুনিলাম, মহারাজ জগদিন্দ্রনাথ সে প্রকৃতির মানুষ নহেন — ধনের অহঙ্কার তাঁহার নাই, আভিজাত্যের অভিমান তাঁহার নাই, মহারাজ হইলেও তিনি ভদ্রলোক। আরও শুনিলাম, মহারাজের নিকট গুণীর নাকি ভারি আদর — সেক্রেটারিয়েটের একজন কেরাণী' —' বাবু বিশেষ গীতবাদ্যকুশল, মহারাজ প্রায়ই তাঁহাকে সাদরে আহ্বান করিয়া নিজ বাসায় লইয়া যান, তাঁহার গান শোনেন, এমন কি একত্র বসিয়া তাঁহার সহিত আহারও করিয়া থাকেন! শুনিয়া খুব আশ্চর্য্যবোধ হইল। .....একত্র বসিয়া ভোজন করেন — এটা তো নূতন কথা বটে! তখন মহারাজের সাক্ষাৎ পরিচয়লাভের উচ্চাশা আমার মনে উদিত হইল। কিন্তু আমি তো গুণীলোক নই — মুস্কিল যে এইখানে। এক বিষয়ে একটুখানি গুণী বটে — তাহার বৎসর দুই পূর্ব হইতে দাসী, সাধনা ও ভারতী পত্রিকায় আমার স্বরচিত কবিতা বাহির হইতেছে, — কিন্তু রাজা মহারাজারা কি আর লেখাপড়ার চর্চ্চা করেন, বাঙ্গলা মাসিকপত্র পড়েন, যে সে খবর রাখিবেন? রামচন্দ্রঃ। তবু যাই, একদিন গিয়া দেখা করিয়াই আসি।

কলিকাতাস্থ কোন একজন বিশিষ্ট সাহিত্য - বন্ধুর একখানি পরিচয়পত্র সংগ্রহ করিয়া, একদিন রবিবারে বেলা ৮টা ৯ টার সময়, মহারাজের প্রবাসভবন' The Retreat নামক গৃহে গিয়া উপস্থিত হইলাম। দ্বারবানেরা আমাকে খেদাইয়া দিল না — তখনই মহারাজের সন্নিধানে লইয়া গেল। নীচ তলায় বৈঠকখানাঘর, মহারাজা, যতদূর মনে পড়ে, ধূতির

উপর শাল গায়ে দিয়া চেয়ারে বসিয়া সুবৃহৎ এক আলবোলায় তামাক সেবন করিতেছিলেন। মহারাজ উঠিয়া দাঁড়াইয়া, আমার করমর্দন করিয়া, সৌজন্য-সূচক পূর্ণ ভাষায় অভ্যর্থনা করিয়া বসাইলেন। মহারাজা কথা কহিতে লাগিলেন। সে সময়ের কিছু পূর্বে' দাসী'পত্রিকায় রবীন্দ্রবাবুর কাব্যের একটি সুদীর্ঘ সমালোচনা বাহির হইয়াছিল। লেখক কোন একটি কবিতাকে একটু বেশী রকম আক্রমণ করিয়াছিলেন। মহারাজা রবিবাবুকে সমর্থন করিতে লাগিলেন। কাব্য গ্রন্থাবলী খুলিয়া, কবিতাটি ধীরে ধীরে পাঠ করিয়া আমায় শুনাইলেন। কি সুন্দর, কি সরল সেই পাঠের ভঙ্গি! সমালোচকের মতের বিরুদ্ধে যে যুক্তিগুলির অবতারণা করিলেন, সেগুলির ভাব, ভাষা ও ব্যঞ্জনার সৌন্দর্য্যে আমি মুগ্ধ হইয়া গেলাম। ঘণ্টাখানেকের উপর, সাহিত্যালোচনা চলিল। অবশেষে আমি বলিলাম, " মহারাজ, আপনারা এত পড়াশুনা — কাব্যরসবোধ এমন গভীর, আপনি লেখেন না কেন ?"

মহারাজ হাসিয়া বলিলেন, ' আমি যদি লিখি, সে যে কি চীজ দাঁড়াবে, তাতো আপনি জানেন না প্রভাতবাবু, তাই এ কথা বলছেন।'

আমি বলিলাম, 'না মহারাজ, 'চীজ'ভালই দাঁড়াবে। আপনাকে ~~xx~~ ছাড়ছিনে, লিখতেই হবে।'

তখন কে জানিত যে একদিন, আমি তাঁহার সাহিত্যপথের নিত্য সহচর হইবার সৌভাগ্যলাভ করিব ?

আরও দুই তিন রবিবার গিয়া, মহারাজের সময় নষ্ট করিয়াছিলাম। লিখিবার জন্য তাঁহাকে তাগিদ করিতে ছাড়িলাম না। তার পর, আমার কলিকাতায় ফিরিতে হইল।

প্রথম সাক্ষাতের বিবরণটুকুই এই স্থানে সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ করিলাম, কারণ, তাঁহার সহিত আমার সাহিত্য সাহচর্য্যের অঙ্কুর সেখানেই।' [৫৬]

জগদিন্দ্রনাথের সঙ্গে সাক্ষাৎকারের এই বিবরণ থেকে প্রভাতমানসিকতার পরিচয়ও অনুধাবন করা যেতে পারে। সাহিত্য এবং সাহিত্যিক উভয়ের প্রতি হৃদয়ের আকর্ষনেই তিনি রবীন্দ্রনাথ, হেমচন্দ্র ~~xx~~ রমেশচন্দ্র দত্ত ইত্যাদি বিখ্যাত ব্যক্তিগণের সঙ্গে স্বেচ্ছায় আলাপ পরিচয় করে নিতেন। এছাড়াও ব্যক্তিগত তাগাদায় প্রায়শই এঁদের দিয়ে কিছু কিছু সাহিত্য সৃষ্টি সম্ভব করে বাংলা সাহিত্যের সমৃদ্ধি ঘটিয়েছেন। পরবর্তী জীবনের প্রবাসবাসকালে রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের দ্বারা কিছু মূল্যবান প্রবন্ধ লিখিয়ে নিয়েছিলেন। এখানে দেখি জগদিন্দ্রনাথকে লেখার জন্য পুনঃ পুনঃ অনুরোধ করেছেন।

প্রভাতকুমারের ভবিষ্যৎ জীবনের গতিপথ পরিবর্তনে জগদিন্দ্রনাথের সহায়তার কথাও এই প্রসঙ্গে স্মরণীয় !

সিমলায় অবস্থানকালে প্রভাতকুমারের স্ত্রী বিয়োগ ঘটে । শোনা যায় ব্রজবালা দেবীর উপর্য্যুপরি দুইটি সন্তানের জননী হওয়ায় অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং রক্তাল্পতাহেতু মৃত্যুমুখে পতিত হন । স্ত্রীর এই অকালবিয়োগে স্বাভাবিকভাবেই প্রভাতকুমার অত্যন্ত দুঃখকাতর হয়ে পড়েন । ব্যথিতহৃদয়ে রবীন্দ্রনাথকে জানিয়েছেন —

' ..... গত ১৫ই শ্রাবণ, আমার এ জন্মটা নিষ্ফল করিয়া দিয়া, পৃথিবী অন্ধকার করিয়া দিয়া আমার স্ত্রী চলিয়া গিয়াছেন ।

আমি জড়বাদী নহি । অপিচ ঈশ্বরের মঙ্গলময়ত্বে দৃঢ়বিশ্বাস করি। সেই জন্য আমি নিশ্চিন্ত আছি — এবং নিশ্চিন্ত আছি যে এ বিরহ চিরবিরহ নহে । আমি ধৈর্য্য ধরিয়া সেই শুভমিলনের দিন প্রতীক্ষা করিতেছি । যদি কখনও ঈশ্বরের মঙ্গলময়ত্বে বিশ্বাস হারাই, তবেই এই পুনর্মিলনের আশা ভাঙ্গিবে ।

আমার ছেলে দুইটি ভাল আছে । সেই ভয়ানক দিনে ছোটটি নয় মাসের মাত্র ছিল ।' [৫৭]

এখানে প্রভাতকুমারের এক নূতন জীবনদৃষ্টির পরিচয় পাওয়া যায়। স্ত্রীর মৃত্যুতে শোক কাতর হলেও তিনি এই বিরহকে চিরবিরহ বলে মনে করেন নি । ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাসী প্রভাতকুমার পার্থিব জগতের দুঃখ দৈন্য ক্লান্তিকে ভুলতে চেয়েছেন, অপার্থিক জীবনের চির মাধুর্য্যকে স্মরণ করে। প্রাসঙ্গিকভাবে স্মরণ করা যায় প্রভাতকুমারের সুহৃদ নাটোরাধিপতি মহারাজ জগদিন্দ্রনাথ রায়ের মৃত্যুতে শোক জ্ঞাপন কালে তিনি প্রাসঙ্গিকভাবে লিখেছিলেন —

' অবিমিশ্র দুঃখ সংসারে নাই — থাকিলে সংসার চলাই দায় হইত ।' [৫৮] প্রকৃতপক্ষে প্রভাত জীবনেও দেখি এই মৃত্যুজনিত দুঃখ খুব বেশীদিন স্থায়ী হয় নাই । এই প্রসঙ্গে প্রভাতকুমারের 'মায়াবাদ' (পৌষ, ১৩০৪) কবিতাটি স্মরণীয় । ১৩০৪ সালে প্রকাশিত অন্যান্য কবিতা যথাক্রমে — ব্যক্তি (বৈশাখ, ১৩০৪), মঙ্গলগ্রহ (জ্যৈষ্ঠ, ১৩০৪) কাব্যবিজ্ঞান (শ্রাবণ, ১৩০৪) সে আমার (ভাদ্র, ১৩০৪), হোলি কাহিনী (চৈত্র, ১৩০৪)।

স্ত্রীর মৃত্যুর অব্যবহিত পরে' ভারতী' ভাদ্র, ১৩০৪ সালে প্রকাশিত 'সে আমার' কবিতাটিতে প্রভাতকুমারের এই মনোভাব সুন্দরভাবে ব্যক্ত হয়েছে +—

শুধু রজনীর নহে সে আমার ,
সে আমার সারা দিবসের ।
শুধু বসন্তের নহে সে আমার ,
সে আমার সারা বরষের ।
কেবল সুখের নহে সে আমার ,
সুখের দু:খের সমানে ।
কেবল নহে সে কন্ঠের সঙ্গীত
সে - ই অশ্রুধারা নয়ানে ।
শুধু যৌবনের নহে সে আমার ,
সে আমার সারা জনমের ।
শুধু এ জন্মের নহে সে আমার ।
সে আমার চির জীবনের ।

.. ..

....

যদি , এ সৌরজগতে পৃথিবীর চেয়ে
সমুন্নত গ্রহ রহে গো ,
তবে , সে সব গ্রহেরও হবে সে আমার ,
শুধু পৃথিবীর নহে গো ।

কয়েক মাস সিমলায় চাকুরী করার পর তিনি কলকাতায় এসে 'ডিরেক্টর জেনারেল অব টেলিগ্রাফসের' অফিসে স্থায়ী ভাবে নিযুক্ত হন ।' [৫৯] কলকাতায় এই সময়ে প্রভাতকুমার তাঁর ছোটমামা বিষ্ণুচরণ চট্টোপাধ্যায়ের (আলিপুরের জেলার) সরকারী আবাসে ছিলেন ।' [৬০] বিষ্ণুচরণ ~~মুখো~~ চট্টো-পাধ্যায় ছিলেন কিছুটা রাশভারী এবং মেজাজী পুরুষ। এখানে থাকাকালীন প্রভাতকুমার মামার প্রকৃতিকে সূক্ষ্মভাবে পর্য্যবেক্ষণ করেন এবং তাঁর রচনায় যেখানে বদরাগী রাশভারী পুরুষের ~~স~~ চরিত্র এঁকেছেন সেগুলি অনেকাংশে এইমামার চরিত্রের অনুরূপ । [৬১] 'প্রণয় পরিনাম'(ভাদ্র, ১৩০৮) গল্পে মাণিক-লালের পিতা ডাক্তার নন্দ চৌধুরীর চরিত্রে এই রূপের প্রতিফলন ঘটেছে । পুত্র মাণিকের ~~ক~~ কুসুমলতার সাথে প্রেমে পড়ার কথা প্রভাসের মুখে জানতে পেরে তিনি মাণিককে ডাকিয়ে এনে ——

' জিজ্ঞাসা করিলেন , তোর এগজামিন কবে ?'
মাণিক বলিল , 'আর বারো দিন আছে ।'
' কি রকম তৈরী হল ?'
' আজ্ঞে হয়েছে এক রকম ।'
'পড়াশুনা করছিস বেশ মন দিয়ে ? না ~~খা~~ খালি খেলিয়ে খেলিয়ে বেড়াচ্ছিস ?'

'আজ্ঞে না খুব খেলা বেশী করিনে ।'

'তবে কি করিস ? 'নবে' পড়েছিস নাকি শুনলাম ?'

মাণিক তাঁহার সুর ও ভঙ্গিমা দেখিয়া উত্তর করিতে সাহস করিল না । দাঁড়াইয়া ঘামিতে লাগিল ।

তাহার পিতা ধীরে ধীরে তাহার কাছে সরিয়া আসিলেন , আসিয়া বাম হস্ত দ্বারা মাণিকের দক্ষিণ কর্ণটি ধারণ করিলেন । করিয়া বলিলেন , 'উত্তর দিচ্ছিসনে যে ?

মাণিক কি একটা কথা বলিবার চেষ্টা করিল , কিন্তু বাহির হইল না । তাহার পিতার রক্তচক্ষু দুইটা ঘুরিতে লাগিল। দন্তে দন্ত ঘর্ষিত হইতে লাগিল ।

ঘূর্ণায়মান চক্ষু স্থির হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বলিলেন , 'ইন্টুপিড্ শুয়োর ! আজ বাদে কাল এগজামিন — লেখাপড়া গেল , নব হচ্ছে ? বলিয়া ঠাস ঠাস করিয়া তাহার গন্ডদেশে কয়েকটা চড় কষাইয়া দিলেন ।'

(৪)

প্রভাতকুমারের জীবনে এই পর্বের কলিকাতা বাস এক বৈপ্লবিক পরিবর্তনের ইঙ্গিতবাহী । ইতঃপূর্বে 'ভারতী' পত্রিকায় তিনি প্রায় নিয়মিত ভাবে রচনা পাঠিয়েছেন । তাঁর রচনাগুলিতে আকৃষ্ট হয়েছিলেন 'ভারতী'র তদানীন্তন সম্পাদিকা স্বর্ণকুমারী দেবীর বিদুষী কন্যা সরলা দেবী । প্রভাতকুমারের কলিকাতায় আগমন এবং রচনা প্রকাশ সূত্রে 'ভারতী'র অফিসে যাতায়াতের ফলে সরলাদেবীর সঙ্গে ব্যক্তিগত পরিচয় সুদৃঢ় হয় এবং উভয়ে ঘনিষ্ঠ হয়ে ওঠেন । সাহিত্যের আসরে ঠাকুর পরিবারে প্রবেশাধিকার পেলেও আত্মীয়তা স্থাপনের মত যোগ্যতা তখনও তিনি অর্জন করতে পারেন নি । নিজেকে ঠাকুর পরিবারের যোগ্য করে নেবার জন্যই সম্ভবত: এই সময়ে তিনি ডেপুটিগিরি পরীক্ষার জন্য প্রস্তুতি নিতে থাকেন । আলিপুর থেকে লেখা এক চিঠিতে রবীন্দ্রনাথকে জানিয়েছেন —' ডেপুটিগিরী পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হইতেছি , এখন ছয়মাসকাল অত্যন্ত ব্যস্ত থাকিব , —[৬২] এই ব্যস্ততার মধ্যেও তাঁর সাহিত্যসাধনার বিরাম ঘটেনি বরং রচনা প্রবাহ নবোদ্যমে প্রবাহিত হয়েছে । পত্রিকা সম্পাদনার ব্যাপারেও সরলাদেবীকে রীতিমত সাহায্য করেছেন । রবীন্দ্রনাথকে লিখিত (২৪ জ্যৈষ্ঠ, ১৩০৬) প্রভাতকুমারের এক পত্র এর সাক্ষ্য বহন করছে । প্রভাতকুমার লিখেছেন —'..... আমি শ্রীমতী সরলাদেবীকে লিখিয়াছিলাম যে রবিবাবুর গল্পের মধ্যে একটি প্রদীপের জন্য দান করুন, আমি সেটির বিনিময়ে আমার দুইটি নূতন গল্প আপনাকে দিব ।

ও মহাশয়, তাহাতে ভয়ানক বিভ্রাট বাঁধিয়া গিয়াছে। শ্রীমতী সরলা চারপৃষ্ঠাব্যাপী এমন একখানি পত্র আমাকে লিখিয়াছেন যে, আমি লেজ গুটাইয়া প্রস্তাব প্রত্যাহার করিবার পথ পাই নাই। পরন্তু এ প্রস্তাব না করিলে হয়ত মাঝে মাঝে আমার একটা গল্প ভারতীতে দিলে চলিত এখন প্রতিমাসে গল্প না দিলে আর এ পাপের প্রায়শ্চিত্ত হইবার উপায় দেখিতেছিনা। আষাঢ়ের ভারতীর জন্য গল্প আমি দিয়াছি।...... আমাকে যতশীঘ্র পারেন একটি প্লট পাঠাইয়া দিবেন, ভাদ্রের জন্য সেটি এখন হইতে তৈয়ারি করিতে আরম্ভ করিব। আমি ভারতী সম্পাদিকার ওকালতনামা গ্রহণ করিয়াছি সুতরাং আমার কথা authoritative মনে করিবেন।' ৬৫

সরলা দেবীর সান্নিধ্য সহযোগিতা প্রভাতকুমারের মনে নূতন নীড় বাঁধার স্বপ্ন জাগিয়ে দেয় এবং সাহিত্যসৃষ্টিতেও অফুরন্ত প্রেরণাদান করে। এই বৎসরে (১৩০৬) ন্যূনাধিক তাঁর নয়টি কবিতা এবং দশটি গল্প প্রকাশ লাভ করে। গল্প রচনায় রবীন্দ্রনাথের সাহায্য প্রায়শই কামনা করেছেন।' ভুলভাঙ্গা' (জ্যৈষ্ঠ, ১৩০৬) গল্পের প্লটটি রবীন্দ্রনাথের কাছে পাঠিয়ে প্রার্থনা করেছেন —' এই গল্পের ঘটনাসমাবেশে যদি কিছু suggest করিবার থাকে, তবে আশা করি, কৃপণতা করিবেন না।' ৬৩ রবীন্দ্রনাথের পরামর্শ মত কিছু পরিবর্তনাদি নিয়ে গল্পটি প্রকাশিত হয়েছিল। পরবর্তীকালে কৃষ্ণবিহারী গুপ্তের কাছে গল্পটি সম্পর্কে একটি কৌতুককর বিবৃতি দিয়েছিলেন। অংশবিশেষ এখানে স্মরণ করা যেতে পারে। ....: ' আমার প্রথম বয়সের লেখা গল্প 'ভুলভাঙ্গা' যখন 'ভারতী'তে বাহির হয়, তখন তাহাতে আমার নাম ছিল না — সে বৎসর ভারতীর কোন প্রবন্ধের নিম্নেই লেখকের নাম থাকিত না। আমি অনেককাল জামালপুরে ছিলাম, কাজেই ঐ গল্পে জামালপুরের যে চিত্র দিয়াছিলাম, তাহা বোধ হয় অপ্রকৃত হয় নাই, কিন্তু গল্পটি ছিল আগাগোড়া কাল্পনিক, জামালপুরের অনেকেরই বোধ হয় ধ্রুব বিশ্বাস হইয়াছিল যে ঘটনাটা সত্য। আর একটা বড় কৌতুককর ব্যাপার হইয়াছিল। 'ঘোড়া নিম' বলিয়া এক প্রকার গাছ আছে তাহা বোধ হয় আপনি জানেন। আমার এই গল্পের বিষয়ীভূত গৃহস্থের বাড়ীর সম্মুখে একটি ঘোড়া নিমের গাছ আছে, এইরূপ আমি লিখি। এখন মুদ্রাকরের অনুগ্রহে' ঘোড়া নিম'' যোড়া নিম' এ রূপান্তরিত হইয়া ছাপা হইয়াছিল। যাহারা গল্পটি সত্য বলিয়া মনে করিয়াছিলেন, তাঁহারা জামালপুরে কোন বাঙ্গালীর বাড়ীর সম্মুখে, দুইটি নিমগাছ আছে, তাহার অনুসন্ধানে বিলক্ষণ পরিশ্রম করিয়াছিলেন। ৬৪

১৩০৬ সালের আষাঢ় মাসে 'ভারতী' পত্রিকায় তাঁর 'কুড়ানো মেয়ে' গল্পটি প্রকাশিত হয় । গল্পটি সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথকে জানিয়েছেন — ... ' গল্পে স্ত্রীবিয়োগবিধুর নব্যনায়কটির বর্ণনায় লিখিয়াছি —' রবীন্দ্রীয় কেশদাম তাহার কমনীয় মুখে মুখসৌন্দর্য্য বহুগুণ বর্দ্ধিত করিয়াছিল ।' গল্পটি পড়িয়া আমার ছোটমামা বলিলেন —' ওটা কেন লিখিয়াছ লিখেছ , হয়ত রবিবাবু রাগ করবেন ।' আমি বলিলাম —' আমি ত compliment বলে mean করেছি' । — যাহা হউক আপনাকে পূর্ব হইতে সাবধান করিয়া দিলাম , আপনি যেন রাগ করিয়া বসিবেন না ।' [৬৬] কবিতা রচনা সম্পর্কেও রবীন্দ্রনাথের মতামত এই সময়ে প্রার্থনা করেছেন । অভিশাপ' (আশ্বিন ১৩০৬) কবিতাটির পরিনাম সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের কাছে জানতে চেয়েছেন — আমার এক বন্ধু তর্ক করিতেছেন , পরিণাম এইরূপ হওয়া উচিত নয় , হইলে artistic হইল না । তিনি বলেন , এই ব্যঙ্গ কবিতার point হইতেছে fact এর সহিত বিরোধিতা , আগাগোড়া অসম্ভব ও অসঙ্গতি সৃষ্টি — তাহার সহিত পরিণামের fact এর সহিত সঙ্গতিটি (আমি যেমন করিয়াছি)মোটেই খাপ খায় নাই না ।

এই ত বিবাদ আপনার কাছে আপিল করিতেছি । বিচার করিয়া বলুন , আমার পরিণাম সঙ্গত না বন্ধুর উপদিষ্ট পরিণাম সঙ্গত ।' [৬৭]

এই সময়ে সরলা দেবীর সঙ্গে তাঁর হৃদ্যতা বৃদ্ধি পায় এবং পারস্পরিক-ভাবে তাঁরা ঘনিষ্ঠ হয়ে ওঠেন । সম্ভবতঃ এই হৃদ্যতার কথা রবীন্দ্রনাথের অবিদিত ছিল না । প্রভাতকুমারের প্রতি স্নেহ বশেই তাঁর সম্পর্কে প্রশংসাসূচক অনেক কথাই রবীন্দ্রনাথ সরলা দেবীকে বলেছেন । রবীন্দ্রনাথের এই প্রশংসা-ব্যঞ্জক কথাগুলি সরলাদেবী মারফৎ প্রভাতকুমারও প্রায়শই জানতে পারতেন । রবীন্দ্রনাথকে লিখিত প্রভাতকুমারের একটি পত্রে দেখি — '... বাহিরের যত লোকের সঙ্গে আপনার আলাপ হইয়াছে , সবচেয়ে আমাকে ভাল লাগিয়াছে ? আমি একটা genuine পাগল , আমার ভিতরে affection এর লেশমাত্র নাই ? আমার কবিতায় যেমন একটা peculiar flavour আছে , মানুষটির ভিতরে তাই আছে । গোড়া থেকে আমার সব চিঠিগুলি আপনি তুলিয়া রাখিয়াছেন রেখেছেন , একখানিও ছেঁড়েন নাই ?

আঃ এই কথাগুলি আপনার দুর্ম্মূল্য (Precious) ভাগিনেয়ীটির কাছ হইতে আদায় করিতে আমার কষ্ট টা যা হইয়াছে । যেদিন বৈকালে আপনি তাঁহাকে এই কথাগুলি বলেন , তাহার পরদিনই আমার কাছে রিপোর্ট আসিল ' কাল যোড়াসাঁকো হইতে বাড়ী' ফিরিতে রবি মামার মুখে গাড়ীতে সমস্ত পথ আপনার সমালোচনা শুনিয়াছি ।

সমালোচনাটা শুনিবার জন্য আমি যত আকুলি বিকুলি করিতে লাগিলাম, ততই তিনি উত্তরোত্তর গাম্ভীর্য্য অবলম্বন করিতে লাগিলেন। .... কত মিনতি করিলাম হইল না, — সমস্ত নথীপত্র আপনার কাছে দাখিল করিয়া আপিল করিবার ভয় দেখাইলাম, তাহাতেও না — এতদিন পরে আজ সকালে মাত্র তিনি কৌতূহলাগ্নিতে জল ঢালিলেন।

..... স্নেহের প্রভাত।' [৬৮]

সরলাদেবীর অন্তরঙ্গতায় প্রভাতকুমারকে ইতিমধ্যে ঠাকুর পরিবারের সঙ্গে আত্মীয়তাসূত্রে আবদ্ধ হবার কথা কিছুটা পাকাপাকিভাবেই ভাবতে সাহায্য করেছে। এক পত্রে রবীন্দ্রনাথকে জানিয়েছেন —

' আমি যদি এখন থেকে আপনাকে রৈমা বলে ডাকি তাহলে কি নিতান্ত অনধিকার চর্চ্চা হয়' [৬৯] যেহেতু সরলাদেবী রবীন্দ্রনাথকে রৈমা' বলে ডাকতেন প্রভাতকুমারও ভাবী আত্মীয়তাজ্ঞানে একই সম্বোধনের ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন। এই ভাবের গভীরতা চিঠির অন্যত্র প্রকাশিত হয়েছে —

' ... আপনি সরলাকে আমার সম্বন্ধে যা সব লিখেছিলেন আমি তা দেখেছি। এ কাজটা ভাল করেন নি। আমার গায়ে আপনি দেবত্বের মহত্বের রঙ ফলিয়ে ত দিলেন, তারপর যখন real life এ দেবতাটির ভিতর থেকে মাটি আর খড় বেরিয়ে পড়বে, তখন কি উপায় হবে দেবতার?' [৭০]

কার্ত্তিক, ১৩০৬ বঙ্গাব্দে প্রভাতকুমারের প্রথম গল্পগ্রন্থ 'নবকথা' প্রকাশলাভ করে। এই সংস্করণে গল্প ছিল বারটি। গল্পগ্রন্থটির পৃষ্ঠা সংখ্যা ছিল ২৩৪। পরবর্তীকালে ১৩১৮ বঙ্গাব্দের ১লা জ্যৈষ্ঠ নবকথার' পরিবর্দ্ধিত ২য় সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছিল এবং এই সংস্করণে অতিরিক্ত পাঁচটি গল্প সন্নিবিষ্ট হয়। দ্বিতীয় সংস্করণে সন্নিবেশিত 'বঙ্কিমবাবুর কাজির বিচার' গল্পটি তার জ্যেষ্ঠ মাতৃস্নেহের রাজেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের রচনা। 'নবকথা'র প্রথম সংস্করণের একটি কপি সরলা দেবী মারফৎ রবীন্দ্রনাথকে পাঠিয়েছিলেন।' ... আমার নবকথা কেমন হয়েছে বলুন। আপনার নবকথা আমি গত রবিবার দিন সরলাকে পাঠিয়েছিলাম personally deliver করতে অনুরোধ করে। কিন্তু আপনি শিলাইদহে চলে গেলেন বলে পেতে দেরী হল।' প্রসঙ্গক্রমে একথাও জানিয়েছেন 'নবকথার গল্প কটার মধ্যে কোনটাকে আপনি শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করেন, তা আমি জানতে চাই। ...' [৭১]

এই সময়ে তিনি কবিতা এবং ছোটগল্প উভয়ই সমানভাবে রচনায় প্রবৃত্ত হন। কিন্তু গল্প রচনায় নিজের উপর সম্পূর্ণ আস্থা তখনও

তাঁর আসেনি। ছোটগল্পের বিভিন্ন শিল্পকলার সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল হওয়ার জন্য রবীন্দ্রনাথের কাছে উপদেশ প্রার্থনা করেছেন।' ....আজ কিঞ্চিৎ উপদেশপ্রার্থী হইয়া আপনার সমীপে উপস্থিত হইতেছি। ছোটগল্পে কথোপকথনের মাত্রা কতটুকু indulge করা যাইতে পারে? কোন একটা মনের ভাব ফুটাইতে হইলে, লেখক নিজের জবানিতে সেটাকে জানায়, কিম্বা পাত্রপাত্রীর মুখে পাঠককে জানিতে দেয়। কোনটা প্রশস্ত? অবশ্য দুইই চাই। এ সম্বন্ধে কোন ধরা বাঁধা নিয়ম থাকিতে পারে না। আমি শুধু এইটা জিজ্ঞাসা করিতেছি কথোপকথনের বেশী আশ্রয় লইলে নাটকের Province এ encoarch করা স্বরূপ পাপস্পর্শ করে কিনা, আমার গল্পে আমি যতটুকু কথোপকথনের আশ্রয় লই, তা too little কিম্বা too much যে side এর হউক, দোষের বিবেচনা করেন কি না।

দেখুন কোন একটা complex মনের ভাব ফোটান, তাহা action এবং কথোপকথনের ভিতর দিয়া ফুটাইলেই বেশ বিশদ হয় না কি? লেখক তাহাকে আগাগোড়া delineate করিতে চেষ্টা করিলে হয়ত একটু tedeous হয়। আপনি কি মনে করেন?' [৭২]

স্পষ্টতই বোঝা যায় ছোটগল্পের শিল্পরূপ সম্বন্ধে প্রভাতকুমার তখনও দ্বিধাবোধ কাটিয়ে উঠতে পারেন নি। ছোটগল্প সম্পর্কে একটি প্রবন্ধ লিখতে রবীন্দ্রনাথকে তিনি অনুরোধও করেছিলেন, অবশ্য 'ভারতী' পত্রিকায় প্রকাশের জন্য। ছোটগল্প রচনার ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের উপদেশ নির্দেশ প্রার্থনা করলেও রবীন্দ্রনাথের মতানুযায়ী সব কিছুকে মেনে নেওয়া তাঁর পক্ষে সম্ভব হয় নাই — এখানেই প্রভাতকুমারের স্বাতন্ত্র্য সূচিত। প্রসঙ্গত 'দেবী' (ভাদ্র, ১৩০৬) গল্পের রচনা-ইতিহাস স্মরণ করা যায়। 'দেবী' গল্পটির প্লট রবীন্দ্রনাথের দেওয়া। প্রভাতকুমার গল্পটি লেখার পর রবীন্দ্রনাথ কোন কোন অংশ সংশোধন করলেও রবীন্দ্রনাথের মতানুযায়ী গল্পটির পরিণতিতে পরিবর্তন আনা প্রভাতকুমারের পক্ষে সম্ভব হয় নাই। গল্পটি সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথকে জানিয়েছেন — 'আপনার পরামর্শ মত পরিণাম পরিবর্তন করা আমার সাধ্যায়ও হয় নাই, তথাপি আপনার কতকগুলি suggestions এর সদ্ব্যবহার করিয়াছি।' [৭৩] পরবর্তীকালে ছোটগল্পের শিল্পরূপ সম্পর্কে তাঁর মনে যে মতামত গড়ে উঠেছিল, ফটিক চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের

গল্পগ্রন্থ 'ঘরের কথা'র ভূমিকায় সেই পরিচয় বিধৃত হয়েছে । সেই ভূমিকার অংশবিশেষ উদ্ধার করা গেল — ' উপন্যাসের নানা ঘটনার ভিতর দিয়া এক একটি চরিত্র বিকশিত হইয়া উঠে । ছোটগল্পে চরিত্র বিকাশের স্থান নাই । বর্ণিত চরিত্র বিকশিত ভাবেই পাঠকের সম্মুখে উপস্থিত করা হয় এবং ঘটনাটির সঙ্গে সে চরিত্রের সামঞ্জস্য বিধান করিয়া দিতে পারিলেই লেখকের কার্য্য সম্পন্ন হইল। সুতরাং সে ঘটনাটি এমন হওয়া চাই, যাহাতে পর্দ্দায় পর্দ্দায় চরিত্রটির সঙ্গে মিলিয়া যায়, অথচ তাহার কোন অংশ নিরর্থক পড়িয়া না থাকে । .... যদি ছোটগল্পে এমন কোন ঘটনা ঘটে, যাহা বর্ণিত চরিত্রের সঙ্গে বেশ মিলিয়া যাইতেছে না, অথবা সে চরিত্রটি বুঝিবার পক্ষে সে ঘটনাটি অত্যাবশ্যক নয়, তাহা হইলে সে ছোটগল্প ভাল হইল না। ঘটনায় ও চরিত্রে যদি জমাট না বাঁধিল, তাহা হইলে দুইই বিফল ।[৭৪]

১৩০৬ সালে প্রকাশিত গল্পগুলির মধ্যে 'সারদার কীর্ত্তি' এবং 'প্রিয়তম' ছাড়া অন্যগুলি 'নবকথা' (কার্ত্তিক, ১৩০৬) গল্পগ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। অধিকাংশ গল্পের প্রকাশ ঘটেছে 'ভারতী' পত্রিকায় । গল্প সমষ্টিতে বিষয় বৈচিত্র্য লক্ষনীয় । 'হিমানী'তে প্রেমের করুণ পরিণতি, 'কুড়ানো মেয়ে'তে মানব চরিত্রের লোভ নামক দুর্বলতাকে কেন্দ্র করে কৌতুক এবং করুণ- রস পরিবেশিত । 'ভুলভাঙ্গা' গল্পে আধ্যাত্মিক জগতের তথাকথিত দিশারিদের প্রতি মৃদু ব্যঙ্গ এবং নায়িকা চরিত্রের অন্তরালে গৃহাশ্রমের প্রতি লেখকের সমর্থন প্রকাশিত হয়েছে । 'শ্রীবিলাসের দুর্বুদ্ধি' গল্পে দাম্পত্য জীবনে ছোটখাট ভুলত্রুটি সত্ত্বেও, দাম্পত্য জীবনের মাধুর্য্যের প্রতি লেখকের সমর্থন অনুভব করা যায় । 'বিষবৃক্ষের ফল' গল্পে তরুণ বয়সে অত্যধিক উপন্যাস পাঠের পরিণতি অবলম্বন কৌতুক - হাস্যের অবতারণা করেছেন । এই সময়ে রচিত নাম লেখা, আদর, জন্মান্তরে ইত্যাদি কবিতায় মানবমনের প্রেমাকাঙ্ক্ষা ব্যঞ্জিত । প্রভাতকুমারের কবি মনে একদিকে যেমন মানুষী প্রেমের আকুলতা জেগেছে, অন্যদিকে প্রেমের নিত্যতা সম্বন্ধে তাঁর মনে অনেক প্রশ্ন উত্থাপিত হয়েছে। প্রভাতমন প্রেম - চিন্তায় কিছুটা রোমান্টিক হয়ে উঠলেও প্রেমের অবিনাশী সত্তাকে স্বীকার করতে চেয়েছে —

' আমরা পৃথিবী ছাড়ি চলিয়া যে আসি,
যত কিছু ছিল সেথাকার,
দেহ ও বাসনাভার
চিতানলে হয়ে যায় ভস্ম রাশি রাশি ।
শুধু থাকে হেমবৎ প্রেম অবিনাশী ।
প্রণয় আস্পদে তাই

ঙ্কি ঘিরে থাকি সর্ব্বদাই ,
শত ছদ্মবেশ ধরি আপনা প্রকাশি ।
নয়নের জল হই বয়নের হাসি ।'

(পরলোকতত্ত্ব — বৈশাখ, ১৩০৬)

সরলাদেবীর সুষ্ঠু পরিচালনায় 'ভারতী' তখন বিদগ্ধ পাঠক সমাজে সুপ্রতিষ্ঠিত । ভারতীর কার্য্যালয়ে মণি লাল গঙ্গোপাধ্যায় ইত্যাদি মুষ্টিমেয় যে কয়েকজনের যাতায়াত ছিল প্রভাতকুমার ছিলেন তাদের অন্যতম । প্রভাতকুমারের বেশ কিছু গল্প 'ভারতী'তে প্রকাশিত হওয়াতে সাহিত্য সমাজে তাঁর জনপ্রিয়তা বেড়ে উঠেছে । সরলাদেবীর সঙ্গে প্রভাতকুমারের তখনকার গভীর অন্তরঙ্গতা সাহিত্যিক মহলেও বেশ আলোচ্য বিষয় হয়ে ওঠে ।' হঠাৎ শুনলাম এক রোমান্স -এর কাহিনী । স্বর্ণকুমারী দেবীর বিদ্যাবতী ও লেখিকা কন্যা সরলা দেবী প্রভাতকুমারের গল্প পাঠ করে তাঁর প্রতি অনুরাগিনী হয়েছেন , শীঘ্রই তাঁরা পরস্পরের সঙ্গে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হবেন । প্রভাতকুমার তখন বোধহয় ডাক - বিভাগে কেরাণীগিরি করতেন । নিজেদের পরিবারের যোগ্য করে নেবার জন্য সরলা দেবীর মাতা - পিতা প্রভাতকুমারকে বিলাতে পাঠাতে চাইলেন । তিনিও চাকরীতে ইস্তফা দিয়ে বিলাতে যাত্রা করলেন ব্যারিষ্টারী শেখবার জন্য ।

এ - রকম 'রোমান্স' বাংলা সাহিত্যসমাজে বড় একটা ঘটেনা , সহরের সাহিত্য বৈঠকগুলি কিছুদিন পর্যন্ত সরগরম হয়ে রইল ।'[৭৫]

ভবিষ্যৎ জীবনের সুখস্বপ্ন নিয়ে' ১৯০১ সালের ৫ই জানুয়ারি তিনি ব্যারিষ্টারী পড়িবার জন্য লন্ডন যাত্রা করেন .....২০ শে জানুয়ারি তিনি লন্ডনে উপস্থিত হন এবং কলিকাতার একজন বিখ্যাত ব্যারিষ্টারের পরিচয় পত্রের সাহায্যে সম্রাট পঞ্চম জর্জের জার্মান ভাষার শিক্ষাগুরু একজন বিখ্যাত জর্মন পন্ডিতের গৃহে অতিথিস্বরূপ অবস্থান করেন ।'[৭৬]

প্রভাতকুমার তাঁর বিলাত যাত্রার এক মনোজ্ঞ বিবরণ দিয়েছেন 'য়ুরোপে পদার্পণ' রচনাটিতে ।

' ইংরাজী ১৯০১ সালে ১৮ই জানুয়ারি , ভূমধ্যসাগরবক্ষে পি এন্ড ও কোম্পানীর' অষ্ট্রেলিয়া' নামক জাহাজখানি ছুটিতেছে । ৫ই জানুয়ারি বোম্বাই ছাড়িয়াছিলাম ' — আজ দুই সপ্তাহকাল একাদিক্রমে মাতা বসুন্ধরার স্পর্শ বিরহিত প্রাণ ওষ্ঠাগতপ্রায় । আজ জাহাজে আমার শেষরাত্রি । প্রাতে জাহাজ মার্সেলস বন্দরে পৌঁছিবে । সেখানে একবেলা থাকিয়া জাহাজ আবার

লন্ডন অভিমুখে যাত্রা করিবে । কতক লোক মার্সেলসে নামিবে ,— বাকী লন্ডন যাত্রী সমস্ত পথই জাহাজে যাইবে । ধন্য তাহারা — যাহারা নামিবে না । ধন্য তাহাদের ধৈর্য্য ! সমুদ্রকে নমস্কার — আমি স্থলচর প্রাণী , জীবনেরঅষ্টাবিংশতি বৎসর স্থলে কাটাইয়াছি — সুখে কাটাইয়াছি, — কিন্তু জলে দুই সপ্তাহেই আমাকে অতিষ্ঠ করিয়া তুলিয়াছে ।' [৭৭]

এই যাত্রাকালে সমুদ্র বেশ শান্তই ছিল তাঁর যে শারীরিক খুব কষ্ট হয়েছিল তা ঠিক নয় — সমুদ্র - পীড়াতেও তিনি ভোগেন নি তবুও একাদিক্রমে জাহাজের'ক্যাবিন বাস তাঁর কাছে কারাগারের বন্দীজীবন স্বরূপ হয়ে উঠেছিল । তাই ১৮ই জানুয়ারি' ১৯০১ রাত দশটায়যখন তিনি নির্দ্দিষ্ট ক্যাবিনে শুতে গেলেন তখন তাঁর মনে হয়েছে —' কল্য প্রভাতে আমার মুক্তি ।'রাজা ও রাণীর' কয়েক লাইন ক্রমাগত মনে হইতে লাগিল —

এ কি মুক্তি , এ কি পরিত্রাণ !
কি আনন্দ হৃদয় - মাঝারে ! — অবলার —' [৭৮]

'অবলা কথাটি স্মরণ করে কিছুটা রসিকতাও তিনি করেছেন —'.... জাহাজে একটি অবলার সহিত কিঞ্চিত ঘনিষ্টতা হইয়াছিল বটে , এবং তিনি আমাকে কিঞ্চিৎ উপহারও দিয়াছিলেন বটে , কিন্তু বয়সে তিনি প্রবীনা , এবং তাহার উপহার এক শিশি সুগন্ধি নয় , ঔষধের বড়ী মাত্র । তিনি ও তাঁহার স্বামী কাপ্তেন আমাকে বলিয়াছিলেন —' বিলাতের শীতে প্রথম প্রথম তোমার সর্দ্দি কাসি উপস্থিত হইবে ।' সোরথ্রোট' হইতে পারে , এই ঔষধ তখন এক বড়ী খাইও ।' দুর্ভাগ্যবশতঃ পৌঁছিয়া আমার সর্দ্দিকাসি কিছুই হয় নাই । কিন্তু তথাপি মাঝে মাঝে এক একটা সেই বড়ী খাইতাম । রোগ নাই বা হইল , তাহা বলিয়া কি ভাল ঔষধটা নষ্ট করিতে আছে ,,' [৭৯]

লক্ষ্য করবার বিষয় জীবনের সামান্য ঘটনাকে কেন্দ্র করে কি অদ্ভুত রসিকতা তাঁর মনে গুঞ্জরিত হয়ে উঠতো । সাহিত্য রচনা ক্ষেত্রেও তাঁর এই ক্ষমতার পরিচয় সর্বত্রই পাওয়া যায় ।

১৯শে জানুয়ারী ১৯০১ সালে প্রায় ভোর ৮টায় তিনি মার্সেলস বন্দরে অবতরণ করেন । সেখান থেকে ট্রেনে করে ও প্যারীস হয়ে পরদিন সন্ধ্যা ৫টায় ডোভারে পৌঁছান এবং ঐদিন লন্ডন চেয়ারিং ক্রশ ষ্টেশনে যখন পৌঁছেছেন তখন ছয়টা বাজতে দশ মিনিট বাকী । সেখান থেকে ফোরহুইলারে চড়ে প্রায় আধ ঘন্টা পরে জার্মান পন্ডিত Sir Oswald এর বাড়ীতে এসে পৌঁছান । এখানেই তিনি তাঁর প্রবাসকাল যাপন করেছিলেন।

Sir Oswald এবং তাঁর পরিবারবর্গের মধ্যে তিনি আত্মীয়ের মতই ছিলেন — এবং এই বিদগ্ধ মানুষটির সাহচর্য্য এবং সান্নিধ্য তাঁর জীবন ধন্য হয়েছিল। এঁদের সাথে প্রথম সাক্ষাৎ এবং পরিচয়ের বিবরণ দিতে গিয়ে প্রভাতকুমার লিখেছেন —

'বাড়ীর সম্মুখে গাড়ী দাঁড়াইল। গাড়োয়ানকে বলিলাম ' নামিয়া বাড়ীর লোককে ডাক — আমার এই কার্ড লও।' — গাড়োয়ান নামিয়া দরজায় নকার' ঠক ঠক করিতে লাগিল। দাসী দরজা খুলিয়া দিল — কার্ড লইয়া গেল। কার্ড লইয়া বাড়ীর সকলে সদলে দ্বারে আসিয়া উপস্থিত — তাঁহাদের আদর অভ্যর্থনায় আমার সমস্ত সঙ্কোচ দূর হইল। একটি যুবক দুইটি যুবতী ও একজন প্রবীনাকে দেখিলাম। তাঁহাদের ড্রয়িংরুমে গিয়া বসিলাম। একটি যুবতী বলিলেন —' ষ্টেশনে বাবার সঙ্গে দেখা হয় নাই ? তিনি যে আপনাকে আনিতে গিয়াছেন ?'

আমি বলিলাম, 'কই না — কাহারও সহিত ত দেখা হয় নাই।'

' আপনি কয়টার গাড়ীতে আসিয়া পৌঁছিয়াছেন ?'

' পাঁচটা পঞ্চাশ মিনিটের গাড়ীতে।'

' তবে যে ডোভার হইতে আপনি টেলিগ্রাফ করিয়াছিলেন ,'ছ' টার সময় আমি পৌঁছিব ? তাই ত বাবা আপনাকে মিস করিয়াছেন।'

পাঁচটা পঞ্চাশ মিনিট আবার কে লেখে, আমি সোজাসোজি ছয়টা লিখিয়াদিয়াছিলাম। আমাকে কেহ ষ্টেশনে আনিতে যাইবেন ইহা আমার উদ্দেশ্যও ছিল না, আমি যে আসিতেছি, এই সংবাদটা মাত্র দিয়াছিলাম। আর কেহ যদি ষ্টেশনেই আসেন, তিনি যে মিনিট হিসাব করিয়া বাড়ী হইতে যাত্রা করিবেন, তাহাই বা কেমন করিয়া জানিব ? আমরা হইলে ত আধঘণ্টা আগে ষ্টেশনে আসিয়া বসিয়া থাকি।' ৮০

আমাদের ভারতীয়দের সময়জ্ঞান সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ রসিকতা করে পরিবারটির সঙ্গে যখন কথাবার্তায় ব্যস্ত তখন গৃহকর্তা প্রভাতকুমারকে খুঁজে না পেয়ে হতাশ হয়ে বাড়ী ফিরে এলেন। এই গৃহকর্তাই Dr. Oswald। প্রভাতকুমার তাঁর বর্ণনা দিতে গিয়ে লিখেছেন —' গৃহকর্তার আকার খর্ব, তখন তাঁর বয়ঃক্রম ৭৫ বৎসর হইয়াছে। তাঁহার নাম ডাক্তার অ — তিনি ঔষধের ডাক্তার নহেন, একজন Ph.D. উপাধিধারী। ইনি জাতিতে জর্মন, কিন্তু বিগত ৫০ বৎসর ইংলণ্ডেই বাস করিয়াছেন, ইংরাজ মহিলার পাণিগ্রহণ করিয়াছেন,

সরস্বতী তাঁহাকে যে পরিমান কৃপা করিয়াছেন , কমলা সে পরিমান করেন নাই। ইনি পূর্বে Royal Naval College এ জর্ম্মন ভাষার অধ্যাপকের কার্য্য করিতেন , তখন অবসর গ্রহণ করিয়াছিলেন । সিভিল সার্ভিসের পরীক্ষার পরীক্ষক হইয়া এবং সংবাদ পত্রে প্রবন্ধাদি লিখিয়া ইঁহার জীবিকা নির্বাহ হয়।

ইহার এক পুত্র এবং দুই কন্যা । পুত্রটি বিবাহিত, চাকুরী করেন , স্থানান্তরে থাকেন । প্রতি রবিবার মধ্যাহ্নকালে সস্ত্রীক আসিয়া পিতা-মাতা ভগিনীর সহিত সারাদিবস অতিবাহিত করেন । সন্ধ্যার পর নিজ গৃহে ফিরিয়া যান ।.....

... ডাক্তর অ —র কনিষ্ঠা কন্যাটি সে সময়ে জর্ম্মনীতে ছিলেন ।

যাহা হউক , তাঁহাদের আদর - অভ্যর্থনা ও আত্মীয়বৎ ব্যবহারে আমি অত্যন্ত তৃপ্ত হইলাম । সে দিনটি গৃহিণীর জন্মদিন ছিল । পরে অনেক সময় আমাকে দেখাইয়া তিনি লোককে বলিতেন — "He is my birthday present from L -" (আমি ল - মহাশয়ের নিকট হইতেই ইহাদের নিকট পরিচয়পত্র লইয়া গিয়াছিলাম?' ৮১

সম্ভবত এখানে উল্লেখিত' ল — মহাশয়' প্রভাতকুমারের অন্যতম সুহৃদ এবং হিতাকাঙ্খী প্রখ্যাত ব্যারিষ্টার লোকেন পালিত মহাশয় । লোকেন পালিত মহাশয়ের কাছ থেকে পরিচয় পত্র নিয়ে গিয়ে রমেশ চন্দ্র দত্তের সাথে দেখা করেন । দত্ত মহাশয় তখন লন্ডনের ৮২ নং টলবট রোডে থাকেন এবং এই জর্ম্মন পন্ডিতের পরিবারের সাথে পরিচিত ছিলেন । এঁদের কাছ থেকে দত্ত মহাশয়ের বাড়ী যাবার পথ-নির্দেশ নিয়ে পরদিন প্রভাতকুমার তাঁর সঙ্গে দেখা করেন ।

দত্ত মহাশয়ের বাড়ী যাবার পথে বেশ একটি মজার ঘটনা ঘটেছিল—

' তখন বেলা সাড়ে নয়টা হইবে । সূর্য্যদেবের চিহ্ন মাত্রও নাই । অল্প অল্প কোয়াসা । পথে যাইতেছি , এমন সময় এক দীনবেশিনী বৃদ্ধা আমাকে সুপ্রভাত জ্ঞাপন করিয়া বলিল — " Are you an African subject of Her Majesty ? "

আমি বলিলাম না । আমি ভারতবর্ষীয় প্রজা ।

বৃদ্ধা বলিল — " Poor old lady She is very ill. "

আমার দেহ বর্ণটি কাল বটে — কিন্তু তবু কি আমি নিগ্রো বলিয়া ভ্রান্ত হইবার যোগ্য ? মনে মনে বুড়ির উপর আমি মহা চটিয়া গেলাম । পরে জানিয়াছিলাম — আমরা পরস্পরের মধ্যে গৌর -শ্যামের প্রভেদ করি, তাহারা অতটা লক্ষ্য করিতে

.পারেনা..... তাঁহাদের দোষ দিব কি , আমি যখন প্রথম দেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিলাম — তখন যে সকল লোক আমাদের মধ্যে খুবই গৌরবর্ণ , তাহাদিগকেও কালো মনে হইত । সাদা রঙের ঘোর চোখে এমনই লাগিয়াছিল যে , সকলকে বেবাক কালো মনে হইত ।.....আমার দৃষ্টিশক্তির এইরূপ বিকৃতি কাটিতে দুই তিন মাস কাটিয়াছিল ।' ৮২

যাহোক দত্ত মহাশয়ের বাড়ীর নম্বর ধরে খুঁজতে খুঁজতে শেষ-পর্য্যন্ত সেখানে উপস্থিত হন । বাড়ীর দরজায় 'নক' করতেই দাসী এসে উপস্থিত । দাসীর সাহায্যে দত্ত মহাশয়ের ঘরে উপস্থিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে প্রভাতকুমারকে দেখে রমেশচন্দ্র উঠে দাঁড়িয়ে তাকে অভ্যর্থনা জানান । ইতিপূর্বে ভারতগৌরব এই মহাপুরুষের সাথে প্রভাতকুমারের কোন পরিচয় ছিল না — বিজ্ঞাপনে শুধু মাত্র তার ফটো দেখেছিলেন । তাঁর সঙ্গে প্রথম সাক্ষাতের বর্ণনাটুকু এভাবে লিপিবদ্ধ করেছেন —

'দত্ত মহাশয় বলিলেন — 'আপনি কোন্ inn এ ভর্ত্তি হইবেন স্থির করিয়াছেন ?'

আমি ত কিছুই স্থির করি নাই । আপনি কি বলেন ?'

' ও সকলগুলি সমান মর্য্যাদা । তবে , আমাদের দেশের অনেকেই Middle Temple এর অন্তর্ভুক্ত । আমিও Middle Temple "

আমি বলিলাম —' তবে আমিও Middle Temple এ ভর্ত্তি হইব । কি করিতে হইবে ?

' দুই ব্যারিষ্টারের সহিকরা প্রস্তাবপত্র চাই ।'

' আমি ত কাহাকেও চিনি না ।'

' আমি Middle Temple এর একজন ব্যারিষ্টার প্রোফেসর মিউরিসনের নামে অনুরোধ পত্র দিতেছি । তিনি নিজে সহি করিয়া দিবেন এবং সেখানে অনেক ব্যারিষ্টার আছে আর কাহাকেও দিয়া একটা সহি করাইয়া লইবেন । আপনি Middle Teple এ যাইতে পারিবেন ?'

' ক্যাব লইয়া অনায়াসেই যাইতে পারি !'

দত্ত ভ্রুকুঞ্চিত করিয়া একটু ভাবিলেন । পরে বলিলেন —' Bus - এ যাইলে দুই পেনিতে হইবে , অনর্থক কেন শিলিং খরচ করিবেন ? আচ্ছা আমি আপনার সঙ্গে লোক দিতেছি ।' ৮৩

এই বলে তিনি নিজে একটি অনুরোধপত্র লিখে প্রভাতকুমারকে দেন।

অনুরোধপত্রের

অনুরোধপত্র সহ দত্ত মহাশয়ের ভ্রাতুষ্পুত্রকে সাথে করে প্রভাতকুমার Middle Temple এর উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন ।

প্রসঙ্গত: উল্লেখ করা প্রয়োজন ভারতগৌরব মনীষী এই রমেশচন্দ্র ছিলেন সহজ সরল , ধনবান অথচ মিতব্যয়ী , এঁর প্রতি প্রভাতকুমারের শ্রদ্ধাছিল অগাধ এবং তাঁর চারিত্রিক মাধুর্য্যে প্রভাতকুমারকে আকৃষ্ট করেছিল । রমেশচন্দ্রের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করে প্রভাতকুমার লিখেছেন —

'বড়লোক হইয়াও কি প্রকার মিতব্যয়ী হওয়া যায় , দত্ত মহাশয় তাহার একটি দৃষ্টান্তস্থল । পরে একবার তিনি Tunbridge Wells এ বক্তৃতা দিবার সময় , আমাকে সেখানে উপস্থিত হইবার জন্য অনুরোধ করিয়াছিলেন। পত্রে আমাকে লিখিয়াছিলেন — বাড়ী হইতে যেন আমি পথে খাবারের জন্য কিছু Sandwiches প্রভৃতি সঙ্গে করিয়া লইয়া যাই , কারণ ভোজনশালায় অধিক ব্যয় । সেই পত্রে তিনি লিখিয়াছিলেন -- I dont believe in throwing away good money বিলাতে অনেক সময়ে দত্ত মহাশয়কে রেলে তৃতীয় শ্রেণীতে ভ্রমন করিতে দেখিয়াছি ।' ৮৪

রমেশচন্দ্রের ভ্রাতুষ্পুত্রটিকে সঙ্গে সাথে করে প্রভাতকুমার সেদিন Middle Temple এ উপস্থিত হন । কিন্তু যে ব্যারিষ্টার ভদ্রলোকের কথা রমেশচন্দ্র চিঠিতে উল্লেখ করে দিয়েছিলেন তিনি তখন উপস্থিত ছিলেন না । খোঁজখবর নিয়ে জানতে পারেন বেলা চারটার আগে তিনি আসবেন না। ভর্ত্তি হবার জন্য প্রভাতকুমারের কাছে দেড়শত পাউন্ডের একটা একটা ব্যাঙ্ক ড্রাফট ছিল । রমেশচন্দ্রের ভ্রাতুষ্পুত্রের সাহায্যে ব্যাঙ্কে গিয়ে তিনি সেটা ভাঙ্গিয়ে নেন । পরে ব্যাঙ্ক থেকে তিনি একা Middle Temple এ ফিরে আসেন এবং উল্লিখিত ব্যারিষ্টার মহাশয়ের জন্য অপেক্ষা করতে থাকেন । কিন্তু চারটা বেজে গেলেও যখন ভদ্রলোক আসেন না তখন বাধ্য হয়ে তিনি বাড়ীতে ফিরে আসেন ।

সেদিন সন্ধ্যায় বাড়ী ফিরে আসার পথের একটা রসাল বর্ণনা প্রভাতকুমার দিয়েছেন —

'.... চান্সেরি লেন পার হইয়া , হবর্ণে আসিলাম । দেখিলাম একটি অম্নিবস যাইতেছে , তাহার গাত্রে অন্যান্য স্থানসহ Royal Oak অঙ্কিত রহিয়াছে । তাহাতেই আরোহণকরিলাম । ভাবিলাম রয়াল ওক ষ্টেশন ত অদ্য প্রভাতেই দেখিয়া আসিয়াছি , সেখানে পৌঁছিয়া ঠিক বাড়ী চিনিয়া যাইতে পারিব ।

রয়াল ওক বলিয়া যেখানে আমায় নামাইয়া দিল দেখিলাম, তাহা একেবারেই অদৃষ্টপূর্ব। সে ষ্টেশনও নাই, কিছুই নাই। লোককে জিজ্ঞাসা করিলাম, রয়াল ওক কোথা?' তাহারা একটি বৃহত বাড়ী দেখাইয়া দিল। দেখিলাম সে বাড়ীর উপর রয়াল ওক লেখা রহিয়াছে বটে — তাহা একটা পানশালা। সেই পানশালার নাম অনুসারেই তাহার কিয়দ্দূরে অবস্থিত ষ্টেশনের নামও রয়াল ওক হইয়াছে। উত্তম পরিচয় বটে। বিলাতে অনেক সময়, পানশালার নাম অনুসারে সেই অঞ্চলটা পরিচিত হয়। নামও অদ্ভুত অদ্ভুত আছে।

..... অনেক জিজ্ঞাসাবাদ করিয়া, ঘুরিয়া ফিরিয়া, দশ মিনিটের স্থানে আধঘণ্টায় গৃহে পৌঁছিলাম।' ৮৫

পরদিন দত্ত মহাশয়ের সাহায্যে এবং মিস্ ম্যানিংএর আনুকূল্যে আবেদন পত্রে দুইটি সহি যোগাড় করে নব্বই পাউন্ড জমা দিয়ে Middle Temple এ ভর্ত্তি হন। মিস্ ম্যানিংএর পরিচয় দিতে গিয়ে প্রভাতকুমার লিখেছেন — ' মিস্‌ম্যানিং লন্ডনে ভারতীয় ছাত্রগণের জননীস্বরূপা। তাহাদের মঙ্গলার্থ এই বর্ষীয়সী মহিলার যত্ন ও উদ্যম অসাধারণ। বিপদে আপদে শরণাপন্ন হইলেই তিনি উদ্ধার করিয়া দেন -। — কিন্তু ভারতবর্ষীয় ছাত্রগণের দুর্ভাগ্যবশতঃ এই মহিলা এখন পরলোকগত।' ৮৬

এখানে ভর্ত্তি হবার সময় প্রভাতকুমারের উপাধি নিয়ে এক বিভ্রাট দেখা দেয়। কারণ তাঁর বি.এ সার্টিফিকেটে উপাধি ছিল মুখোপাধ্যায় অথচ আবেদন পত্রে লেখা ছিল মুখার্জি। রমেশচন্দ্র অনেককষ্টে অফিসের অধ্যক্ষকে শেষ পর্য্যন্ত বুঝাতে সমর্থ হয়েছিলেন যে — মুখোপাধ্যায় এবং মুখার্জি একই পদবী এবং অধ্যক্ষ সাহেবের সন্দেহভঞ্জন করেন। আবার ভর্ত্তি হবার সময় যে ১০ পাউন্ড জমা দিতে হয় প্রভাতকুমার ভুলবশতঃ সেখানে ১০০ পাউন্ড দিয়ে ফেলেন। Under Treasurer দুবার গুণে১০ পাউন্ডের একখানি note বেশী দেখেন এবং তাকে ফেরত দেন। ঘটনা দেখে রমেশ দত্ত 'সহাস্য কটাক্ষ' করে বলেন "Extravagant young man অর্থের ব্যাপারে এ ধরণের একটা শিথিলতা বরাবরই প্রভাতকুমারের জীবনে লক্ষ্য করা যায়।

অতঃপর সেদিন বেলা ১২ টায় রমেশচন্দ্রকে বহু ধন্যবাদ সহ বিদায় দিয়ে সারাদিন ঘুরে ঘুরে তিনি Middle Temple ভবনটি দেখেন এবং রাত্রের ভোজন সমাধা করে বাসস্থানে প্রত্যাগমন করেন। প্রথম রাত্রের ভোজনের রাত্রেই — তাঁর তথা ইংলন্ডের পক্ষে একটি চিরস্মরণীয় ঘটনা ঘটেছিল — মহারাণী ভিক্টোরিয়ার মৃত্যু।

মহারাণীর মৃত্যুজনিত এই ঘটনাটির এক মনোজ্ঞ বিবরণ লিপিবদ্ধ করেছেন 'মহারাণীর অন্ত্যেষ্টি — সমারোহ' নামক রচনায়। রচনাটি বৈশাখ ১৩০৮ সালে 'ভারতী'তে প্রকাশিত হয়েছিল। প্রিয়জনের মৃত্যু সংবাদে আমাদের স্বাভাবিকভাবে মনে শোক জাগে কিন্তু সামগ্রিক ভাবে সমারোহসহকারে শোক জ্ঞাপনের মধ্যে যে কিছুটা রঙ্গ দেখার প্রবৃত্তি ও মিশে থাকে অতি সূক্ষ্মভাবে প্রভাতকুমার সেটি লক্ষ্য করেছেন। রাণীর মৃত্যু সংবাদে—'পূর্ণবয়স্ক আমার চোখ দিয়া যেন জল আসিতে লাগিল। বোধ হয় রাণীর মৃত্যু সংবাদে প্রথম প্রথম ইংলণ্ডবাসী

সকলেরই চক্ষু অশ্রুসিক্ত হইয়াছিল। কিন্তু অবশ্য অল্পকালের মধ্যে শোকের চেয়ে তামাসা দেখিবার আগ্রহই বেশী প্রবল হইয়া উঠিল।' অন্যত্র লিখেছেন —' খবরের কাগজে এই অন্ত্যেষ্টিযাত্রার বর্ণনার হেডিংয়ে বড় বড় অক্ষরে 'Tears flowed freely' লেখা দেখিয়াছি কিন্তু কাহাকেও অশ্রুপাত করিতে না দেখিলেও সেই অন্ত্যেষ্টিযাত্রা দর্শনার্থী ~~[illegible]~~। কালো পোষাকের সমুদ্রকে শোকমলিন দেখাইতেছিল বটে।' আন্তরিক শোক প্রকাশ থেকে বাহ্যিক বেশভূষায় শোক প্রকাশের চিহ্নগুলিই যেন বড় হয়ে দেখা দিয়েছিল।

প্রভাতকুমার ছিলেন চির-অনুসন্ধিৎসু মনের অধিকারী, পুরাতনের প্রতি ছিল তাঁর স্বাভাবিক আকর্ষণ। শুধু মাত্র কোনজিনিষ চোখে দেখেই ক্ষান্ত হননি — সে সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য তথ্য যথাসম্ভব খুঁটিয়ে দেখার চেষ্টা করতেন। কখনও বা তিনি দেখেছেন ঐতিহাসিকের দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে কখনও আবার সমাজ সংস্কারকের দৃষ্টি- কোণ থেকে।

ইংলণ্ডে থাকাকালীন অধ্যয়নের ফাঁকে ফাঁকে সুযোগ সুবিধা মত পরিচিতদের নিয়ে বেরিয়ে পড়তেন বিশ্ববিখ্যাত পুরাতন স্মৃতিসৌধগুলি দেখার জন্য। প্রবাস জীবনের ভ্রমণ বৃত্তান্ত এবং স্মৃতিকথাগুলি বিধৃত হয়েছে তাঁর (১)'ষ্ট্রাট-ফোর্ড - অন্ এভনে্ একবেলা' প্রকাশকাল —ভারতী— ভাদ্র ১৩১০, (২)' অ্যাবট্সফোর্ড - প্রকাশকাল' ভারতী' অগ্রহায়ণ ১৩১০, (৩) ব্রাইটন' — প্রকাশকাল, প্রবাসী, পৌষ, ১৩১৫, (৪)'য়ুরোপে ~~[illegible]~~ পদার্পণ —'প্রবাসী, পৌষ, ১৩১৫। (৫) বিলাতী থিয়েটার' — প্রবাসী, ভাদ্র, ১৩১৩ (৬)' ইংরাজ রমনী' —বসুমতী সাহিত্য মন্দির প্রকাশিত' সৌন্দর্য গ্রন্থে বিধৃত (৬)'ভাইনী চরিত' —'ভারতী - ~~[illegible]~~ শ্রাবণ, ১৩০৮ (৭)' রাজকাহিনী — প্রবাসী-জ্যৈষ্ঠ, ১৩১৭। (৮)' মহারাণীর অন্ত্যেষ্টি সমারোহ ' ভারতী' বৈশাখ, ১৩০৮ (৯)' রমেশচন্দ্র স্মৃতি' - প্রবাসী, পৌষ, ১৩১৩ নামক রচনাগুলিতে।

লণ্ডনে থাকাকালীন সঙ্গীসাথী নিয়ে একবার গিয়েছিলেন বিখ্যাত নাট্যকার শেক্সপীয়ারের জন্মভূমি এবং বাসস্থান স্ট্রাট্ফোর্ড - অন - এভন দেখতে। তিনি খুটিয়ে খুটিয়ে দেখেছেন সংরক্ষিত শেক্সপীয়রের জন্মকক্ষ, বসবারঘর, শয়নকক্ষ, চিত্রকক্ষ ও লাইব্রেরি এবং শেক্সপীয়রের জীবনকালের অনেক সংরক্ষিত দ্রব্য। জন্মকক্ষের জানালার কাচে দর্শনার্থীদের বহু নাম এমনকি স্যর ওয়াল্টার স্কট, বায়রণ ও ওয়াশিংটন আর্ভিংয়ের নাম খোদিত রয়েছে লেখকের দৃষ্টিতে তা এড়ায়নি। শুধু মাত্র যে চোখের দেখা দেখে যে তিনি তৃপ্ত হয়েছেন তা নয় শেক্সপীয়রের স্মৃতিসৌধের সমস্ত কিছুর সম্ভাব্য ইতিহাসও তিনি জানতে চেয়েছেন। যেমন শেক্পীয়রের চিত্রকক্ষ থেকে বেরিয়ে এসে তিনি ভাবতে লাগলেন —

—' হ্যালিওয়েলকে ধন্যবাদ — আর একটু হইলেই, এ গৃহদর্শন আমার ভাগ্যে ঘটিতনা। আর একটু হইলেই, ইংলণ্ড হইতে এই গৃহ বিদায়লাভ করিয়াছিল। ধ্বংস হইত বলিতেছিনা — ইংলণ্ড হইতে অদৃশ্য হইত। আমেরিকানগণ দিব্য যোগাড়যন্ত্রটি করিয়া তুলিয়াছিল। শেক্সপীয়রের মৃত্যুর পরে এই গৃহ তাঁহার একটি ভগিনীর সম্পত্তি হয়। সে অবধি এই সম্পত্তি সেই ভগিনীর বংশধরগণের হস্তে থাকে। ১৮৪৭ খৃষ্টাব্দে ইহা বিক্রয়ার্থ বিজ্ঞাপিত হয়। ইহা শুনিয়া আমেরিকানগণ পরামর্শ করিল, - আমরা ইহা ক্রয় করিয়া, — সবশুদ্ধ উঠাইয়া জাহাজ করিয়া নিউইয়র্কে লইয়া আসিব -। — এই সংবাদ পাইবামাত্র বিখ্যাত শেক্সপীয়রীয় টীকাকার হ্যালিওয়েল উদ্যোক্তা হইয়া, চাঁদা তুলিয়া, এই গৃহ কিনিয়া ফেলেন।' ৮৭

অন্যত্র, শেক্সপীয়রের স্বহস্তপ্রোথিত 'মলবেরি' বৃক্ষটির অংশবিশেষ পৃথিবীর সর্বত্রই ছড়িয়ে আছে বলে শুনা যায়। এই ধারণায় সন্দেহ পোষন করেছেন লেখক ওয়াশিংটন আর্ভিং তাঁর বেনামীতে প্রকাশিত বিখ্যাত The sketch Book of Geogray Grayan Gent (১৮১৯ -১৮২০) গ্রন্থটিতে। প্রভাতকুমার কিন্তু মলবেরি' বৃক্ষটি সম্বন্ধে প্রচলিত জনমতকেই স্বীকার করেছেন। এবং তার উক্তির যথার্থতা স্থাপন করতে গিয়ে কিভাবে গাছটি কর্তিত ~~ক~~ হয়েছিল এবং ' বৃক্ষটি স্ট্রাট্ফোর্ডবাসী একজন ঘড়ি মেরামতকারী তৎক্ষনাৎ সেইটি কিনে নিয়ে সেই কাঠ থেকে নানারকম ~~দ্র~~ দ্রব্য তৈয়ারী করে উচ্চমূল্যে ~~দর্শনার্থী~~ দর্শনার্থীদের কাছে বিক্রয় করে বিশ্বময় তাকে ছড়িয়েদিয়েছিল তার কাহিনী বলেছেন। এই কাহিনীটির প্রমাণ হিসাবে বলেছেন —' আমি এই বৃত্তান্ত বৃটিশ মিউজিয়মে একখানি পুরাতন পুস্তকে পাঠ করিয়াছি। পুস্তকখানির নাম Syartford Upon Avon Guide "published by Whittakar & Co --- London পুস্তকখানিতে তারিখ নাই। তবে তাহাতে ১৮৩৭ সালের কথা লিখিত আছে – সুতরাং তাহা ঐ তারিখের পর মুদ্রিত। ইহা আর্ভিংয়ের প্রবন্ধরচনার অন্ততঃ ১৭ বৎসর পরে প্রকাশিত।

ব্রিটিশ মিউজিয়ামের ছাপ দেখিয়া জানিতে পারিলাম, পুস্তকখানি তথায় ১৮৫০ সালে সংগৃহীত হইয়াছিল।' ৮৮

বিশ্ববিখ্যাত ঔপন্যাসিক স্কটের আবাসগৃহ 'অ্যাবেট্‌সফোর্ড' দেখে তিনি একটি মনোজ্ঞ বিবরণ ডায়েরিতে লিপিবদ্ধ করেছেন' অ্যাবেট্‌সফোর্ড' (এডিনব্রা, ১৯০২) রচনাটিতে। রচনাটি থেকে জানা যায় স্কটের উপন্যাসগুলি তিনি বেশ ভালভাবেই পাঠ করেছিলেন এবং লকহার্টের লেখা স্কটের জীবনীও তাঁর জানা ছিল।

একবার মাস দুয়েকের জন্য গিয়েছিলেন ব্রাইটনে। সেখানে উঠেছিলেন এক ব্যাপ্টিস্টস্ হোমে'। তাঁর অখৃষ্টানত্ব সত্ত্বেও সকলের কাছ থেকে তিনি ভাল ব্যবহার পেয়েছিলেন। প্রভাতকুমারের সূক্ষ্ম পর্যবেক্ষণ শক্তি শুধু ব্রাইটনের বাহ্যিক চাকচিক্য দেখে তৃপ্ত হয়নি গভীর আন্তরিকতায় তিনি লক্ষ্য করেছেন তাদের ধর্মীয়, সামাজিক, দৈনন্দিন জীবনযাত্রা। ব্রাইটনের দিনগুলির বিবরণ দিতে গিয়ে লিখেছেন।—

' সে বাড়ীতে আমি বহু লোকের সঙ্গে মিশিবার সুযোগ পাইয়াছিলাম। ধর্ম্ম সম্বন্ধেও অনেক তর্ক বিতর্ক হইত। দেখিলাম, ধর্ম্মযাজকদের গণের মধ্যে অনেকে বাইবেলের কথা literally গ্রহণ করেন না। এমন লোক আছেন, যাঁহারা বাইবেলের সৃষ্টিতত্ত্ব বিশ্বাস করেন না। এমন লোক আছেন, যাঁহারা খৃষ্টধর্ম্মের একটা প্রধান বিষয় — অনন্ত নরকবাদ পর্য্যন্ত উড়াইয়া দেন। আমি একদিন একজনকে জিজ্ঞাসা করিলাম, কবি শেলি তাঁহার 'কুইন ম্যাব' কাব্যের পরিশিষ্টে যে প্রশ্নটি উত্থাপন করিয়াছেন, তাহার উত্তর কি? প্রশ্নটি এই — ' খৃষ্টকে যে ব্যক্তি পরিত্রাতা বলিয়া স্বীকার করিল না, তাহার পক্ষে অনন্ত নরক বাইবেলের বিধান। তবে খৃষ্ট জন্মের দুই হাজার বৎসর পূর্বে যে সমস্ত মনুষ্য জন্মিয়াছে ও মরিয়াছে, তাহাদের আত্মা এবং বর্তমান সময়ে অসভ্যদেশের লোক, যাহাদের কাছে খৃষ্টধর্ম্ম প্রচার হয় নাই, তাহাদের আত্মা — সমস্তই অনন্ত নরকযোগ্য — ইহা কি রকম বিচার?' বন্ধু বলিলেন —' ইহাদের পক্ষে বাইবেলের ও বিধান প্রযোজ্য নহে। যাহারা খৃষ্টকে গ্রহণ করিবার কোন অবসর পায় নাই — তাহারা কখনও দন্ডযোগ্য নহে।' ৮৯

প্রসঙ্গত তিনি ধর্ম্মযাজকদের সঙ্গেও খৃষ্টধর্ম্ম সম্মুখে আলাপ আলোচনা করেছেন। সহজেই বোঝা যায় নিজের জ্ঞান ভান্ডারকে পরিপূর্ণ করে তুলবার জন্য তিনি কতটা সচেষ্ট ছিলেন।

প্রভাতকুমার ছিলেন অভিনয় কলার রসিক । কি স্বদেশে কি বিদেশে অবসরমত তিনি প্রায়শই থিয়েটার দেখতেন । বিলাতে থাকাকালীন তাঁর প্রথম থিয়েটার দর্শন হ্যামারস্মিথে । '... বিলাতে পৌঁছিবার অল্প কয়েকদিবস পরেই আমি সংবাদ পত্রে বিজ্ঞাপন দেখিলাম' হ্যামারস্মিথ থিয়েটারে' মিসেস হেনরি উড প্রণীত 'ঈষ্টালন' নামক উপন্যাসখানি নাটকাকারে অভিনীত হইবে। এই বইখানি পূর্বে আমার পড়াছিল , সুতরাং বিবেচনা করিলাম , যাই দেখিয়া আসি ।' [১০] সেদিন থিয়েটার দেখে তিনি হতাশ হয়েছিলেন — এবং সঙ্গে সঙ্গে মনে করেছিলেন কলিকাতার রঙ্গমঞ্চ থেকে সেদিনকার সেই কলকাতার থিয়েটারের কথা । অভিনয় প্রভাতকুমারের কাছে উঁচুদরের বলে মনে হয়নি । কিন্তু তিন বৎসর প্রবাসকালে আরও বহুবার তিনি লন্ডনের ভাল ভাল থিয়েটারও দেখেছেন — বিশ্ববিখ্যাত অভিনেতাদের অভিনয় দেখার সুযোগও তিনি লাভ করেছিলেন যেমন আর্ভিং , মিস অল্গা নেদারসোল ইত্যাদি ।

বিলাতে থাকাকালে প্রভাতকুমারের জীবনে একটি অন্যতম উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটেছিল — তিনি সম্রাট সপ্তম এডওয়ার্ডের সঙ্গে একরাত্রে ভোজনের দুর্লভ সুযোগ পেয়েছিলেন । জীবনের এই স্মরণীয় ঘটনাটির উল্লেখ করে রসিকতা করে তিনি লিখেছেন —

' ১৯০৩ সালের নভেম্বর টার্মে আমি' বার - এ কল্ড হইয়া দেশে ফিরিব ভাবিলাম । রাজভোজে উপস্থিত থাকিবার সুযোগ আমার ভাগ্যে বুঝি আর ঘটিল না ।

কিন্তু বিধিলিপিকে কে খন্ডাইতে পারে ? আমার জন্মের পর ষষ্ঠরাত্রেই বিধাতা পুরুষ স্বদেশী শরের কলম দিয়া মোটা মোটা অক্ষরে আমার অদৃষ্ট - ফলকে লিখিয়া দিয়াছিলেন' এই বালক একদিন সম্রাটের সহিত ভোজন করিবে — সুতরাং শুনা গেল , নভেম্বর টার্মে রাজা আমাদের টেম্পলে আসিয়া ভোজন করিবেন। [১১]

এই রাজ ভোজে অংশ গ্রহণ করার জন্য সুদূর ভারতবর্ষ এবং অস্ট্রেলিয়া থেকেও মিডল - টেম্পল -ভুক্ত ব্যারিস্টারগণ আবেদন করেছিলেন — কারণ সপ্তম এডওয়ার্ড মিডল - টেম্পলের ছাত্র ছিলেন । আবেদনকারীর সংখ্যা অত্যধিক হওয়ায় লটারী করে ছাত্র নির্বাচন করা হয় । সৌভাগ্যবশত: প্রভাতকুমার আমন্ত্রিত হন ।

ইংলন্ডে থাকা কালে , বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসের অনুবাদকর্ত্রী শ্রীমতী মিরিয়াম নাইটের সঙ্গে প্রভাতকুমারের পরিচয়ের সুযোগ ঘটেছিল ।এই বর্ষীয়সী বিদগ্ধা মহিলা তাঁকে অত্যন্ত স্নেহের চোখে দেখতেন । ভারতবর্ষ এবং ইংলন্ডের সমাজ ও সাহিত্য নিয়ে উভয়ের মধ্যে মাঝে মাঝে আলোচনা হত ।

১৯০৩ সালের ডিসেম্বরের শেষে মিডিল - টেম্পল থেকে ব্যারিস্টার হয়ে প্রভাতকুমার স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেন ।

(৫)

অনধিক তিনটি বৎসরের ইংলন্ড প্রবাস জীবনের ফল প্রভাত জীবনে সুদূরপ্রসারী । ব্যক্তিগতভাবে তিনি যে সুখস্বপ্ন নিয়ে বিলাত গিয়েছিলেন - সে স্বপ্ন তাঁর সফল হয়নি । শেষ পর্য্যন্ত সরলাদেবীর সঙ্গে পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ হতে পারেননি বলে তাঁর হৃদয়ে নিশ্চিয় এক দুরপণেয় ক্ষতের সৃষ্টি হয়েছিল এবং দ্বিতীয় বার তিনি দার পরিগ্রহ করেননি । যে কলকাতাকে কেন্দ্র করে তাঁর সাহিত্যমুকুল বিকশিত হতে সুরু করেছিল সেই কলকাতা পরিত্যাগ করে তিনি সুদূর দার্জিলিংএ চলে যান ।

যাহোক, সেকালে বাঙালী সমাজের যারা বিলাতে যেতেন তাদের অধিকাংশেরই মনোগত অভিপ্রায় ছিল বিদেশ থেকে উচ্চ শিক্ষা লাভ করে স্বদেশে এসে অধিক অর্থ উপার্জনের পথ সুগম করা । ভাবী জীবনের স্বপ্নে বিভোর হয়ে অনেকেই সেখানে আত্মকেন্দ্রীক বিলাসবহুল জীবনযাপনে অভ্যস্ত হয়ে উঠতেন । এদিকথেকে প্রভাতকুমার কিছুটা ব্যতিক্রম । শুধুমাত্র উচ্চশিক্ষালাভ নয় সেই সঙ্গে তিনি মাতৃভাষার সেবায় সব সময় নিজেকে নিয়োজিত করেছেন । তাঁর এই অনলস সেবার প্রমাণ রয়েছে তৎকালীন 'ভারতী'র পৃষ্ঠায় ।

প্রভাতকুমার বিলাত যাত্রাকালে জাহাজে বসেই' কাশীবাসিনী' গল্পটি লিখেছিলেন । গল্পটি বৈশাখ, ১৩০৮ সালে'ভারতী'তে প্রকাশলাভ করে ।

'কলির মেয়ে'(ভারতী , আশ্বিন ১৩০৮),'ধর্মের কল' (ভারতী আষাঢ়, ১৩০৮) ,'প্রণয় পরিণাম'(ভারতী ভাদ্র, ১৩০৮),'ছদ্মনাম'(ভারতী , মাঘ, ১৩০৮) 'বাস্তুসাপ' (ভারতী , বৈশাখ, ১৩০৯),'সচ্চরিত্র'(ভারতী, ফাল্গুন, ১৩০৮) ,'ভুল শিক্ষার বিপদ'(ভারতী , জ্যৈষ্ঠ, ১৩০৯) 'এক দাগ ঔষধ' (ভারতী , পৌষ, ১৩০৮ 'পতন নামে প্রকাশিত) এই সমস্তগল্পগুলি তাঁর বিলাত প্রবাসকালের রচনা ।

এই সময়ে নিজে সাহিত্য সৃষ্টি করে যে তৃপ্ত ছিলেন তাও নয়, বাংলা সাহিত্যের সার্থিক সমৃদ্ধির জন্যও তিনি সচেষ্ট ছিলেন । মনীষী রমেশ-চন্দ্র দত্তের সঙ্গে যোগাযোগসূত্রে এবং পরিচয় সূত্রে হৃদ্যতা স্থাপিত হয়েছিল ।

তৎকালীন ভারতীর সম্পাদিকা সরলাদেবীর কথানুসারে রমেশচন্দ্রকে দিয়ে কয়েকটি মূল্যবান প্রবন্ধ লিখিয়ে নিয়েছিলেন। সেই সময়ে লেখা রমেশচন্দ্রের নিম্ন লিখিত প্রবন্ধগুলি 'ভারতী'তে প্রকাশিত হয়েছিল ।

১। হিন্দু দর্শন — প্রকাশকাল'ভারতী' বৈশাখ — জ্যৈষ্ঠ, ১৩০৮
২। ভারতীয় দুর্ভিক্ষ (তাহার কারণ ও প্রতিকার) —'ভারতী', আষাঢ়, ১৩০৮
৩। ব্রিটিশ শাসনে ভারতীয় শিল্পের অবনতি —'ভারতী', শ্রাবণ, ১৩০৮
৪। বঙ্গদেশে রাজস্ব বন্দোবস্ত —' ভারতী', পৌষ, ১৩০৮
৫। ভারতের অর্থনৈতিক সমস্যা —' ভারতী', ফাল্গুন, ১৩০৮
৬। ভূমিকর আন্দোলনের ফলাফল —' ভারতী' বৈশাখ — আষাঢ়, ১৩০৯ ।

রমেশচন্দ্রের কর্মব্যস্ত জীবনে এ ধরণের প্রবন্ধ রচনার অবসর ছিল খুবই অল্প তাছাড়া বাংলা লেখাও প্রায় তিনি ছেড়ে দিয়েছিলেন। কিন্তু প্রভাতকুমারের ~~xxxxx~~ অনুরোধকে তিনি উপেক্ষা করতে পারেন নি । এই প্রসঙ্গে রমেশচন্দ্রের প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ জানাতে গিয়ে প্রভাতকুমার লিখেছেন —

' ভারতীর তদানীন্তন সম্পাদিকা শ্রীমতী সরলা দেবী মহাশয়ার অনুরোধে আমি গিয়া দত্ত মহাশয়কে প্রবন্ধের জন্য ধরিলাম । তিনি বলিলেন — বাঙ্গালা লেখা বহুকাল ছেড়ে দিয়েছি ।'

আমি বলিলাম —' বা: — সে ত হবে না । আপনি আর যাই ছাড়ুন — বাঙ্গলা লেখা ছাড়তে পারেন না ।'

তিনি বলিলেন —' কি লিখি ?'

সেই সময়ে শ্রীগোপাল বসু মল্লিকের ফেলোসিপের লেকচার সংবলিত একখানি হিন্দু দর্শনের বহি বাহির হইয়াছিল, সেই বইখানি আমি হাতে করিয়া লইয়া গিয়াছিলাম । বলিলাম —' এইটের সমালোচনা সূত্রে হিন্দু দর্শন সম্বন্ধে একটা প্রবন্ধ লিখুন ।

তিনি বলিলেন —' আচ্ছা বইখানি পড়ি । অমুকদিন তুমি এস । আমি ব'লে যাব, তুমি লিখে যাবে — নয়ত আমি লিখলে ~~xx~~ বড়ই দেরী হয়ে যাবে ।

আমি আহ্লাদের সহিত সম্মতি জানাইলাম । যথাদিনে গিয়া উপস্থিত হইয়া গণেশবৃত্তি অবলম্বন করিলাম । বোধ হয়, আরও দুই এক দিন যাইতে হইয়াছিল । ভারতীর দুই সংখ্যায় সে প্রবন্ধ বাহির হইয়াছিল ।'[১২] প্রবাসী

এছাড়া রমেশ দত্তের Economic History of British India থেকে কয়েকটি পরিচ্ছেদের বাংলায় মর্ম্মানুবাদ করে দত্ত মহাশয়ের দ্বারা সংশোধিত ও স্বাক্ষরিত করে প্রভাতকুমার' ভারতী'তে প্রকাশ করার জন্য পাঠিয়েছিলেন । সেগুলি , পূর্বে উল্লেখিত রমেশদত্তের ছয়টি প্রবন্ধের 'হিন্দু দর্শন' ব্যতিরেকে অবশিষ্ট পাঁচটি । প্রবন্ধগুলি সম্বন্ধে শ্রদ্ধেয় মন্মথনাথ ঘোষ মহাশয় তাঁর 'প্রভাত স্মৃতি' [১৩] প্রবন্ধে লিখেছেন –

' এরূপ মৌলিক গবেষণা পূর্ণ প্রবন্ধ পত্রস্থ করিবার সৌভাগ্য অতি অল্প বাঙ্গালা সাময়িক পত্রের অদৃষ্টে ঘটিয়াছে।'

বিলাত বাসকালে প্রভাতকুমার তাঁর জ্ঞান এবং অভিজ্ঞতার ভান্ডারকে পূর্ণথেকে পূর্ণতর করে তুলেছেন । নিয়মিতভাবে তিনি ব্রিটিশ মিউজিয়মে বসে পড়াশুনা করতেন । তাঁর 'রমাসুন্দরী' উপন্যাসে যে কাশ্মীর বর্ণনা দিয়েছেন সেইসমস্ত তাঁর সম্পূর্ণ পুঁথি পড়া বিদ্যা । প্রভাতকুমার কোনদিন কাশ্মীর যান নি ।ব্রিটিশ মিউজিয়মে বসে তিনি এগুলি লিখেছেন । প্রসঙ্গত উল্লেখ্য ১৩২১ বঙ্গাব্দের মাঝা মাঝি রবীন্দ্রনাথ একবার বুদ্ধগয়া ভ্রমনে গিয়েছিলেন । সে সময়ে প্রভাতকুমার এবং তাঁর কবি বন্ধু বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় গয়াতে ছিলেন। রবীন্দ্রনাথ গয়াতে গয়া থেকে ট্রেনযোগে এলাহাবাদ যান । প্রভাতকুমার ও বসন্তকুমার রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে দেখা করার জন্য ষ্টেশনে উপস্থিত হন।উভয়ের সঙ্গে যে আলাপ আলোচনা হয়েছিল সতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়' রবীন্দ্র সঙ্গমে'[১৪] তার উল্লেখ করেছেন –

' ... গাড়ী আসিতে তখন অর্দ্ধঘন্টা বাকী , প্রভাতবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন –' এলাহাবাদে আপনি কতদিন থাকিবেন ?

রবিবাবু বলিলেন –' চারি পাঁচদিন থাকিব । তাহার পর কাশ্মীর গিয়া মাসখানেক থাকিবার ইচ্ছা আছে ।'

প্রভাতবাবু বলিলেন –' কাশ্মীর যাইবেন ? তাহা পূর্বে আমায় বলেন নাই । যদি যান , তবে একখানা House boat লইবেন। বাস ও ভ্রমন দুই তাহাতে হইতে পারিবে ।

রবিবাবু বলিলেন –' কাশ্মীরের দৃশ্যের খুব সুখ্যাতি শুনি । তুমি ত গিয়াছিলে ।'

প্রভাতবাবু বলিলেন –' না আমি কখনও যাই নাই ।'

একথা শুনিয়া রবিবাবু বিস্মিত হইয়া বলিলেন –' যাও নাই ?

— তবে 'রমাসুন্দরী'তে ও সব বর্ণনা লিখিলে কেমন করিয়া ?'

প্রভাতবাবু হাসিয়া বলিলেন —' ও সমস্ত বিবরণ, বৃটিশ মিউজিয়ামে বসিয়া আমি লিখিয়াছিলাম ।'

রবিবাবু বলিলেন —' অ্যাঁ বল কি ! তুমি ত সাংঘাতিক লোক হে ! নূতন সংস্করণ 'রমাসুন্দরী' কাল তুমি আমায় দিলে , বুধগয়ায় তোমার বই পড়িতেই পড়িতেই ত আমার কাশ্মীর দেখিবার সখ হইল । ভাবিলাম , প্রভাত-কুমার গিয়াছিল , আমিই বা যাইব না কেন ? তুমি যাও নাই ! — এত পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা পড়িলে মনে হয় তুমি স্বচক্ষে দেখিয়া এই সব লিখিয়াছ ।'

বিলাতে থাকাকালীন মধ্যবিত্ত পরিবারের মানসিকতাকে তিনি গভীর ভাবে উপলব্ধি করেছিলেন । তাঁর আবাসস্থল ছিল মধ্যবিত্ত পরিবারে। এই পরিবারের সৌজন্যে সমশ্রেণীভুক্ত বহু পরিবারেই মেলামেশার সুযোগও তিনি পেয়েছিলেন । এই পরিচিতি তাঁর দৃষ্টিকে উদার, হৃদয়কে প্রশস্ত করতে সাহায্য করেছে । স্বদেশে প্রত্যাবর্তনের পর অনেকে তাঁকে বিলেতের সমাজ ব্যবস্থা , রীতি-নীতি , আচার-ব্যবহার সম্বন্ধে প্রশ্ন করতেন । এই প্রসঙ্গে তাঁর দু একটি বক্তব্য উদ্ধার করা গেল ।

' ... আমাকে অনেকেই জিজ্ঞাসা করিয়া থাকেন — ইংরাজ স্ত্রী - সমাজে সতীত্বের মর্য্যাদা কিরূপ ? আমি উত্তর দিই, বড় বড় ঘরের কথা আমি জানি না , সে দলের সহিত মিশিবার কোন সুযোগ পাই নাই — কিন্তু মধ্যবিত্ত শ্রেণীর কথা বলিতে পারি — তাঁহাদের মধ্যে সতীত্বের মর্য্যাদা যে আমাদের অপেক্ষা কম এমন বোধ হয় না । তবে শহরবাসী নিম্ন শ্রেণীর স্ত্রীলোকদের মধ্যে — অর্থাৎ যাহারা কারখানায় বা দোকানে গতর খাটাইয়া খায় , তাহাদের মধ্যে সতীত্ব জিনিষটি খুব সুপ্রাপ্য নয় । আমি তিন বৎসরকাল সে দেশে একটি মধ্যবিত্তশ্রেণীর পরিবারমধ্যে পরিবারস্থ একজনের মতই বাস করিয়াছিলাম । সেই সূত্রে আরও অন্যান্য পরিবারের সহিতও আমার মেলামেশার সুযোগ হইয়াছিল । তাহাদের সকলের বাড়ীতে বড় বড় মেয়েরও অপ্রতুল ছিল না । কিন্তু এই তিন বৎসরের মধ্যে কি বিবাহিত , কি অবিবাহিত , পরিচিত কোন মেয়ে সম্বন্ধে ঘুণাক্ষরেও অপবাদের কথা আমি শুনি নাই ।' [১৫] প্রসঙ্গত তিনি ইংরাজ রমনীর ব্যক্তিত্ববোধ , আত্মসম্মানবোধ , কর্তব্যনিষ্ঠা , স্বাবলম্বনপ্রিয়তা, সৌন্দর্য্যপ্রিয়তার কথাও উল্লেখ করেছেন ।

পরবর্তীকালে বিলাত প্রবাসের অভিজ্ঞতাকে কেন্দ্র করে তিনি অনেক গল্প রচনা করেছেন। তারমধ্যে 'দেশী ও বিলাতী' গল্পগ্রন্থের গল্পগুলোর বিলাতী অংশের

গল্পগুলি অন্যতম ।

বিলাত থেকে ফিরে এসে অল্প কিছু দিনের জন্যে তিনি জামালপুরে ছিলেন। জামালপুরে তখন তাঁর দুই পুত্র শ্রীঅরুণকুমার ও এবং প্রশান্ত কুমার এবং বিধবা মা বসবাস করতেন । প্রভাতকুমারের বিলাত যাত্রার আগেই বাবা মারা যান । তখন তাঁরা বসবাস করতেন দিনদারনগরে রেলকোয়ার্টারে । চাকুরী থাকাকালীন অবস্থায় জয়গোপাল মুখোপাধ্যায় স্থায়ীভাবে বসবাসের জন্য জামালপুরে বাড়ী করেছিলেন (বর্তমানে সে বাড়ী বিক্রীত),[১৬] যদিও প্রভাতকুমার বিলাতে থাকাকালীন অবস্থায় তার মামাতো ভাই রাজেন বন্দ্যোপাধ্যায় এই পরিবারের তত্ত্বাবধানে ছিলেন । রাজেন বাবু ছিলেন জামালপুর এইচ.ই. স্কুলের শিক্ষক । প্রভাতকুমারের ছেলে দুইটি বাল্যকালে এই স্কুলেই পড়াশুনা করেছেন । অরুণ মুখোপাধ্যায় ১৯১০ সালে এখান থেকে মাট্রিক পাশ করেছিলেন ।

সে কালে বিলাত প্রত্যাগতের সহজ এবং স্বাভাবিকভাবে সংসারে মেশা দুরূহ ব্যাপার ছিল – বিশেষতঃ মধ্যবিত্ত সংসারে যেখানে সংস্কার বদ্ধমূল । প্রভাতকুমারও জাত-যাওয়ার সংস্কারের প্রকোপে পড়েছিলেন । শোনা যায় তিনি বাইরের বাড়ীতেই বেশীর ভাগ থাকতেন কিন্তু দিনান্তে সন্ধ্যার অন্ধকারে লুকিয়ে লুকিয়ে মায়ের সঙ্গে দেখা করে আসতেন । মাতৃভক্ত প্রভাতকুমার কিছুতেই নিজেকে দূরে সরিয়ে রাখতে পারতেন না ।' [১৭]

পরিবারের ভরণ পোষণ এবং কর্মজীবনে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করার তাগিদে প্রভাতকুমারকে জামালপুর ত্যাগ করতে হয় । ১৯০৪ খ্রীষ্টাব্দের প্রথম দিকেই তিনি প্র্যাক্টিসের জন্য দার্জিলিঙে উপস্থিত হন । দার্জিলিঙে তিনি এসে ওঠেন 'লুইস জুবিলি স্যানিটোরিয়মে।' শৈলনগরীর অতি মনোরম পরিবেশে অবস্থিত এই স্যানিটোরিয়ামের কথা পরবর্তীকালে লিখিত উপন্যাস' সত্যবালা' (১৩৩১)'সতীর পতি' (১৩৩৫) ইত্যাদিতে উল্লেখ আছে । স্যানিটেরিয়ামটির দুটি বিভাগ – অর্থোডক্স এবং সাধারণ । অর্থোডক্স বিভাগে সাধারণত যাঁরা গোড়া হিন্দু তারাই আশ্রয় নিতেন – সাধারণ বিভাগে খাওয়া দাওয়ার ব্যাপারে তেমন কোন বাধা নিষেধ ছিল না । প্রভাতকুমার সাধারণ বিভাগে আশ্রয় নিয়েছিলেন । স্যানিটোরিয়মে একটি লাইব্রেরী ছিল । প্রভাতকুমার এই লাইব্রেরীর নিয়মিত পাঠক ছিলেন। শোনা যায় তাঁর লিখিত কয়েকখানি বই এই লাইব্রেরীকে তিনি দান করেছিলেন।[১৮]

প্রভাতকুমারের দার্জিলিং থাকাকালীন অবস্থায় রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের সঙ্গে দেখা হয়েছিল এবং মাঝে মাঝে তিনি দত্ত মহাশয়ের দার্জিলিংয়ের বাড়ীতে যেতেন। প্রভাতকুমার জানিয়েছেন —

'১৯০৪ সালের মার্চ মাসে দত্ত মহাশয় দার্জিলিং গিয়াছিলেন। আমিও তখন সেখানে। এক কুয়াসাচ্ছন্ন প্রভাতে, জলাপাহাড়ে তাঁহার 'রথিমে' নামক গৃহে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিলাম। তাঁহার কন্যা জামাতা দৌহিত্রী তখন প্রাতর্ভ্রমনে বাহির হইয়াছিলেন। দত্ত মহাশয় একাকী বসিয়া আগুন পোহাইতেছিলেন। অর্দ্ধঘন্টা কথাবার্তা কহিয়া বিদায় গ্রহণ করিলাম। সেই আমার শেষদেখা।' [১১]

প্রভাতকুমার রমেশচন্দ্রের কাছ থেকে ব্যারিস্টারী ব্যবসা সম্বন্ধে কিছু উপদেশ নির্দ্দেশ নিয়েছিলেন এবং এদেশে এসে ব্যারিস্টারদের সমাজে যাতে সহজেই পরিচিত হতে পারেন সেজন্য দত্ত মহাশয় তাঁর ভারতবর্ষীয় বন্ধুদের নামে দু একটি অনুরোধ পত্র প্রভাতকুমারকে লিখে দিয়েছিলেন। 'রমেশচন্দ্র স্মৃতি' কথায় প্রভাতকুমার উল্লেখ করেছেন —

' আমি বলিলাম, ' আপনি ত অনেকদিন আমাদের দেশের বিচারাসনকে অলঙ্কৃত করেছিলেন, আমার ব্যবসা সম্বন্ধে আমায় দুই একটা উপদেশ দিন।'

তিনি বলিলেন, ' কেবল একটা কথা তোমায় বলে দিই — Never worry the judge এক একজন ব্যারিস্টার আমার এজলাসে এসে কেবল বক্‌বক্ করে এককথা একশোবার বলতেন। ভারি বিরক্ত হতাম। আমাদের দেশে সিভিল সার্ভিস অত্যন্ত overworked তাঁদের এত সময় নেই যে, তাঁরা সমস্তদিন কৌশুলির বক্তৃতা শোনেন। তোমার যা বক্তব্য আছে তা সংক্ষিপ্ত অথচ সরল ভাষায় বলে শেষ করে দেবে — তাতে তোমার উপর আদালতের সন্তোষ বৃদ্ধি হবে — কায আদায় হবে।'

৺ রমেশচন্দ্রদত্তের এই উপদেশ প্রভাতকুমার তাঁর ব্যারিস্টারী জীবনে কতটা মেনে চলেছিলেন তা বলা কঠিন তবে ব্যক্তিগত জীবনে তিনি ছিলেন মিতবাক এবং আপাতদৃষ্টিতে রাশভারি প্রকৃতির মানুষ। গায়ে - পড়ে কারও সঙ্গে পরিচিত হবার চেষ্টা বা অকারণে নিজেকে জাহির করা এসব ছিল তাঁর স্বভাববিরুদ্ধ। বরং তিনি ছিলেন কিছুটা গোপন-প্রয়াসী মনোবৃত্তির মানুষ। দার্জিলিং অবস্থানকালে তিনি এখানকার অধিবাসীদের দৈনন্দিন জীবনযাত্রা, স্বভাব-চরিত্র, আচার-ব্যবহার, সব কিছুতেই গভীরঅভিনিবেশ সহকারে লক্ষ্য করেছেন। তাই তাঁর 'সত্যবালা' উপন্যাসে মল্লিক সাহেবের গৃহভৃত্য মংলু চরিত্রটি এত বাস্তব এবং জীবন্ত। মংলু সহজ সরল-বিশ্বাসী কিন্তু বাস্তব

জ্ঞান বহির্ভূত। মল্লিক সাহেবের কাছ থেকে দশ টাকা বকশিস পাওয়ার আশায় সে নিজের জীবনকে বিপন্ন করেছে। সতী - কিশোরীর বাগানে নৈশ-গোপন মিলনে বাধাসৃষ্টি করা এবং হাতে হাতে কিশোরীকে ধরার জন্য মল্লিক সাহেব মংলুকে নিয়োগ করেছিলেন। এবং নির্দ্দেশ দিয়েছিলেন - মিস সাহেবের (সতীর) কামরায় কিশোরী প্রবেশ করতে গেলেই তাকে জড়িয়ে ধরবে। কিন্তু কিশোরী এবং সতী যখন বাগানে এসে মিলিত হয়েছে এবং গোপন মিলন শেষে কিশোরী যখন ফিরে যাচ্ছে তখনও সে চুপচাপ এসব দেখেছে। সে কিশোরীকে ধরার চেষ্টা করেনি তার একমাত্র কারণ কিশোরী তো সতীর কামরার বারান্দায় ওঠেনি। কিশোরী এসেছে সতীর সঙ্গলাভ করে আবার সে ফিরে যাচ্ছে এ সমস্ত খবর সে মল্লিক সাহেবকেই জানিয়েছে। খবর পেয়ে মল্লিক সাহেব যখন রেগে তাকে কিশোরীকে ধরার আদেশ দিয়েছেন তখন মংলু 'বহুৎখু হুজুর' বলে ছুটে কিশোরীকে ধরতে গিয়ে নিজ জীবন বিপন্ন করেছে। এই উপন্যাসের ফুরচিং চরিত্রটিও বাস্তবানুগ।

দার্জিলিং বসবাসকালে এর পাশেই অবস্থিত ঘুম, কার্সিয়াং ইত্যাদি যে ছোট ছোট পাহাড়িয়া জায়গাগুলি রয়েছে এসব স্থানে মাঝে মাঝে তিনি বেড়াতে গিয়েছেন। জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩৭ সালের 'মাসিক বসুমতী'তে 'ঘড়ি' নামে তাঁর যে গল্পটি বেরিয়েছিল সেখানে কার্সিয়াং সহরের ছয়টি ফটো সন্নিবিষ্ট ছিল। ফটোগুলি যথাক্রমে (১) কার্টরোড - কার্সিয়াংয়ের পথে (২) কার্সিয়াং ষ্টেশন - দার্জিলিং মেল থেমে আছে (৩) কার্সিয়াং - এ ডাউহিল স্কুল - দূরের দৃশ্য (৪) ডাউ হিল স্কুল (৫) উপর থেকে কার্সিয়াং সহরের দৃশ্য (৬) ক্লারেন্ডন হোটেল, কার্সিয়াং। গল্পটিতে পাহাড়িয়া মেয়ে ঘড়ি এবং কলকাতার ছেলে সুধার যে প্রণয় চিত্র দেখান হয়েছে, সেটি অত্যন্ত বাস্তব। ঐ সব অঞ্চলের নিম্নবিত্ত সংসারের মেয়েরা প্রায়শই অন্য সমাজের ছেলেদের পতিত্বে বরণ করতে দ্বিধাবোধ করে না আবার সামান্য কারণে ত্যাগ করতেও কুণ্ঠিত হয় না। ঐ অঞ্চলে থাকাকালীন প্রভাতকুমার বোধ করি, এদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল হয়েছিলেন।

দার্জিলিংয়ে প্রাক্টিস বিশেষ সুবিধা না হওয়ায় তৎকালে উত্তর-বঙ্গের অন্যতম প্রধান মফঃস্বল সহর রংপুরে প্রভাতকুমার উপস্থিত হন ১৯০৪ সালের জুলাই মাসে। আইন সংক্রান্ত ব্যবসায়ে লিপ্ত হয়ে অবশিষ্ট বঙ্গের বহু বাঙ্গালী এখানে এসে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলেন - সম্ভবতঃ প্রভাত-কুমারের আশা ছিল অনুরূপ।

রংপুরে এসে তিনি ওঠেন ডাকবাঙ্গলোতে। রংপুরে তাঁর অবস্থিতিকাল মোটামোটি ভাবে চার বৎসর - এবং এই ডাকবাঙলোতেই ছিল তাঁর আবাসস্থল। রংপুরে তাঁর প্র্যাক্‌টিস কেমন জমেছিল সে সম্বন্ধে বিশেষ কোন তথ্য পাওয়া যায়নি। তবে তদানীন্তন কালের বিখ্যাত সাহিত্যিক এবং সাহিত্য রসিকদের সঙ্গে তাঁর যে আন্তরিক যোগাযোগ অক্ষুন্ন ছিল সে সবের কিছু কিছু সংবাদ পাওয়া গেছে।

সে সময়ের খ্যাতনামা কবি শ্রীদেবেন্দ্রনাথ সেন মহাশয়ের সাথে তাঁর আকস্মিক ভাবে এখানে একদিন সাক্ষাৎ ঘটেছিল।' ১৯০৪ খৃষ্টাব্দে জুলাই মাসে আমি রঙ্গপুরে প্র্যাকটিস করিতে যাই। ডাক বাংলায় বাস করিতেছি, তখনও বাড়ী পাই নাই।..... বেলা আন্দাজ নয়টা, আমি মোকদ্দমার কাগজপত্র দেখিতেছি। এমন সময়ে বগলে বৃহৎ খাতা লইয়া একজন ক্ষীণ কায় প্রৌঢ় ব্যক্তিকে বারান্দায় দেখিতে পাইলাম। পর মুহূর্তেই খানসামা একখানি কার্ড আনিয়া আমার হাতে দিল। ... তাড়াতাড়ি বাহিরে গেলাম। আদর অভ্যর্থনা করিয়া দেবেন্দ্রবাবুকে নিজ কামরায় আনিয়া বসাইলাম।' [১০০]

রঙ্গপুরে দেবেন্দ্রনাথের সঙ্গে সাক্ষাৎ প্রসঙ্গে প্রভাতকুমার বলেছেন ... এই প্রথম সাক্ষাৎ অথচ যেন কত কালের পরিচয়, এইরূপ আগ্রহে আনন্দে কথাবার্তা আরম্ভ হইল।' [১০১]

এই সাক্ষাৎকার সম্বন্ধে সরলাবালা সরকার তাঁর 'সাহিত্য - জিজ্ঞাসা'য় বলেছেন —' দেবেন্দ্রনাথ শ্রীকৃষ্ণ পাঠশালার জন্য ভিক্ষার্থী হইয়া গিয়াছিলেন, প্রভাতকুমারের নূতন প্র্যাক্‌টিস, পাঁচ টাকার বেশী তিনি দিতে পারেন নাই, দেবেন্দ্রনাথ তাহাতেই খুসী হইয়া টাকাটা গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং বিদায়ের পূর্ব মুহূর্তে তাঁহাকে প্রশ্ন করিয়াছিলেন' আমার কবিতা আপনার কেমন লাগে। চক্ষুলজ্জার খাতিরে বাড়িয়ে বলবেন না, ঠিক খাঁটি কথাটি বলুন।'

বলাবাহুল্য প্রভাতকুমার দেবেন্দ্রনাথ সেনের কবিতার ভক্ত-পাঠক ছিলেন। দেবেন্দ্রনাথের সঙ্গে চাক্ষুষ পরিচয় না থাকলেও তাঁর কবিতার মাধ্যমে তাঁদের পরিচয় ঘটেছিল।' প্রভাতবাবুর কথাতেই তাহা বুঝা যায়। তিনি বলিয়াছিলেন, ' ১৮৯০ কিম্বা তাহার কাছাকাছি 'ভারতী'তে দেবেন্দ্রবাবুর 'হরশিঙ্গার' বাহির হইল। তাহার পর' ভারতী- ও সাহিত্যে' দেবেন্দ্রবাবুর কবিতার যেন পুষ্পবৃষ্টি আরম্ভ হইয়া গেল। কবিতাগুলি একেবারে নূতন ঢং এর কবির ঘর, গৃহস্থালীর কথা, স্ত্রীর কথা, ছেলেমেয়ের কথা পড়িয়া পড়িয়া তাহাকে যেন আমাদের নিতান্ত আত্মীয়ের মত মনে হইতে লাগিল। তাঁহার সুমধুর হৃদয়ের নানাভাবের ছবি মাসিক পত্রের পৃষ্ঠায় মাঝে মাঝে আমরা দেখিতে লাগিলাম, দেখিয়া দেখিয়া মুগ্ধ হইতাম।' [১০২]

দেবেন্দ্রনাথের সঙ্গে স্বল্পকালীন এই সাক্ষাৎকার থেকে এটুকু অনুমান করা যেতে পারে যে প্রভাতকুমারের প্রাক্টিস্ তখনও বিশেষ জমে ওঠেনি । তিনি আইন ব্যবসায় লিপ্ত থাকলেও এসময়ে তিনি সমকালীন সাহিত্য এবং সাহিত্যিক-দের প্রতি কতখানি অনুরাগী ছিলেন তার পরিচয় অন্যত্র পাই ।

১৩১২ বঙ্গাব্দের বৈশাখ xxxx মাসের ১১ তারিখে রঙ্গপুরে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের প্রথম শাখার প্রতিষ্ঠা হয় । এই শাখা একটি পত্রিকা পরিচা-লনা এবং সংগৃহীত দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থাবলী প্রকাশে উদ্যোগী হন । কিন্তু শাখার পক্ষে একাজ পরিচালনা করা দুঃসাধ্য হওয়ায় একটি সাব কমিটি গঠিত হয় । প্রভাতকুমার এই নব গঠিত কমিটির একজন সভ্য ছিলেন । ১৩১৩ বঙ্গাব্দে পত্রিকাটি প্রকাশিত হয় । পত্রিকার প্রথম ভাগ ১ম সংখ্যার ভূমিকায় বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের রঙ্গপুরস্থ শাখার তৎকালীন সম্পাদক শ্রীসুরেন্দ্র চন্দ্র রায় চৌধুরী লিখেছেন —

' এই পত্রিকা প্রকাশ মূল সভার সম্পূর্ণ অনুমোদিত এবং উহার পত্রিকা সম্পাদক শ্রীযুক্ত-নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় তাঁহার নিজের যন্ত্রালয়ে স্বল্পব্যয়ে ইহার মুদ্রণাদি সুন্দররূপে সম্পন্ন করিতে সম্মত হইয়াছেন । প্রাগুক্ত মহাত্মারা এবং উত্তর বঙ্গস্থিত কয়েকটি খ্যাতনামা লেখকের উৎসাহ প্রণোদিত হইয়াই আমরা রঙ্গপুর - শাখা - পরিষদের মুখপত্রখানির জীবন প্রতিষ্ঠা করিতে অগ্রসর হইলাম ।.... . .....
.....

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ - রঙ্গপুর - শাখা - পত্রিকা পরিচালন ও অন্যান্য গ্রন্থাদি প্রকাশার্থ নিম্ন লিখিত ব্যক্তি-গণকে লইয়া শাখা - সভা ও একটি গ্রন্থ - পত্রিকা - প্রকাশ সমিতি গঠিত করিয়াছেন । যথা — শ্রীযুক্ত প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় বার - আট - ল , শ্রীযুক্ত ভবানী প্রসন্ন লাহিড়ী কাব্যতীর্থ , শ্রীযুক্ত সুরেশ চন্দ্র রায়চৌধুরী , শ্রীযুক্ত পঞ্চানন সরকার এম.এ.বি.এল , এবং শ্রীযুক্ত হরগোপাল দাসকুন্ডু । ইঁহাদিগের মধ্যে শ্রীযুক্ত পঞ্চানন সরকার এম.এ.বি.এল মহোদয়কে উহার সম্পাদক এবং শ্রীযুক্ত দাসকুন্ডু মহাশয়কে তাঁহার সহকারীরূপে নির্বাচিত করা হইয়াছে । .....'১০৩

তৎকালীন বাংলাদেশে সাহিত্য চর্চার পীঠস্থান কলিকাতা থেকে দূরে অবস্থিত রঙ্গপুরে এই সাহিত্য পরিষৎ শাখা উত্তর বঙ্গের সর্বসাধারণের বিশেষত ছাত্রদের মধ্যে সাহিত্যরস পিপাসাকে জাগিয়ে তোলার জন্য এক উল্লেখযোগ্য প্রচেষ্টা চালিয়ে গেছে । এই উদ্দেশ্যে মাঝে মাঝে রচনা প্রতিযো-গিতার ব্যবস্থা করেছেন । xxxx ১৩১২ বঙ্গাব্দে এই ধরণের এক রচনা প্রতিযোগিতার পরীক্ষক নির্বাচিত হয়েছিলেন প্রভাতকুমার । উক্ত শাখা সভার

কার্য্যবিবরণী থেকে জানা যায় —

'..... কুণ্ডী হইতে স্বীকৃত তিনটি পদকের মধ্যে শ্রীযুক্ত মনীন্দ্র চন্দ্র রায় চৌধুরী মহাশয়ের স্বীকৃত' মধুসূদন পদকটি দাতার ইচ্ছানুসারে রঙ্গপুরের ছাত্রমন্ডলীর মধ্যে যে , ' জাতীয় ইতিহাসের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ লিখিবে , তাহাকেই প্রদত্ত হইবে স্থির হইয়া প্রবন্ধ পরীক্ষার ভার বঙ্গের খ্যাতনামা লেখক , ব্যারিষ্টার শ্রীযুক্ত প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের উপর অর্পিত হয় । পরীক্ষার ফলে শ্রীমান মোহিনী মোহন ভট্টাচার্য্য যে পদকটি প্রাপ্ত হইয়াছেন , তাহা বার্ষিক অধিবেশনের বিবরণেই উল্লিখিত হইয়াছে ।..... .....

.....

..... কার্য্য নির্বাহক সমিতির সদস্যগণ ব্যতীত এই সভার অন্যতম সভ্য বাঙ্গালা ভাষার খ্যাতনামা লেখক ও ব্যারিষ্টার শ্রীযুক্ত প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় মহাশয় ~~xx~~ শাখা সভার প্রথম অধিবেশনে যোগদান এবং অধিকাংশ সভায় সভাপতির কার্য্য ~~xxx~~ সম্পন্ন করিয়া , উহার যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছেন । এজন্য তিনিও শাখা পরিষদের বিশেষ কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন । ...[১০৪]

সভার কার্য্যবিবরণী থেকে অনুমান করা যায় লেখক হিসাবে প্রভাতকুমার তখন বহুজনবন্দিত হয়ে উঠেছেন এবং তাঁর সাহিত্যিক প্রতিভায় অনেকের শ্রদ্ধা জন্মেছে । পরবর্তী জীবনে যে মানুষটি সভা সমিতি থেকে দূরে নিভৃতে সাহিত্য সাধনা করে গিয়েছেন — আত্মগোপনপ্রয়াসী এই মানুষটির কিছুটা ব্যতিক্রম এ সময়ে লক্ষণীয় । এই শাখা - সভার অন্যতম সভ্য প্রভাতকুমার উক্ত পরিষদের পরবর্ত্তী বহু অধিবেশনে সভাপতির এবং সহ সভাপতির পদ অলংকৃত করেছেন ।

এই পত্রিকার' ১৩১৩ বঙ্গাব্দের সদস্য ও কর্মচারীগণ ' স্তম্ভে ক্রমিক নং ৩ য়ে' শ্রীযুক্ত প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় বার - আট - ল সহঃ সভাপতি' বলে উল্লেখিত হয়েছে ।

এই সংস্থার প্রতি তাঁর আন্তরিক যোগ থাকলেও মাঝে মাঝে কর্ম্মোপলক্ষে তাঁকে বাইরে যেতে হয়েছে এবং কয়েকটি অধিবেশনে যে তিনি উপস্থিত হতে পারেননি তার উল্লেখ পাওয়া যায় । উক্ত সভার স্থগিত তৃতীয় অধিবেশনের (স্থান রঙ্গপুর ~~xxx~~ টাউন হল, ৩১শে ভাদ্র , রবিবার ১ লা সেপ্টম্বর , ১৯০৬ , অপরাহ্ণ ৫॥ ঘটিকা) রিপোর্টে দেখা যায় —

'... এই সভা কর্তৃক গঠিত 'পুরস্কার সমিতির' মন্তব্য এই অধিবেশনে উপস্থিত করার কথা ছিল, কিন্তু ঐ সমিতির সভ্য শ্রীযুক্ত প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের অনুপস্থিতিতে কোন অধিবেশন এ পর্য্যন্ত হইতে পারে নাই। যদি সমিতির পুনরাহূত অধিবেশনেও মুখোপাধ্যায় মহাশয় অনুপস্থিত থাকেন তবে অবশিষ্ট সভ্যেরা মন্তব্য স্থির করিয়া সাধারণ সভায় উপস্থিত করিবেন ইহা নির্দ্ধারিত হয়।.....'

উপরের এই বিবরণী থেকে বোঝা যায় 'পুরস্কার সমিতি'তে প্রভাতকুমারের স্থান কতটা গুরুত্বপূর্ণ ছিল। তাঁর অনুপস্থিতিতে অধিবেশন পর্য্যন্ত অনুষ্ঠিত হয়নি।

উক্ত পরিষদের চতুর্থ মাসিক অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়েছিল ২৫ শে কার্ত্তিক, রবিবার (১১ই নভেম্বর ১৯০৬) রঙ্গপুর টাউন হলে। এই সভায় প্রভাতকুমার সভাপতিত্ব করেন। এই অধিবেশনের কার্য্যবিবরণী থেকে জানা যায়—

'.... সভাপতি মহাশয়ের অনুপস্থিতিতে সহকারী সভাপতি শ্রীযুক্ত প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় ৺ সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন।.....'

সভাপতিত্ব করা বা পরীক্ষক হিসাবে নিজের যোগ্যতার পরিচয়ই শুধু দেন নাই, এই সাহিত্য সংস্থার সর্বাঙ্গীন উন্নতির জন্য তিনি সচেষ্ট ছিলেন। পুরাতন এবং নূতন পুস্তক সংগ্রহ করে সংস্থার গ্রন্থাগারটিকে পুষ্ট করা ছিল সংস্থার অন্যতম উদ্দেশ্য। সেই উদ্দেশ্যে সকলের কাছ থেকে অকুণ্ঠিতভাবে সংস্থাটি দান গ্রহণ করে চলেছিল। প্রভাতকুমারও তাঁর 'ষোড়শী' (আশ্বিন, ১৩১৩) গল্পগ্রন্থের একখানি কপি এই গ্রন্থাগারে দান করেছিলেন। ১৭ই ফেব্রুয়ারী ১৯০৭ (৫ই ফাল্গুন, রবিবার, সময় ৫॥.টা) সালে রঙ্গপুর টাউন হলে অনুষ্ঠিত এই সভার সপ্তম মাসিক অধিবেশনের কার্য্য বিবরণীতে উল্লেখিত হয়েছে —

"..... ৩। নিম্ন লিখিত গ্রন্থ কয়েকখানি সভায় উপহৃত হইয়াছিল। উপহারদাতাগণকে সভার পক্ষ হইতে ধন্যবাদ প্রদানের প্রস্তাব সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হইল।

উপহৃত পুস্তকের নাম	উপহার দাতার নাম
১। ষোড়শী	শ্রীযুক্ত প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়
২। জঙ্গনামা (বটতলার ছাপা)	,, সুরেন্দ্র চন্দ্র রায়চৌধুরী
৩। ছহি হিতজ্ঞান (ঐ)	,, ঐ ,, ,,

প্রভাতকুমার সমসাময়িক সাহিত্য সম্বন্ধে যথেষ্ট ওয়াকিবহাল ছিলেন এবং এসময়ে প্রচুর অধ্যয়নে নিজের জ্ঞানভান্ডারকে পরিপূর্ণ করে চলেছিলেন। আদর্শ সমালোচকের যুক্তিবাদী মন যে তাঁর ছিল উক্ত সভার সামান্য একটি ঘটনা থেকে সেটুকু অনুমান করে নেওয়া যায় । এই সভার মাসিক অধিবেশনে মাঝে মাঝে নূতন রচনা প্রবন্ধ ইত্যাদি পাঠের ব্যবস্থা ছিল । সপ্তম মাসিক অধিবেশনে (১৭ই ফেব্রুয়ারী , ১৯০৭) শ্রীযুক্ত কালিকান্ত বিশ্বাস মহাশয় তাঁর রচিত' বঙ্গের শেষ সেনরাজগণ' শীর্ষক প্রবন্ধটি সভায় পাঠ করেন । সভাতে প্রভাতকুমার উপস্থিত ছিলেন এবং গভীর অভিনিবেশে বেশ সহকারে তিনি প্রবন্ধটির আদ্যোপান্ত শোনেন । পাঠ শেষ হলে প্রবন্ধটির একজায়গায় যে ভ্রমাত্মক মত ব্যক্ত হয়েছিল প্রভাতকুমার সেখানটিতে প্রবন্ধকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন । এই সম্পর্কে কার্য্য বিবরণীতে উল্লেখিত হয়েছে —

'..... তৎপর শ্রীযুক্ত প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় মহাশয় বলিলেন যে সমালোচক মহাশয় বঙ্কিমচন্দ্রের ভ্রম দেখাইতে গিয়া প্রসঙ্গক্রমে বলিলেন যে কোন বীর হইলে তাহার চরিত্র হীন হইতে পারে না , ইহা ঠিক নহে । বীরবর নেলসন্ বীরত্বের দৃষ্টান্তস্থল হইয়াও পরস্ত্রী হরণ- রূপ কলঙ্কে কলঙ্কিত হইয়াছিলেন । সুতরাং তকী খাঁ বীর বলিয়া যে হীন চরিত্রের হইবেন না ইহার কোন অর্থ নাই ।'

৭ই এপ্রিল (২৪শে চৈত্র,১৩১৩ বঙ্গাব্দ) রঙ্গপুর টাউন হলে অনুষ্ঠিত উক্ত পরিষদের নবম মাসিক অধিবেশন এবং ১৯শে মে ১৯০৭ (৫ই জ্যৈষ্ঠ , ১৩১৪) রঙ্গপুর টাউন হলে অনুষ্ঠিত দশম মাসিক অধিবেশনে প্রভাতকুমার সভাপতির পদ অলংকৃত করেছিলেন ।

অতঃপর প্রকাশ্যে সভা সমিতি ইংরেজ সরকার গভর্ণমেণ্ট দ্বারা নিষিদ্ধ হওয়ায় টাউন হলে এই সভা আর অনুষ্ঠিত হতে পারেনি । তবুও লোকচক্ষুর কিছুটা অন্তরালে বাংলা সাহিত্য সেবা পরায়ণ এই সংস্থাটি তাদের সভার কাজ চালিয়ে যেতে থাকেন । তাই দেখা যায় ৯ই ফেব্রুয়ারী,১৯০৮ সাল (২৬শে মাঘ , রবিবার) অপরাহ্ণ ৪টায় তৃতীয় বার্ষিক সহিত পঞ্চম মাসিক অধিবেশন পত্রিকার কার্য্যালয়ে অনুষ্ঠিত হয় । এই অধিবেশনে সভাপতির আসনে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন প্রভাতকুমার ।

এর পর প্রভাতকুমারের রংপুর অবস্থান খুব বেশীদিন স্থায়ী হয়নি । ইতিপূর্বে প্রভাতকুমার ইংরেজ সরকারের নেক নজরে পড়েছিলেন । অবশ্য স্বদেশী যুগে অনেক বুদ্ধিজীবী বাঙ্গালীকেই এই অত্যাচারের সামিল হতে হয়েছিল, প্রভাতকুমারও অব্যাহতি পাননি । তাঁর জন্য স্পেশাল কনেষ্টবল

ইংরেজ সরকার নিযুক্ত করেছিলেন । এই প্রসঙ্গে শ্রদ্ধেয় কৃষ্ণবিহারী গুপ্তের 'প্রভাত - কথা'র অংশবিশেষ উধৃত করছি —

'..... এই প্রসঙ্গে মনে পড়িতেছে যে ১৯০৫ সালের স্বদেশী আন্দোলনের বন্যায় বাংলা দেশ যখন কাঁপিতে আরম্ভ করিয়াছিল তখন প্রভাত-বাবু রংপুরে প্রাকটিস করিতেছিলেন । সেই সময়ে একদিন খবরের কাগজে পড়া গেল যে রংপুরে কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তিকে স্পেশাল কনেস্টবল নিযুক্ত করা হইয়াছে । তন্মধ্যে প্রভাতবাবুর নাম দেখিয়া বেশ একটু আমোদ উপভোগ করিয়াছিলাম ।' [১০৫]

প্রসঙ্গত: উল্লেখ করা যায় যে সে সময়ে রংপুরে তিনি যে একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি বলে পরিগণিত হয়েছিলেন তার প্রমাণ তিনি বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ রঙ্গপুর শাখার সভ্য তালিকায় প্রথম শ্রেণীর সভ্য বলে উল্লেখিত হয়েছেন ।[১০৬]

সম্ভবত: প্র্যাকটিসের সুবিধা না হওয়ায় জন্যই তাঁর মনে রংপুর পরিত্যাগের পরিকল্পনা আসে । বাল্যকাল এবং প্রথম যৌবন তিনি বিহার প্রবাসে কাটিয়েছিলেন । এবং তাঁর কিছু কিছু আত্মীয় স্বজন বিহারে বিভিন্ন স্থানে স্থায়ীভাবে বসবাস করছিলেন । এমন একজন আত্মীয়ের মধ্যে ডা: মেঘনাথ মুখার্জী তখন গয়াতে ছিলেন , সেখানে তাঁর পসারও ছিল ভাল । ডা: মুখার্জীর সঙ্গে প্রভাতকুমারের হৃদ্যতা ছিল এবং তাঁর উপদেশ এবং উদ্যোগে তিনি ১৯০৮ সালে শেষের দিকে রংপুর ত্যাগ করে গয়াতে প্রাকটিস শুরু করেন ।[১০৭] প্রভাতকুমারের রংপুর ত্যাগের বিবরণের উল্লেখ পাই রংপুর সাহিত্য পরিষদের তৃতীয় বর্ষ , অষ্টম মাসিক অধিবেশনের কার্য্যবিবরণীতে । অধিবেশন বসেছিল — রঙ্গপুর টাউন হলগৃহে , রবিবার ৩২ জ্যৈষ্ঠ, ১৩১৫ বঙ্গাব্দ , ১৪ই জুন ১৯০৮ অপরাহ্ন বেলা ৫॥ . টায় । সভায় উপস্থিত ব্যক্তিগণের তালিকায় শ্রীযুক্ত প্রভাত-কুমার মুখোপাধ্যায় বার - এট - ল , সভাপতি বলে উল্লেখিত হয়েছে ।কার্য্য-বিবরণীর অন্যত্র রয়েছে —

' .... ৫। ... শ্রীযুক্ত প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় সভাপতি মহাশয় বলিলেন যে বিশেষ কোন কার্য্যোপলক্ষে তাঁহাকে সত্বরই রঙ্গপুর ত্যাগ করিয়া গয়ায় গমন করিতে হইবে । এজন্য তাঁহাকে যে বার্ষিক অধিবেশনাদিতে প্রতিনিধি-গণকে অভ্যর্থনা করার নিমিত্ত গঠিত অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি নির্বাচিত করা হইয়াছে সে ভার তিনি গ্রহণ করিতে পারিতেছেন না । অন্য কোন উপযুক্ত

ব্যক্তিকে ঐ সমিতির সভাপতি নির্বাচন করা হউক ।

শ্রীযুক্ত সম্পাদক মহাশয়ের প্রস্তাবে এবং শ্রীযুক্ত পঞ্চানন সরকার এম.এ.বি.এল মহাশয়ের সমর্থনে ও সর্বসম্মতিক্রমে শ্রীযুক্ত ভবানীপ্রসন্ন লাহিড়ী, কাব্যতীর্থ, জমিদার মহাশয়কে অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি নির্বাচিত করা হইল এবং তিনি ঐ ভার গ্রহণ করিলেন ।' [১]

গুণীজনের যথোচিত সম্মান প্রদর্শনে তিনি যে সদা আগ্রহী ছিলেন এই সভার বিবরণীতে সেই ধরণের একটি ঘটনার উল্লেখ রয়েছে । এই সাহিত্য পরিষদ শাখার তদানীন্তন সম্পাদক শ্রীযুক্ত সুরেশ চন্দ্র রায়চৌধুরী মহাশয় ঐ বৎসর রয়েল আসিয়াটিক সোসাইটির বাঙ্গালা শাখার সভ্যরূপে নির্বাচিত হওয়ায় প্রভাত-কুমার তাঁকে অভিনন্দিত করার প্রস্তাব করেন । সভায় প্রভাতকুমারের সেই প্রস্তাব অনুমোদিত হয়েছিল ।

(৬)

ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধের সমাজ সংস্কারক আন্দোলন পরবর্তী অধ্যায়ে জাতীয় চিত্তবৃত্তি সংস্কারের অভিমুখী হয় । এরই ফলে বাংলার জনমানস ও সাহিত্যে জাতীয়তাবোধের উন্মেষ দেখা যায় । এই সময় থেকে শিক্ষিত বাঙালীর চিন্তাধারা নব নব পথের যে সন্ধান পেয়েছিল তন্মধ্যে অন্যতম প্রধান স্বজাত্যবোধ। মধ্যবিত্ত বাঙালীর আর্থিক অবস্থা কিছুটা দৃঢ় ভিত্তিতে স্থাপিত হওয়ায় এবং বহির্বাংলায় জীবিকার্জনে প্রতিষ্ঠালাভ করাতে তাদের সামাজিক ভিত্তি কিছুটা সুপ্রতিষ্ঠিত হয় এবং আত্মসম্মান-বোধ তীব্র হয়ে ওঠে । উপযুক্ত শিক্ষা এবং যোগ্যতা সত্ত্বেও শিক্ষিত চাকুরী পরায়ন বাঙালী ইংরাজ রাজ পুরুষের কাছে যথোচিত সম্মান পায় নাই তাঁদের এই ক্ষোভ ধূমায়িত বহ্নির প্রথম প্রকাশ ঘটে' ন্যাশনাল' আন্দোলনের মাধ্যমে । নবগোপাল মিত্র কর্তৃক হিন্দু বা জাতীয় মেলার প্রতিষ্ঠা তদানীন্তন জাতীয় ভাবাদর্শকে প্রকাশের সুযোগ দেয় । 'হিন্দুমেলা'র উদ্দেশ্যছিল সবরকম পরবশতা অস্বীকার করে স্বাবলম্বন নামক গুণটির উন্মেষ, আত্মশক্তি ও ঐক্যবোধের বৃদ্ধিসাধন , জাতীয় সাহিত্য ও জাতীয় শিল্পালয় , সভা ইত্যাদির প্রতিষ্ঠা ও উন্নতি সম্পর্কে আলোচনা । বাঙালীর জীবনে এই জাতীয়তাবোধকে শাসক ইংরেজ স্বাভাবিক ভাবেই সুনজরে দেখেনি । রাজশক্তি ইংরেজ এই সময় থেকেই তাদের ভেদ-নীতি , পীড়ন নীতি এবং তোষণ নীতিকে আশ্রয় করে তাদের সাম্রাজ্যবাদ অক্ষুন্ন রাখতে তৎপর হয়ে ওঠে । ' প্রেস আইনের (১৮৭৮) সাহায্যে সংবাদ পত্রের স্বাধীনতা খর্ব, অস্ত্র আইনের'

(১৮৭৮) সাহায্যে সরকারের অনুমতি ছাড়া অস্ত্র ব্যবহার নিষিদ্ধ করে দেশবাসীকে নিরস্ত্র করে দেন লর্ড লিটন (১৮৭৬ – ১৮৮০)।ইংরেজের এই সাম্রাজ্যনীতির কুফল থেকে ভারতকে মুক্ত করার জন্য শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে রাজনৈতিক চেতনা ও জাতীয়তাবোধ ক্রমশ জাগ্রত হতে থাকে । অবশেষে ১৮৮৫ সালে বাঙালী ব্যারিস্টার উমেশ চন্দ্র ব্যানার্জীর সভাপতিত্বে' ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস' এর উদ্বোধন হয় এবং নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলনের মাধ্যমে রাজনৈতিক আশা আকাঙ্ক্ষার রূপদানে সচেষ্ট হয়ে ওঠেন । প্রসঙ্গত: স্মরণ করা যায় — 'ভারতের জাতীয় আন্দোলন শুরু হয়েছিল কিছুটা দ্বিধাগ্রস্ত ভাবে । কংগ্রেসের প্রথমযুগের নেতারা এসেছিলেন শিক্ষিত উচ্চ মধ্যবিত্ত পরিবার থেকে । খুবই স্বভাবিক যে , সমসাময়িক অবস্থা সম্বন্ধে তাঁরা মোটামুটি সন্তুষ্টই ছিলেন । তাঁদের কার্য্যছিল প্রধানত: প্রতিনিধিত্বমূলক সরকার। কিন্তু কংগ্রেসের জাতীয় দাবীর প্রতি সরকারের বিমাতৃসুলভ মনোভাব ঐ প্রতিষ্ঠানকে ক্রমশই সরকার বিরোধিতায় সক্রিয় করে তুলল ।' [১০৮] কংগ্রেসের নরম ও এবং চরম পন্থীদের মধ্যে রাজনৈতিক মতবাদে ভিন্নতা থাকলেও উভয় দলই ইংরেজ সরকারের প্রতি শ্রদ্ধা ক্রমেই হারিয়ে ফেলে এবং উনবিংশ শতাব্দীর শেষ দশকেই রাজনীতিতে সন্ত্রাস-বাদের সূচনা দেখা দেয় । এতৎসত্ত্বেও আন্দোলন গণ আন্দোলনের রূপ নিতে পারেনি । কারণ কিছু সীমিত সংখ্যক লোকের ব্যক্তিগত এষণাই এর মূল প্রেরণা । প্রকৃতপক্ষে এটা নিহিত ছিল স্বল্প সংখ্যক বিক্ষুব্ধ নিম্নমধ্যবিত্ত শ্রেণীতে , জনগণের সাথে যার সংযোগ ছিলনা ।' [১০৯] আবার এই রাজনৈতিক আন্দোলনে যুক্ত হয়েছিল সামাজিক ও ধর্মীয় রক্ষণশীলতা , মারাঠায় চরমপন্থী দলের অন্যতম নেতা বাল গঙ্গাধর টিলকের নেতৃত্বে গড়ে উঠলো' গোরক্ষা সমিতি', বোম্বাইতে'গণপতি উৎসবের' প্রবর্তনার অন্তরালে ছিল সাম্রাজ্যবাদ বিরোধিতার সঙ্গে সাম্প্রদায়িক ভেদচেতনা । ১৮৯৩ সালে বোম্বাইতে হিন্দু মুসলমান দাঙ্গা ঘটে যায় । টিলক 'কেশরী' ও 'মারাঠা' পত্রিকাতে ইংরেজদের বিরুদ্ধে বিষোদ্গার শুরু করেন এবং বাংলা দেশেও টিলকের অনুসরণে পত্র পত্রিকায় ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে বিপ্লবাত্মক ভাবনার কথা প্রকাশিত হতে থাকে ।

কূটনীতিপরায়ণ লর্ড কার্জন (১৮৯৯ – ১৯০৫) অনুভব করলেন ধর্মকে কেন্দ্র করে আন্দোলনকারীদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করা সহজ। প্রকৃতপক্ষে হিন্দু প্রকৃতপক্ষে মুসলমানদের সাম্প্রদায়িক মনোভাবকে উত্তেজিত করার জন্য ১৯০৩ সালের ৩রা ডিসেম্বর ইংরেজ সরকার ঘোষনা করলেন যে শাসনের সুবিধার্থে বাংলা দেশকে দ্বিধা বিভক্ত করা হবে । মুসলমান অধ্যুষিত উত্তর ও পূর্ব বঙ্গের নূতন রাজধানী হবে ঢাকা । ঢাকার নবাব এবং বহু মুসলমান নেতা এই প্রস্তাবে উৎসাহ বোধ করলেন । কিন্তু মুষ্টিমেয় মুসলমান এবং বাঙ্গালী হিন্দু নেতা যাঁরা বাংলার সংস্কৃতিকে অখন্ড মনে করতেন এই বঙ্গ ভঙ্গ প্রস্তাবকে

মেনে নিতে পারলেন না । ১৯০৩ সালের ডিসেম্বর মাসে মাদ্রাজের কংগ্রেস অধিবেশনে সভাপতি লালমোহন ঘোষ সরকারের বঙ্গভঙ্গ পরিকল্পনার প্রতিবাদ করেন । ১৯০৩ থেকে ১৯০৫ সালের মধ্যে বাংলাদেশের বহু সভাসমিতিতে এ ব্যাপারে প্রতিবাদ সোচ্চার হয়ে উঠলেও ১৯০৫ সালের ১৬ই অক্টোবর বঙ্গভঙ্গ হয়ে গেল । সমস্ত বাঙ্গালী সেদিন অনুভব করেছিল ইংরেজ সরকারের কাছে তাঁদের আবেদনের মূল্য কতটুকু । শুরু হলো 'বয়কট' বা বিলাতি দ্রব্য বর্জন আন্দোলন ।' অর্থাৎ যাহা ছিল রাজনৈতিক আন্দোলন মাত্র তাহা হইয়া উঠিল অর্থনৈতিক ও শিল্পীয় উন্নতির প্রচেষ্টা ।'[110] দেশময় শুরু হলো স্বদেশী আন্দোলন । পরে গান্ধীজির আহ্বানে অহিংস সত্যাগ্রহ এবং আইন অমান্য আন্দোলন । স্কুল কলেজের ছাত্র ছাত্রীরা দলে দলে আন্দোলনে যোগদান করন। সহরে গ্রামে বন্দরে বিলাতী দ্রব্য সামগ্রী বর্জনের জন্য সকলকে উৎসাহিত করা হতে লাগলো — শুরু হলো যত্রতত্র পিকেটিং । ব্রিটিশ শাসকের স্বরূপ প্রকাশের বিলম্ব হয়নি । ভারত সরকারের সদর দপ্তরে স্যার হার্বার্ট রিজালি এক সার্কুলারে স্কুল কলেজের অধ্যক্ষদের জানিয়ে দিলেন যে ছাত্রদের রাজনৈতিক সভা সমিতিতে যোগদান অপরাধ বলে বিবেচিত হবে। এই আদেশের প্রতিবাদে ১৯০৫ সালের নভেম্বর মাসে কলিকাতায় অ্যানটি সার্কুলার সোসাইটি স্থাপিত হলো । প্রতিষ্ঠানের সদস্যগণ সঙ্ঘবদ্ধভাবে স্বদেশীবস্ত্র বিক্রয়ের ব্যবস্থা করলেন ।

নূতন-সৃষ্ট পূর্ববঙ্গ এবং আসাম সরকারের শিক্ষা পরিচালক লায়ন্স সাহেব — সরকারের পদাঙ্ক অনুসরণ করে রাজনৈতিক সভাসমিতিতে ছাত্রদের যোগদান নিষিদ্ধ করে এক সার্কুলার জারি করেন। এই সার্কুলারের অজুহাতে রঙ্গপুরের গভর্ণমেন্ট স্কুলের কর্তৃপক্ষ সর্বপ্রথম সেখানে ছাত্রদের উপর অত্যাচার করেন । প্রতিক্রিয়া স্বরূপ ৯ই নভেম্বর ১৯০৫ সালে সেখানে 'জাতীয় বিদ্যালয়' প্রতিষ্ঠিত হয় , উদ্যোক্তা অধ্যাপক ব্রজসুন্দর রায় । নবলব্ধ এই স্বাদেশিকতাবোধকে তীব্রতর করার মানসে কলিকাতাতে নবতর উদ্দীপনায় শুরু হয় 'শিবাজী উৎসব' 'বীরপূজা' ইত্যাদি । অত্যল্প কালের মধ্যে এই আন্দোলন স্বাধীনতা আন্দোলনে পর্যবসিত হয় ।

বাংলার জীবনের সেই উত্তেজনাময় মুহূর্তে বহু স্বদেশী সঙ্গীত রচনা করে দেশকে উদ্দীপ্ত করে তোলেন রবীন্দ্রনাথ , রজনীকান্ত সেন , অতুলপ্রসাদ সেন, রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী আরও অনেকে ।

রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী 'বঙ্গলক্ষ্মীর ব্রতকথায়' লিখিলেন — 'মোটাবসন অঙ্গে নেবো, মোটা ভূষণ আভরণ করবো ,'। রজনীকান্ত সেন লিখিলেন — 'মায়ের দেওয়া মোটা কাপড় মাথায় তুলে নেরে ভাই ', রবীন্দ্রনাথ লিখিলেন ,'পরের ঘরে কিনবো না আর ভূষণ বলে গলায় ফাঁসি ।'[111] ছাত্রেরা রাজনৈতিক সভায়

যোগদান করে, পিকেটিং করে, রাস্তায় রাস্তায় দেশমাতৃকার গান গাহিয়া বেড়ায়। করুণস্বরে গাহে —

' একবার তোরা মা বলিয়া ডাক্
জগৎজনের প্রাণ জুড়াক —
হিমাদ্রি পাষাণ কেঁদে গলে যাক' ইত্যাদি ।

আবার 'বিধির বাঁধন কাটবে তুমি এমন শক্তিমান' প্রভৃতি গান উত্তেজিত ভাবে গাহিয়া জনতাকে শোনায়, ব্রিটিশ শাসক ও তাহাদের প্রতিনিধিদের যেন জানাইতে চাহে যে, তাহারা মৃত্যুঞ্জয়ী শহীদ হইতে প্রস্তুত — ব্রিটিশের নাগপাশ তাহারা ছিন্ন করিবে ।' ১১২

বাংলাদেশের এই অভূতপূর্ব উদ্দীপনা, স্বাদেশিকতা বোধ এবং প্রত্যক্ষ - সংগ্রামের সূচনাকে রবীন্দ্রনাথ সাদরে সমর্থন জানালেন । কংগ্রেসের প্রবীন নেতাদের মধ্যে যে দ্বিধা জড়িত মনোভাব তাকে তিনি সমর্থন করতে পারেননি । বরং আত্মশক্তিতে বিশ্বাসী হয়ে দেশবাসীকে ঐক্যবদ্ধ হতে বলেন —' পরের কাছে সুস্পষ্ট আঘাত পাইলে পরতন্ত্রতা শিথিল হইয়া নিজেদের মধ্যে ঐক্য সুদৃঢ় হয় । সংঘাত ব্যতীত কোন বড় জিনিস গড়িয়া উঠেনা, ইতিহাসে তাহার অনেক প্রমাণ আছে । ১১৩ কবিতায়, গানে, প্রবন্ধের মধ্য দিয়ে রবীন্দ্রনাথ তাঁর রাজনৈতিক মতবাদ প্রকাশ করতে আরম্ভ করলেন । এছাড়া দেশাত্মবোধকে জাগিয়ে তোলার জন্য বীরত্বপূর্ণ এই ঐতিহাসিক চরিত্র ও কাহিনী অবলম্বনে এই সময়ে বহু নাটকও রচিত হয়েছিল । জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৪৮ - ১৯২৫) রচনা করলেন —'পুরুষ বিক্রম' নাটক (১৮৭৪), 'সরোজিনী বা চিতোর আক্রমণ নাটক' (১৮৭৫)। গিরিশচন্দ্র ঘোষের (১৮৪৪ - ১৯১২)'সিরাজদ্দৌলা' (১৩১২), 'মীরকাসিম' (১৩১৩), ছত্রপতি (শিবাজী)' (১৩১৪) ইত্যাদি নাটকে দেশপ্রেমের কথা প্রচারিত হয়েছে । ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদের (১৮৬৩ — ১৯২৭)' বঙ্গের প্রতাপ - আদিত্য' (১৩১৩), 'পলাশীর প্রায়শ্চিত্ত'(১৩১৩) , 'নন্দকুমার' (১৩১৪) , 'বাঙলার মসনদ' (১৩১৭) এবং' আলমগীর' (১৩২৮) নাটকে দেশপ্রীতি ও বীরত্বগাথার পরিচয় আছে । দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের (১৮৬৩—১৯১৩) 'প্রতাপসিংহ' (১৩১২) ,'মেবার পতন' (১৩১৫) 'সাজাহান' (১৩১৭), 'চন্দ্রগুপ্ত' (১৩১৮) ,'সিংহল বিজয়' (১৩২২) ইত্যাদি নাটকগুলিতে বাংলাদেশের সমসাময়িককালের দেশপ্রেমের পরিচয় আছে ।

সমসাময়িককালের দেশের রাজনৈতিক আন্দোলনের ঘটনাগুলি প্রভাত-মানসেও ছায়াপাত ঘটিয়েছে । তবে অন্যান্য সাহিত্যিকগণের রচনা যেখানে আন্দোলনে প্রেরণাদানের উদ্দেশ্যেই মূলতঃ রচিত সেখানে প্রভাতকুমারের তির্যক দৃষ্টি এই আন্দোলনের কার্য কলাপের মধ্যে যে অসঙ্গতি লুকিয়েছিল তাকেই আবিষ্কার

করে তাঁর গল্প উপন্যাসের বিষয়বস্তু করেছেন।তিনি রাজনৈতিক আন্দোলন সম্পর্কে বিশেষ মতবাদ প্রচার করেন নি । সেজন্য তাঁর দৃষ্টিতে সহানুভূতির অভাব আছে ভাবলে ভুল করা হবে ।' উকিলের বুদ্ধি' (কার্তিক, ১৩১৪) গল্পে দেখা যায় ওকালতি ব্যবসায়ে পসার জমাতে না পেরে উকিল সুবোধ হালদার নিজের দৈন্য দশাকে ঢাকতে গিয়ে স্বদেশী হয়েছেন , —

' শীতের প্রভাত । আফিসে বসিয়া , চিনি অভাবে গুড় দিয়া সুবোধবাবু চা পান করিতেছিলেন । স্বদেশীর কল্যাণে এখন আর তাহাতে তাঁহার লজ্জা নাই । গর্বের সহিত লোককে বলিয়া থাকেন —' দোকানদার বেটাদের বিশ্বাস নেই মশায় , দেশী চিনি বলে যা দেয় তা যাভার চিনি । লোকে মনে করে হলদে চিনি হলে দেশী হয় , শাদা দানাদার চিনিই কেবল বিদেশী , কিন্তু তা মহা ভুল । যাভা মরিশাস প্রভৃতি দেশ থেকে রাশি রাশি হলদে চিনি আমদানি হচ্ছে । তার চেয়ে মশায় আমি গুড়ই নিরাপদ মনে করি ।' ১১৪

সে সময়ে চারিদিকে যে বিলাতীদ্রব্য বর্জনের হিড়িক পড়ে গিয়েছিল এবং সাধারণ লোকের মনে বিলাতী দ্রব্য বর্জন করেই সে স্বদেশী হওয়া এবং সেই সুবাদে নিজের অসচ্ছলতাকে গোপন করার প্রয়াস — হাসির আছিলায় চরিত্রটির মধ্যে সেটি ধরে রেখেছেন ।

আবার এই সুবোধ বাবু মক্কেলহীন নির্জন গৃহে বসে বসে ক্লান্ত হয়ে , সংসারের ব্যয় সংকুলান কিছুতেই করে উঠতে না পেরে চাকুরী খালির বিজ্ঞাপন অন্বেষণে ব্যস্ত হয়ে উঠেছেন-এমন সময় পূর্ববাংলার সর্বময় কর্তা ফুলার সাহেব তাদের দিনাজসাহী সহরে আসবেন বলে ঘোষিত হয়েছে । দেশ শাসনের ব্যাপারে ফুলার সাহেব স্বদেশীদের দ্বারা নিন্দিত তাই বাংলাদেশের কেউ তাকে অভিনন্দন জানাতে রাজী হয়নি । কিন্তু সুবোধ-বাবু স্থির করলেন দিনাজসাহীতে তিনি ফুলার সাহেবকে অভিনন্দন জানাবেন এবং তাকে খুশী করে একটি সরকারী চাকুরী বাগিয়ে নেবেন । এসম্বন্ধে বন্ধু জগৎবাবুর কাছে যে উক্তি তিনি করেছেন তার মধ্যে আন্দোলনে যোগ-দানকারী মধ্যবিত্তের মানসিকতা সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে ।

'...... জগৎ তুমি ছেলে মানুষের মত কথা বলছ । আমি যে চার বছর ধরে এখানে পড়ে পচে মরছি , স্ত্রীর গহনা বিক্রী করে বাসাখরচ চালাচ্ছি , দেশ নায়কেরা কোন দিন কি আমায় ডেকে জিজ্ঞাসা করেছেন —' ওহে তোমার ঘরে আজ চাল আছে ত ? — ছোটছেলেমেয়েদের জন্য আমি দুধ কিনতে পারিনে , শুধু কোলের মেয়েটির জন্য একসের করে দুধ নিই ,

অন্য ছেলেমেয়েদের আমার স্ত্রী সুজী সিদ্ধ করে চিনি দিয়ে খাওয়ায় তা তুমি খবর রাখ ? নিয়মিত মাহিনা পায় না বলে কোন ঝি-ই বেশীদিন টেকেনা, কুয়ো থেকে জল তুলে তুলে আর বাসন মেজে আমার স্ত্রীর হাত দুটি শক্ত হয়ে গেছে। আমি যদি একটা সুযোগ পেয়ে নিজের উন্নতি করে নিতে পারি, ত কেন নেব না ? সত্যি সত্যি যে এই নূতন আসাম গভর্ণমেণ্টের উপর আমার ভক্তি উছলে উঠছে তা ত নয়। গভর্ণমেণ্ট আমাদের সর্ব্বস্বটা নিয়ে যাচ্ছে — আমি গভর্ণমেণ্টকে ফাঁকি দিয়ে একটা সরকারী উকীলগিরি যদি নিতে পারি ত ক্ষতিটা কি ? কতকাল আর এ রকম করে পাওনাদারদের কাছে প্রতিদিন অপমানিত হব, ছেঁড়া জুতো ছেঁড়া কাপড় পরে বেড়াব ?' ১১৫

বস্তুত সুবোধ বাবুর এ উক্তি যেমন করুণ তেমনি বাস্তব। সেই স্বদেশী আন্দোলনের যুগে বহু মধ্যবিত্ত পরিবার যে ইংরেজদের সহায়তা করেছিল সে কাহিনী কারও অজানা নয়। তবে তাদের অসহায়তার পিছনে ছিল নিজ নিজ ভাগ্যান্বেষণ, কোন ন্যায় নীতির খাতিরে তারা ইংরেজদের সম্মান প্রদর্শন করেনি, তারা জানতো ইংরেজ তাদের ধীরে ধীরে সবই লুণ্ঠন করে নিচ্ছে। সুবোধবাবুও তাদের দলের একজন — ফুলার সাহেবকে অভিনন্দন জানিয়ে দেশের লোকের কাছে অপমানিত লাঞ্ছিত হয়েও শেষ পর্য্যন্ত ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের চাকুরী করায়ত্ত করেছেন।

প্রভাতকুমার যে স্বদেশী আন্দোলনকে সমর্থন কোথাও করতে পারেননি তা নয় - কিন্তু আন্দোলনের মধ্যে অযৌক্তিক উচ্ছ্বাসময়তাকে তিনি সমর্থন করতে পারেননি।' খালাস' (ভাদ্র, ১৩১৪) গল্পে ডেপুটি নগেন্দ্রবাবুর সাথে ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের কথোপকথনে সাহেবের উক্তি যেন প্রভাতকুমারের মনের কথাকে স্মরণ করিয়ে দেয়।

' যথার্থ স্বদেশী - অর্থাৎ দেশের শিল্পোন্নতির যথার্থ চেষ্টা — সে খুব ভাল। তাহার প্রতি আমাদের সকলেরই সহানুভূতি আছে। কিন্তু এই হল্লা, কাপড় পোড়ান, এসব কি ?' ১১৬

এই আন্দোলনের ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপকে প্রভাতকুমার সুনজরে দেখেননি বটে তবে ইংরেজ সরকারের তাবেদারিকেও তিনি সমর্থন করেননি। মানুষ হিসাবে সকলের ন্যায়ত যা প্রাপ্য, সে ইংরেজ বা ভারতীয় যে হউন না কেন তার পাওয়া উচিত — এই ছিল তার বক্তব্য। তাই আমরা দেখতে পাই খালাস গল্পের ডেপুটি নগেনবাবুর উপর যখন কয়েকজন স্বদেশী বালকের বিচারভার পড়েছে তখন তিনি বেশ চিন্তিত হয়ে পড়েছেন। কারন তিনি জানতেন ইংরেজের আদালতে স্বদেশী যুবকদের সুবিচার করা কি দুরূহ। শেষ পর্য্যন্ত বিচারে,

ইংরেজ সরকার কর্তৃক অন্যায়ভাবে ধৃত নির্দ্দোষ তিনটি ছেলেকে দোষী সাব্যস্ত করে যখন সশ্রম কারাদণ্ড এবং অর্থ জরিমানা করা হল —'সেদিন ডেপুটিবাবু ক্ষুন্নমনে গৃহে প্রত্যাবর্তন করিলেন। চোর যেন চুরি করিয়া ফিরিল। খুনী যেন খুন করিয়া আসিয়াছে। ডেপুটিবাবুর চক্ষু অবনত মুখ কালিমাময়।[১১৭] এই অন্যায় বিচারের রায় তাকেই লিখিতে হয়েছিল, সমাজে তিনি পতিত হয়েছেন এমন কি স্ত্রী চারুশীলাও তার কাছে আসতে আজ সঙ্কুচিত। এই অন্যায়ের জন্য তিনি মানসিক অশান্তিতে ভুগছেন —' ধূমপান করিতে করিতে তাঁহার মানসিক অশান্তি আরও বর্দ্ধিত হইয়া উঠিল। মনে হইল, যে দিন কর্মে প্রবেশ করিয়াছিলেন, সেদিন কি ছিলেন, আর আজ কি হইয়াছেন। আজ চারুশীলা তাঁহাকে কাছে আসিতে, কথা কহিতে বারণ করিয়াছে। আজ তিনি পতিত, কলঙ্কিত। পবিত্র বিচারাসনে বসিয়া জানিয়া শুনিয়া, আজ তিনি অবিচার করিয়া আসিয়াছেন। আজেই কি প্রথম? কিসের জন্য? কেবল দগ্ধোদরের জন্য। বহুবর্ষব্যাপী শিক্ষা সাধনার ফল, ধর্মবুদ্ধি বিবেক, কর্তব্যনিষ্ঠা, — শুধু দগ্ধোদরের জন্য ভাসাইয়া দিয়াছেন। ছি ছি! পূর্বকালে অর্দ্ধশিক্ষিত, অশিক্ষিত ডেপুটিরা ঘুষ লইত। তাঁহাদের মার্জনা ছিল। সুশিক্ষাভিমানী নগেন্দ্রবাবু গভর্ণমেন্টের নিকট হইতে পদবৃদ্ধি স্বরূপ ঘুষ লইয়া বিচারাসন কলঙ্কিত করিয়াছেন। তাঁহার কি মার্জনা আছে?'[১১৮]

শেষ পর্য্যন্ত এই মানসিক অশান্তি থেকে অব্যাহতি পাবার জন্য চাকুরী ছেড়েছেন।

স্বদেশী আন্দোলন সম্পর্কে প্রভাতকুমার তাঁর মতামত ব্যক্ত করেছেন 'সর্ববিষয়ে স্বদেশী' (প্রকাশকাল —'প্রবাসী' কার্তিক ১৩১৩) প্রবন্ধে।

প্রভাতকুমারের বক্তব্য এই যে দেশের উন্নতি করতে হলে দেশের ধনবৃদ্ধি এবং দেশীয় শিল্পকলার উন্নতি সাধন করতে হবে। সেজন্য প্রয়োজনবোধে বিদেশ থেকে শিক্ষা ও সহায়তা উভয়ই নেওয়া যেতে পারে। বিদেশ থেকে আগত বলেই যে সেটা বর্জনীয় প্রভাতকুমার তা স্বীকার করেন নাই। জাতীয় পোষাক ধুতি চাদর পরলেই স্বদেশী হওয়া যায় না নয় বরং ধুতি চাদর পরে কাজ কর্মের অসুবিধা, সেক্ষেত্রে হ্যাটকোট পরতে তাঁর কোন আপত্তি নাই। আহার বিহারেও গোঁড়ামী ত্যাগ করতে হবে, ছুৎমার্গও বর্জনীয়।

ভারতবর্ষে স্বদেশী আন্দোলনের শুরু থেকেই যে আহার বিহার পোষাক পরিচ্ছদ ইত্যাদি সর্ববিষয়ে স্বদেশী হওয়ার হিড়িক পড়ে গিয়েছিল এবং সে হুজুগের মধ্যে আন্দোলন যে অনেকাংশে আন্তরিক না হয়ে বাহ্যিক হয়ে পড়েছিল প্রভাতকুমার জাতীয় জীবনের সেই দুর্বল দিকটিতে অঙ্গুলি নির্দেশ করে

প্রকৃত স্বদেশী কি ভাবে হওয়া যায় তা বিশ্লেষণ করেছেন ।

রংপুরে থাকাকালীন প্রভাতকুমারের প্রথম উপন্যাস' রমাসুন্দরী' প্রকাশলাভ করে । প্রকাশকাল ১৩১৪ সাল । তাছাড়া 'ষোড়শী' গল্পগ্রন্থ (১৩১৩ সাল) এবং 'দেশীওবিলাতী' গল্পগ্রন্থের(গয়া , আশ্বিন ১৩১৬) অনেকগুলি গল্প ' প্রবাসী' মাসিক পত্রে প্রকাশলাভ করে । প্রসঙ্গত: উল্লেখযোগ্য তাঁর অন্যতম বিখ্যাত গল্পের অনেকগুলি এসময়ে প্রকাশিত হয়ে গেছে । যেমন – 'বন্যশিশু' ('ভারতী' জ্যৈষ্ঠ ১৩০৭) ,'কাশীবাসিনী'(ভারতী , বৈশাখ ১৩০৮),'অযোধ্যার উপহার'(ভারতী বৈশাখ ১৩১৩) ,'বলবান জামাতা' (প্রবাসী , বৈশাখ ১৩১৩) , 'খালাস' (প্রবাসী , ১৩১৪) 'ফুলের মূল্য'(প্রবাসী , ভাদ্র ১৩১২) , 'প্রবাসিনী' (প্রবাসী, আষাঢ় ১৩১৩) ইত্যাদি । গল্পগুলি প্রকাশের সাথে সাথে পাঠকসমাজে তিনি জনপ্রিয়তা লাভ করে-ছিলেন এবং সাহিত্যিক সমাজেও প্রতিষ্ঠা অর্জনে সক্ষম হয়েছিলেন ।

১৯০৮ সালের জুন মাসে তিনি রংপুর ত্যাগ করেন এবং তাঁহার কর্মস্থল হয় গয়া ।' [১১৯] গয়াতে তিনি কিছুদিন একা একা বাসা ভাড়া করে ছিলেন পরে মা এবং ছেলেদের নিয়ে আসেন । গয়াতে তাঁর প্রাকটিস অপেক্ষাকৃত জমে উঠেছিল এবং স্থায়ী বসবাসের জন্য এখানে জমি কিনেছিলেন । শোনা যায় এসময়ে গয়ার বৌদ্ধ মন্দির সংক্রান্ত কোন একটি মামলা তিনি অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে পরিচালনা করেছিলেন এবং সেজন্য তাঁকে তৎকালীন বর্মার রাজা থিবোর সাথে বোম্বের রত্নাগিরিতে দেখা সাক্ষাৎ করতে হয়েছিল । এই মামলায় জয়ের জন্য তিনি রাজা থিবোর অকুণ্ঠ প্রশংসা প্রশংসা অর্জন করেছিলেন । [১২০]

প্রভাতকুমার মূলত: ছিলেন সাহিত্যিক । আইন ব্যবসায়ের জটিলতা তাঁহাকে কোনদিনই আকৃষ্ট করতে পারেনিনি । আইনের সূক্ষ্ম ধারায় কোন কিছুকে প্রতিষ্ঠা করার জন্য যে পরিমান অধ্যবসায়, কুটিল বুদ্ধির প্রয়োজন প্রভাতকুমারের মানসিক সংগঠন তার অনুকূল ছিল না । তিনি ছিলেন জীবন সম্বন্ধে উদার মতাবলম্বী – জীবনের জটিলতম দিকটিকে তিনি সন্তর্পনে পরিহার করে চলতেন । উপরন্তু সাহিত্যরসে তিনি ছিলেন বিভোর । গয়ায় অবস্থানকালে প্রভাতকুমারের অবস্থা বর্ণনা করতে গিয়ে তাঁর অন্যতম বন্ধু শ্রীচারুচন্দ্র মিত্র , এম.এ, বি.এল মহাশয় প্রভাতকুমারের মৃত্যুর পর তাঁর স্মৃতিতর্পণ কালে ——' পরলোকে প্রভাতকুমার' নিবন্ধে লিখেছেন —' ব্যবসা - ক্ষেত্রে গয়ায় তাঁর প্রসার ও প্রতিপত্তি বেশ হইয়াছিল । ফৌজদারী মোকদ্দমায় বেশ দুপয়সা পাইতেন , কিন্তু সাহিত্য সাধনায় এমনই মসগুল হইয়া থাকিতেন যে অনেক সময় মক্কেলের কাজে মনোযোগ দিতে পারিতেন না । সে সময় কয়েকদিনের জন্য বন্ধুবর করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায় গয়াধামে গিয়াছিলেন , তাঁহার একখানি পত্র হইতে জানিতে পারি , সে সময়ে

তিনি প্রায় সারারাত্রি ধরিয়াই সংস্কৃত সাহিত্যের আলোচনায় ব্যস্ত থাকিতেন। রস শাস্ত্রের আলোচনার জন্য বোম্বাই সহর হইতে বহু পুস্তক ও পুঁথি আনয়ন করিয়া পাঠ করিতেন, এই সময়ে উদ্ভট শ্লোকের যে সংগ্রহ তাঁহার নিকট ছিল তাহা দেখিয়া কবি করুণানিধান তো বিস্ময় বিমুগ্ধ হইয়া পড়েন ও তাঁহার নিকট হইতে বহু শ্লোক শুনিয়া অনুবাদ করিতে বসিয়া যান; কিন্তু এই সময় তাঁহার জননীর তীর্থ দর্শন করিবার উদগ্র বাসনা হওয়ায় করুণানিধানই তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া বাহির হইয়া পড়িতে বাধ্য হন; কাজেই এই অনুবাদ কার্য্য অধিকদূর অগ্রসর হয় নাই।' [১২১]

এখানকার বিবরণ থেকে বোঝা যায় আইনব্যবসায় সাধনা থেকে সাহিত্যসাধনা প্রভাতকুমারের কত প্রিয় ছিল। অর্থের প্রতি অতিরিক্ত লোভ তাঁর কোনদিনই ছিল না তাই মক্কেলদের দূরে সরিয়ে রাখতে তিনি কোন দ্বিধা বোধ করতেন না-যদি কোথাও সাহিত্য রসের সন্ধান পেতেন। তিনি যে সংস্কৃত সাহিত্যে পাণ্ডিত্য অর্জন করেছিলেন সে সম্বন্ধে শ্রদ্ধেয় মন্মথনাথ ঘোষ 'প্রভাতস্মৃতি' নিবন্ধে উল্লেখ করেছেন — 'প্রভাতকুমারকে প্রায়ই আমি সংস্কৃত গ্রন্থ পাঠ করতে দেখিতাম। আমার ধারণা ছিল তিনি বোধ হয় 'এ' কোর্সের ছাত্র, বি. এ. তে সংস্কৃত লইয়াছিলেন। জিজ্ঞাসা করিয়া জানিয়াছিলাম, তিনি আমাদের মত বি. কোর্সের ছাত্র ছিলেন — গণিত বিজ্ঞানই পড়িয়াছিলেন। সংস্কৃত চর্চা তাঁহার সখের পড়া। প্রভাতকুমারের সংস্কৃত গ্রন্থের সংগ্রহ মন্দ ছিল না। কবিবর রঙ্গলালের জীবনচরিত রচনাকালে আমি তাঁহার লিখিত একখানি অলঙ্কার গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি প্রাপ্ত হই। ইহা কোন সংস্কৃত গ্রন্থের অনুসরণে লিখিত কিনা দেখিবার জন্য হঠাৎ কয়েকখানি সংস্কৃত অলঙ্কার গ্রন্থ আবশ্যক হয়। প্রভাতকুমার তাঁহার নিজ পুস্তকাগার হইতে ৪/৫ খানি সংস্কৃত অলঙ্কার গ্রন্থ দিয়াছিলেন।' [১২২]

শুধুমাত্র সংস্কৃত গ্রন্থপাঠ নয় তিনি সযত্নে একটি ব্যক্তিগত গ্রন্থাগারও গড়ে তুলেছিলেন। বিজ্ঞানের ছাত্র হয়েও সংস্কৃত সাহিত্যের প্রতি আকর্ষন তাঁর এই সাহিত্য সম্পর্কে আন্তরিকভাকে প্রমান করে। অবশ্য সাহিত্যের আসরে প্রথম আবির্ভাবকালে রবীন্দ্রনাথকে এক চিঠিতে জানিয়েছিলেন তার ভাব ভাষার জ্ঞানভান্ডারকে পূর্ণতর করার জন্য তিনি ইংরাজী ও সংস্কৃত সাহিত্য অধ্যয়নে মনোনিবেশ করবেন। সারাজীবনব্যাপী তিনি তাঁর এ সাধনা থেকে বিচ্যুত হননি।

প্রভাতকুমারের সংস্কৃত সাহিত্যে অধ্যয়নের গভীরতার উপলব্ধি করা যায় তাঁর বিভিন্ন উপন্যাস-গল্পের চরিত্রের মাধ্যমে পরিবেশিত সংস্কৃত শ্লোকের উদ্ধৃতি থেকে। 'নবীন সন্ন্যাসী' উপন্যাসের সপ্তচত্বারিংশ পরিচ্ছেদে ক্ষুৎপিপাসায় কাতর নবীন সন্ন্যাসী মোহিত অন্ন চিন্তায় বিভ্রান্ত হয়ে আহ্নিক সেরে জলপান

করে মৃগচর্ম্ম পেতে বসে বেদান্ত রামায়ণের দশম সর্গ পাঠ করতে শুরু করেছে —

' সন্ন্যাসমাশ্রয়তি যো হি বিনৈব কর্ম্ম
যোগং স চেহ লভতে খলু দুঃখমেব ।
যঃ কর্ম্মযোগমনুতিষ্ঠতি বা মুনিঃ সন্
স ব্রহ্ম বিন্দতি পরং ন চিরেণ মর্ত্ত্যঃ ।। '

আবার এই উপন্যাসে দ্বাদশ পরিচ্ছেদে বৈদ্যুতিক হিন্দুধর্মপ্রচারিণী সভার অন্যতম সভ্য তর্কবাচস্পতি মহাশয়ের মুখে শুনতে পাই বিষ্ণুপুরাণের এবং মার্কণ্ডেয়পুরাণের শ্লোক । যথা —

' তত্রাপি ভরতং শ্রেষ্ঠং জম্বুদ্বীপে মহামুনে ।
যতো হি কর্ম্মভূয়েষ্য ততোহন্যা ভোগভূময়ঃ ।। '

অন্যত্র —

' প্রাক্‌শিরাঃ শয়নে বিদ্যাং ধনমায়ুশ্চ দক্ষিণে ।
পশ্চিমে প্রবলাং চিন্তাং হানিং মৃত্যুং তথোত্তরে ।।
ইতি - মার্কণ্ডেয়পুরাণে ।'

জীবনের মূল্য' উপন্যাসে দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে শাস্ত্রব্যাখ্যা করতে গিয়ে ভট্টাচার্য্য মহাশয় শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ থেকে শুনিয়েছেন —

' দিব্যা স্ত্রী যং প্রবদতি মম স্বামী ভবান ভব ।
স্বপ্নে দৃষ্টা চ জাগর্ত্তি স চ রাজা ভবেদ্ ধ্রুবম্ ।। '

আবার ষষ্ঠ পরিচ্ছেদে সতীশের মুখে শুনি কুমারসম্ভবের শ্লোক —

' ইতি ব্রতেচ্ছামনুশাসতী সুতাং
শশাক মেনা ন নিয়ন্তুমুদ্যমাৎ ।
ক ঈপ্সিতার্থস্থিরনিশ্চয়ং মনঃ
পয়শ্চ নিম্নাভিমুখং প্রতীপয়েৎ ।। '

অন্যত্র সতীশের মুখে শুনি — উদ্ভট শ্লোক —

' পাণৌ গৃহীতাপি পুরস্কৃতাপি
স্নেহেন নিত্যং পরিবর্দ্ধিতাপি ।
পরোপকারায় ভবেদবশ্যং
বৃদ্ধস্য ভার্য্যা করদীপিকেব ।। '

আবার বৃদ্ধ কাকে বলে সেটা প্রমান করার জন্য সতীশকে স্মৃতির বচন আওড়াতে শুনি —

' আষোড়শাৎ ভবেদ্বালস্তরুণস্তত উচ্যতে ।
বৃদ্ধঃ স্যাৎ সপ্ততের্ধ্বং বর্ষীয়ান্ নবতেঃ পরম্ ।।

বিরহ অবস্থার বর্ণনায় সতীশ বলেছে ,

'বকুলমালিকয়াপি যয়া ন সা
তনুরভূষি তদন্তরভীরুণা ।
তদধুনা বিধিনা কৃতমারবয়ো
গিরিদরীনগরীশতমন্তরম্ ।।'

(পঞ্চম পরিচ্ছেদ - রেলপথে জীবনের মূল্য)

বর্ষার বর্ণনায় সতীশের আবৃত্তি ,

মহীমণ্ডলীমণ্ডপীভূত পয়ো
ধরারব্ধহর্ষসু বর্ষাসু সদ্যঃ ।
কদম্বে প্রসূনং প্রসূনে মরন্দো
মরন্দো মিলিন্দো মিলিন্দে মদোহভূৎ ।।'

বর্ষার বর্ণনায় সতীশ উদ্ভট আওড়েছে ,

'ঘনতরঘনবৃন্দাচ্ছাদিতে ব্যোম্নি লোকে
সবিতুরমহিমাংশোঃ সঘকথৈব ব্যরংসীৎ ।
রজনিদিবসভেদং মন্দভাগ্যাঃ শশংসুঃ
কুমুদকমলগন্ধানাহরন্তঃ ভ্রমেণ ।।'

বর্ষাকাল প্রেমিক প্রেমিকার বড় সুসময় । কি রকম কি সুসময় বোঝাতে গিয়ে সতীশ 'ভর্তৃহরির' শ্লোক বলেছে —

' অসারেণ ন হর্ম্যতঃ প্রিয়তমৈর্যাতুং বহিঃ শক্যতে
শীতাতংকনিমিত্তমায়তদৃশা গাঢ়ং সমালিঙ্গ্যতে ।
জালৈঃ শীকরশীতলৈশ্চ মরুতে রত্যন্তখেদচ্ছিদো
ধন্যানাং বত দুর্দিনং সুদিনতাং যাতি প্রিয়াসঙ্গমে ।।'

প্রভাতকুমারের বহু গল্প উপন্যাসে এধরণের বিচিত্র উদ্ভট এবং সংস্কৃত শ্লোক ছড়িয়ে আছে । অবশ্য বেশির ভাগ ক্ষেত্রে এ সমস্তের প্রয়োগ হাস্যরস সৃষ্টির জন্য ।

১৩ শ্রাবণ, ১৩২২ বঙ্গাব্দে সাপ্তাহিক মর্ম্মবাণীতে প্রকাশিত 'চন্দ্রের কলঙ্ক' রম্য রচনাটিতে চাঁদ সম্বন্ধে সংস্কৃত কবি কালিদাস, ভোজরাজ প্রভৃতি এবং কবি তুলসীদাস বিরচিত বহু শ্লোক এবং পদের উদ্ধৃতি দিয়েছেন। এধরণের উদাহরণ উদ্ধৃতি থেকে তাঁর সংস্কৃত গ্রন্থ পাঠের গভীরতাকে উপলব্ধি করা যায়।

পূর্বেই উল্লেখিত হয়েছে রংপুরে আইন ব্যবসায় বিশেষ সুবিধা না হওয়ায় প্রভাতকুমার তাঁর সুহৃদ এবং আত্মীয় ডঃ মেঘনাথ মুখার্জীর উপদেশ মতে ১৯০৭ সালের শেষদিকে গয়ায় চলে আসেন।

আইন ব্যবসায়কে প্রভাতকুমার কোনদিনই মনে প্রাণে গ্রহণ করতে পারেন নি। তাঁর কোন সাহিত্যিক বন্ধু গয়ায় গেলে কাছারী কামাই করতে তিনি দ্বিধাবোধ করতেন না। মন্মথনাথ ঘোষ 'প্রভাতস্মৃতিতে' [১২৩] প্রভাতকুমার সম্বন্ধে লিখেছেন —' বাঙ্গালী সাহিত্যিক কেহ গয়ায় গেলে তিনি সাদরে তাঁহাকে নিজগৃহে নিমন্ত্রণ করিতেন এবং অতিথি সৎকারের জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিতেন। বলিতেন, ' আঃ বাঁচা গেল। একদিন কাছারী কামাই করিবার একটা সুযোগ পাওয়া গেল। ' তাঁর গয়ার বাসগৃহে কবি করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়, বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি বহু সাহিত্যিকের মাঝে মাঝেই শুভাগমন ঘটেছে।

প্রভাতকুমার ছিলেন নিরভিমানী, সহজ সরল এবং অনাড়ম্বর জীবনযাত্রায় অভ্যস্ত। বর্ত্তমান যুগের প্রখ্যাত কথাসাহিত্যিক শ্রীবিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায় তাঁর 'সামগ্রিক দৃষ্টিতে প্রভাতকুমার' গ্রন্থে প্রভাতকুমারের গয়ায় থাকাকালীন জীবনযাত্রার একটি সুন্দর চিত্র লিপিবদ্ধ করেছেন।

প্রভাতকুমারের গয়ায় থাকাকালে তাঁর পুত্র প্রশান্তকুমারের সঙ্গে বিভূতিবাবুর এক বন্ধু গয়ায় রেলওয়ে কনট্রাকটার শ্রীমোহিনী মোহন ঘোষের বন্ধুত্ব হয় এবং এই সূত্রে প্রভাতকুমারের বাড়ী তাঁর যাতায়াত ছিল। তাঁকে পত্র লিখে প্রভাতকুমার সম্বন্ধে বিভূতিবাবু যে চিঠিখানি পেয়েছেন তার প্রাসঙ্গিক অংশটুকু এখানে যথাযথ উদ্ধৃত করেছেন। শ্রীমোহিনী মোহন ঘোষ মহাশয় গয়া থেকে ৩/১২/৬৫ তারিখে বিভূতিবাবুকে চিঠিখানি লিখেছেন। পত্রটির উদ্ধৃতাংশটি নিম্নরূপ —

' পরম প্রীতিভাজনেষু, —

প্রভাতবাবুর পিতা পুরাতন দানাপুর Rly. District এ কাজ করিতেন। সম্ভবতঃ এ জন্য রেলওয়ে বাবুদের প্রতি তাঁহার একটি সহজ সরল ও সহানুভূতিশীল ভালবাসা ছিল। এখানে প্রায় প্রতি সপ্তাহেই Rly. club এ আসিতেন ও সকলেরই সহিত মিশিতেন।

তাঁহার মা নিষ্ঠাবতী হিন্দু বিধবা ছিলেন । প্রভাতবাবু বাটীর বাহিরেই থাকিতেন । প্রত্যহ সকালে কাপড় ছাড়িয়া (টিলা পাজামা ও পাঞ্জাবি) মাকে প্রণাম করিতে বাড়ীর ভিতর যাইতেন । ভিতর বাড়ীর নিরামিষ রান্না তাঁহার জন্য বাহির বাড়ীতেই আসিত । এ ছাড়া মাছ মাংস রান্নার ব্যবস্থা বাহির বাড়ীতেই হইত ।

সে সময়কার বিলাত ফেরতদের মত তিনি ছিলেন না । স্থানীয় বাঙ্গালীদের বাড়ীর সামাজিক কাজে তিনি হিন্দু বাঙ্গালীরই মত যোগ দিতেন। এবিষয়ে ছোট বড়র বিচার বড় একটা ছিল না । আচারে ব্যবহারে, মেলা মেশায় তিনি সম্পূর্ণ বাঙ্গালীই ছিলেন ।

সামাজিক কাজে ধুতি - চাদর ব্যবহার করিতেন । বাড়িতে সাধারণত: টিলা পায়জামা পাঞ্জাবি ও পাজামাই সর্ব্বদা ব্যবহার করিতেন ।

তাঁহার গায়ের রং ময়লাই ছিল। বিশেষত্বের মধ্যে মাথার চুল খুব মিহি করিয়া কাটাইতেন — মুখে ফরাসী কায়দায়(Frech-cut) ছোট একটু দাড়ি ছিল । বন্ধুমহলে প্রাণ খুলিয়া হাসিতে ও হাসাইতে পারিতেন। অথচ বাহির হইতে দেখিলে , তাঁহাকে গম্ভীর প্রকৃতির মানুষ বলিয়াই মনে হইত । তাঁহার চরিত্র-গত কোনও স্খলন সম্বন্ধে কোনও কথা কখনও শুনা যায় নি ।

শীতকালে গয়া Dry cold ও হাঁপানী রুগির জন্য ভাল । এ জন্য ডা: নির্দেশে মহারাজ জগদিন্দ্রনাথ রায়(নাটোরাধিপতি) শীতকালে গয়ায় আসিয়া থাকিতেন ।

এসময়টিতে বেশ একটি সাহিত্যিক বৈঠক প্রায় প্রতি সন্ধ্যায় মহারাজার বাটীতে বসিত । সে সময় এখানে Postal Inspector বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়ও ছিলেন ।

এছাড়া বাহির হইতেও সাহিত্যিক সমাগম হইত ।

১৯১৬(সম্ভবত) শেষের দিকে রবি ঠাকুর তাঁহার পুত্র ও পুত্রবধূর সহিত গয়াতে বরাবর পাহাড় ও বুদ্ধগয়া দেখিতে আসেন । কবিকে' প্রভাত প্রভাত' বলিয়া প্রভাতবাবুকে আদর করিতে দেখিয়াছি ।

ব্যারিষ্টার হিসাবে তাঁহার বিশেষ Busy Practice ছিল না। এ সময়ে মহারাজা' মানসী 'পত্রিকার ভার লন ও নূতনরূপে' মানসী ও মর্ম্মবাণী' প্রকাশ আরম্ভ হয় । এই পত্রিকা উপলক্ষ করিয়া মহারাজার ইচ্ছায় ও অনুরোধে

(সম্ভবত) প্রভাতবাবু পত্রিকাটির সম্পাদনার ভার লইয়া Practice ছাড়িয়া কলিকাতায় চলিয়া যান ।

গয়ায় থাকাকালে ছোট গল্প কয়েকটি(ষোড়শীর) লেখেন । তবে উপন্যাসে তাঁর হাতে খড়ি এখানেই । তাঁর প্রথম উপন্যাস' নবীন সন্ন্যাসী' এখানেই লেখা । তিনি তাঁর Office table এই লেখার কাজও করিতেন। আমরা ((আমি ও তাঁর ছোটছেলে প্রশান্ত) লুকাইয়া তাঁহার Manuscript পড়িতাম ।

ইঁহার আদি বাটী নদীয়া জেলার ঘূর্ণী-গ্রামে । মনে হয় যা জানি সবই লিখিয়াছি ।' ১২৪

সম্পূর্ণ স্মৃতির উপর ভরসা করে লেখা এ চিঠিখানিতে তথ্যগত দিকথেকে কিছু কিছু ভুল - ভ্রান্তি রয়েছে । শ্রীমোহিনী মোহন বাবু 'ষোড়শী'র যে ছোট-গল্পগুলির উল্লেখ করেছেন সেগুলি ইতঃপূর্বেই প্রভাতকুমার লিখেছিলেন । কারণ ষোড়শী গল্পগ্রন্থের প্রকাশকাল আশ্বিন, ১৩১৩ এবং প্রভাতকুমার তখন রংপুরে ছিলেন ।'নবীন সন্ন্যাসী'কে প্রভাতকুমারের প্রথম উপন্যাস বলেছেন কিন্তু রংপুরে থাকাকালীন প্রভাতকুমারের প্রথম উপন্যাস'রমা সুন্দরী' ১৩১৪ সালে প্রকাশিত হয়েছে ।

যাহোক রেলওয়ে বাবুদের প্রতি প্রভাতকুমারের যে সহানুভূতিশীল মন থাকা স্বাভাবিক তা সহজেই অনুমান করা যায় কারণ তিনি নিজের কৈশোর ও প্রথম যৌবনকাল বাবার সঙ্গে দিলদারনগর, ঝাঝা , জামালপুর - ইত্যাদি জায়গায় রেলওয়ে কোয়ার্টার্সে কাটিয়েছেন । রেলওয়ে স্টেশনের কর্ম্মপদ্ধতি, রেলওয়েবাবুদের আচার ব্যবহারের বিশেষ ভঙ্গী, তাঁদের বিশেষ ধরণের মানসিকতা ইত্যাদির খুঁটি-নাটি বিবরণ তাঁর বহু গল্প উপন্যাসে পাওয়া যায় । এদের দোষ -ত্রুটি, ব্যবহারে সৌজন্যের অভাব ইত্যাদি থাকলেও প্রভাতকুমার খড়্গহস্ত হয়ে তাঁদের কোথাও বিচার করেন নি বরং তাদের প্রতি একটা সূক্ষ্ম সহানুভূতির সুর লক্ষনীয়।

'রত্নদীপ' উপন্যাসের রাখাল ভট্টাচার্য্য খুসরুপুর স্টেশনের ছোটবাবু। তার বেতন মাত্র পঁচিশ টাকা । তবে মাঝে মাঝে টাকাটা সিকিটা 'উপরি' যে না পাওয়া যায় এমন নহে । রাখাল' থাকার জন্য সরকারী বাসা পেয়েছে কিন্তু 'সেটি এতক্ষুদ্র যে বাসা বলিলেও হয় , খাঁচা বলিলেও চলে ।' রাখাল একা একা সেই বাসায় থাকে । একবার স্ত্রীকে আনার উদ্যোগ করে সাহেবের কাছে এক সপ্তাহের ছুটি চেয়েছিল কিন্তু ছুটি মঞ্জুর হয় নাই ।' রেলের চাকরিতে ছুটি আবশ্যক মত প্রায়ই পাওয়া যায় না । একবার এক ব্যক্তি পিতার মৃত্যুর পর ,

সাতে

বাড়ী গিয়া আদ্যশ্রাদ্ধ করিবে বলিয়া ছুটি চাহিয়াছিল, সাহেব হুকুম দিলেন, এখন ছাড়িতে পারি না, দুইমাস পরে শ্রাদ্ধ করিও। এরূপ অবস্থায় রেলের সকল চাকর যাহা করিয়া থাকে রাখালও তাহাই করিবে স্থির করিয়াছে। একদিন পূর্বে, ১৫ই মাঘ 'সিক রিপোর্ট' 'অর্থাৎ পীড়ার ভান করিয়া, সন্ধ্যার গাড়ীতে বাড়ী যাইবে।'[১২৫] এবং শেষ পর্য্যন্ত ছুটি না পাওয়ায়' সিক রিপোর্ট' করে বাড়ী যায়।

বলাবাহুল্য রাখালের টাকাটা সিকিটা 'উপরি' পাওয়া অথবা পীড়ার ভান করে মিথ্যা রিপোর্ট দেওয়ার মধ্যে জঘন্যতা রয়েছে। কিন্তু প্রভাতকুমারের লেখনী এখানে এই অন্যায়ের তীব্র প্রতিবাদ মুখর হয়ে উঠেনি বরং যেন একটু সহানুভূতিশীল — কারণ রেলের ছোটবাবু রাখাল যে সরকারী বাসা পেয়েছে তা খাঁচার সামিল মানুষের ব্যবহারের অযোগ্য। প্রয়োজন মত ছুটি সে পায়না তাই মিথ্যার ভান করে 'সিক রিপোর্ট' করে বাড়ী যায়। অমানুষিক আয়োজনে এদের ব্যবহারে যে কিছুটা অমানবিকতা অনুপ্রবেশ করে — প্রভাতকুমার দরদী মন দিয়ে তা অনুভব করেছেন। স্ত্রীর ভালবাসা থেকে বঞ্চিত কর্মচ্যুতির নোটীশ পাওয়া রাখাল এক দুর্বল মুহূর্তে মৃত সন্ন্যাসীর কাছ থেকে সব চুরি করেছে এবং চেহারার সাদৃশ্যের সুযোগ নিয়ে বিষয়ের লোভে ভবেন্দ্র সেজে বউরানীর কাছে গিয়েছে। বউরানীর সান্নিধ্য এবং ব্যক্তিত্ব রাখালকে ভালবাসতে শিখিয়েছে কিন্তু বউরাণীকে ভালবাসলেও সে তার সর্বস্ব অপহরণ করে নরাধম হতে পারেনি। রাখালের কাজের মধ্যে হীনতা থাকলেও শেষ পর্য্যন্ত তার বিবেক জঘন্য কাজে লিপ্ত হতে বাধা দিয়েছে। বলা যায় প্রভাতকুমার রেলবাবু রাখালকে দিয়ে তেমন ঘোর পাপকর্ম করাতে পারেন নি যা সত্যকারের মানবতাবিরোধী।

'আম্রতত্ত্ব' (কার্ত্তিক, ১৩২৪) গল্পের এংলো - ইন্ডিয়ান গার্ড সাহেব ডি-সুজা কিছুটা লোভ এবং কিছুটা খুঁতের তাড়নায় ব্রেকভ্যানে রাখা অন্যের পাঠান আমের টুকরী ভেঙ্গে আম খান। খেতে খেতে এবং ষ্টেশনে মাঝে মাঝে দান করতে করতে আমের টুকরী যখন শেষাবস্থায়, উপায়ান্তর না দেখে গার্ড-সাহেব নিজেই কিছু পাথর টুকরীর মধ্যে ভর্তিকরে সেলাই করে দেন। পরদিন গার্ড সাহেবের মা খবর পান তার ছেলের ভাবী শ্বশুর এক টুকরী আম তাদের পাঠাচ্ছেন। আমের টুকরী বাড়ী এনে দেখেন তাতে পাথর ভরা। মা রেগে আগুন এবং খোজ নিয়ে দেখা গেল এগুলি তার ছেলেরই কীর্ত্তি। গল্পটিতে রেলওয়ে কর্মচারীদের অসাধুতার প্রতি কটাক্ষ থাকলেও কোথাও আক্রমনাত্মক বিরূপ মনোভাব প্রকাশিত হয়নি।

প্রভাতকুমার বিলাত ফেরত ব্যারিস্টার, বিলাতী আদব কায়দা আচার ব্যবহার সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল হলেও তৎকালীন বিলাত ফেরতদের মত ছিলেন না বরং তাঁর ঝোঁক ছিল বাঙালীয়ানার প্রতি। তাঁর এই মতের সমর্থন পাই শ্রদ্ধেয় মন্মথনাথ ঘোষের' প্রভাত স্মৃতি' চারণে-, ' আমি প্রথম প্রভাত-কুমারকে চাক্ষুষ দেখি ১৩২১ সালে, তাহার পূর্বে তাঁহার কোন ছবিও দেখিয়াছি কি না স্মরণ হয়না।' ১২৬ মন্মথবাবুর প্রতিবেশী সাহিত্যিক শ্রীহেমেন্দ্র প্রসাদ ঘোষের আবাসগৃহে তাঁদের প্রথম সাক্ষাৎ ঘটেছিল।
' ..... একদিন আমি হেমেন্দ্রবাবুর বাসায় গিয়াছি, সেদিন আর কেহ আসেন নাই। বোধ হয় সেদিন রবিবার ছিল না, — আমি অন্যদিনেও অবসর পাইলে ~~রবিবার~~ রবিবারের অপেক্ষা রাখিতাম না, প্রসাদ ভ্রাতৃদ্বয়ের সাহচর্য্য এতদূর প্রীতিকর ছিল। হঠাৎ দেখিলাম দুইজন ভদ্রব্যক্তি আমাদের গৃহে প্রবেশ করিলেন – তাঁহাদের পূর্বে কখনও দেখি নাই। হেমেন্দ্রবাবু পরিচয় করিয়া দিলেন — একজন' মানসী'র কর্মকর্তা শ্রীযুক্ত সুবোধ চন্দ্র দত্ত এবং আর একজন বিখ্যাত কথা সাহিত্যিক প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়। আমি নমস্কার করিলাম, প্রভাতবাবু প্রতি নমস্কার করিলেন। এই প্রভাতকুমার। যাঁহাকে আমি বাল্যকাল হইতে কল্পনা নয়নে দেখিয়া আসিয়াছি, তাঁহার সহিত ত কিছুই মিল নাই। ব্যারিস্টার প্রভাতকুমার, ~~বিলাতফেরতদের~~ বিলাতফেরতদের মত তো সেরূপ কোন চাল নাই, — সাদাসিধা বেশ, সাদা উড়নীখানি ব্রাহ্মণ পন্ডিতের মত খুলিয়া গায়ে জড়ান — এই কি তিনি? শান্ত ধীর গম্ভীর স্বল্পভাষী এই ব্যক্তিটি কি ঐ সকল হাস্যরসোজ্জ্বল গল্প লিখিয়াছেন?' ১২৭

মন্মথবাবুর দেওয়া প্রভাতকুমারের সে সময়কার যে বেশবাসের পরিচয় পাই তা সম্পূর্ণভাবেই বাঙ্গালীয়ানার পরিচয় বহন করে। তাছাড়া মানসিক দিক ~~দিয়ে~~ থেকেও বাঙ্গালীয়ানার প্রতি তাঁর যে একটা বিশেষ প্রবণতা ছিল বিভিন্ন গল্প-উপন্যাসে সে পরিচয় রেখে গেছেন।

প্রভাতকুমারের সমসাময়িককালে মধ্যবিত্ত বাঙ্গালী সমাজের ছেলেদের বিলাত পাঠিয়ে উচ্চশিক্ষায় শিক্ষিত করে আনার একটা বিশেষ প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। এই বিলাত ফেরত উচ্চশিক্ষিতদের মধ্যে বিলাতের সমাজের আচার আচরণের অনুকরণে নিজেদের জীবনযাত্রা নির্বাহ ~~করা~~ করার একটা বিশেষ প্রচেষ্টা ছিল। এই অনুকরণ-প্রবণতায় ~~হাস্যকর~~ বোধকরি প্রভাতকুমারের বিশেষ সমর্থন ছিল না। তাদের এই অনুকরণ প্রবৃত্তিকে কোথাও বা তিনি হাস্যকর মনে করেছেন আবার স্থান বিশেষে কটাক্ষ করতেও কসুর করেননি। 'লেডী ডাক্তার'

(আশ্বিন, ১৩২০) গল্পের নায়ক মহকুমার দ্বিতীয় হাকিম, সত্যেন্দ্রনাথ ঘোষ 'পুরাদস্তুর সাহেব না হইলেও অত্যন্ত সাহেবীভাবাপন্ন — অর্থাৎ সংক্ষেপে সে একজন ভাবাপন্ন সাহেব'। বাবু বলিলে সে রাগিয়া উঠে না, কিন্তু সাহেব অভিহিত হইলে খুসী হয়। বাড়ীতে ধুতি পরিতে বিশেষ আপত্তি নাই, কিন্তু পায়জামা সুটই সুরুচিসঙ্গত মনে xx করে। পাঁচক ব্রাহ্মন আছে, সে যথা-শাস্ত্র হিন্দুমতেই পাক করে, কিন্তু খানসামা খলিল মিঞা মুর্গী রাঁধিয়া আনে এবং টেবিলের উপর ছুরি কাঁটা চামচ দিয়া খানা সাজাইয়া দেয়।' সত্যেন্দ্রনাথ পাইপ সেবন করে এবং একাকী একটি xx বাংলোয় বাস করে। সত্যেন্দ্রনাথের জীবন যাত্রায় সাহেবীয়ানা সুস্পষ্ট। এই ধরণের জীবনযাত্রায় প্রভাতকুমার x মন্তব্য করেছেন —

' পাইপ মুখে করিলে, ইংরেজী কাপড়পরা বাঙ্গালীকে অনেকটা ঠিক সাহেবের মত না হউক — অন্ততঃ ফিরিঙ্গির মত xxxx দেখায়। তুমি বাঙ্গালী ভদ্রসন্তান — যতই কেন ইংরাজী কাপড় পর না, তোমার মুখের লালিত্যটুকু, বুদ্ধি ও সৌজন্যের আভাটুকু তোমার বাঙ্গালীত্ব ধরাইয়া দিবে। কিন্তু পাইপটি দাঁতের মধ্যে চাপিলেই মুখভাবের কিঞ্চিৎ পরিবর্তন ঘটে — উহার মধ্যে একটু কাঠখোট্টাগোছ দেখায় — মনে হয়, অত্যল্প কারনেই হয় ত এ ড্যাম বলিয়া গর্জন করিয়া উঠিবে। তাই xxx xxx বেচারি সত্যেন্দ্র-নাথঅনেককষ্টে পাইপ সেবন অভ্যাস করিয়াছে।' [১২৮] (লেডি ডাক্তার)

উল্লেখযোগ্য যে এই ধরণের জীবনযাত্রার জন্য' মহকুমার দ্বিতীয় হাকিম' 'সত্যেন্দ্রনাথ প্রভাতকুমারের লেখনীতে'বেচারি সত্যেন্দ্রনাথ' এ পরিণত হয়েছেন। বাঙ্গালী জীবনের ইংরাজী ভাবের এই ব্যর্থ অনুকরণ প্রভাতকুমার xxxxx সপ্রশংস দৃষ্টিতে দেখতে পারেন নি। তাই লেডী ডাক্তার কুমারী সুবালা মজুমদারের চরিত্রটি কিছুটা হীন করেই এঁকেছেন। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য সুবালাকে এইভাবে চিত্রিত করার জন্য তৎকালীন লেডী ডাক্তারদের সমাজ প্রভাতকুমারের উপর কিছুটা বিরক্তি প্রকাশ করেছিলেন। কৈফিয়ৎ স্বরূপ 'xxxxx গল্পবীথি'র প্রথম সংস্করণের ভূমিকায় প্রভাতকুমার লিখেছেন (১লা আষাঢ়, ১৩২৩)'সুবালাকে আমি অসচ্চরিত্রা করিয়া আঁকি নাই। আমি কেবল দেখাইয়াছি যে সে একটি স্বামী সংগ্রহের জন্য ইংরাজীতে যাহাকে বলে husband hunting বিশেষ রূপ চেষ্টা করিতেছে। ইউরোপীয় সমাজে (অর্থাৎ যে সমাজের আংশিক অনুকরণে এই সকল সম্প্রদায় চলেন ফেরেন) ইহা কখনও পাপ কার্য্য বলিয়া গণ্য হয় নাই। তবে ইহার মধ্যে হীনতা আছে সন্দেহ নাই।---'

বিলাত ফেরতদের মধ্যে যে বিকৃত অনুকরণপ্রিয়তা কৃত্রিম জীবনযাপনের প্রচেষ্টা এবং তৎকালীন এ দেশীয় ব্রাহ্ম সমাজে এইধরণের বিলাতফেরতদের সমাদর বোধ করি প্রভাতকুমার সমর্থন করতে পারেন নি। এ ধরণের সামাজিক রীতিনীতিতে তিনি যেন কিছুটা উষ্মা প্রকাশ করেছেন।' বিলাতফেরতের বিপদ' (আশ্বিন, ১৩১৮) গল্পে নব্য ব্রাহ্ম সন্তোষবাবু এধরণের বিলাত ফেরতদের প্রতি মন্তব্য করেছেন —' তোমরা যে বিলাতফেরত বলে একেবারে অজ্ঞান হলে।। বিলেতফেরতরা কি সহজ লোক ? এমন অপকর্ম নেই যে তারা বিলাতে গিয়ে করে না। আর এখানে ফিরে এসেই বা কি? একটি মদের পিপে হলেই হয়। শাস্ত্রী মহাশয় ডক্টর ল্যান্ডের যে চিত্র এঁকেছেন, তা পড়েও ত লোকের চৈতন্য হ'ল না। আর ব্রাহ্মসমাজের মেয়েদের যে কি রোগ হয়েছে – বিলাতফেরত নইলে তাঁদের পছন্দই হয় না। কেন রে বাপু – যারা বিলাত যায়নি, তারা কি মানুষ নয় ? আসল কথা কি জান ? বিলাত ফেরতের স্ত্রী হ'লে বেয়ারা খানসামা সবাই মেমসাহেব বলে ডাকবে। মাঠাকুরুণ বলে ডাকলে যেন ওদের গায়ে জ্বর আসে – একেবারে অসহ্য। তা মেয়েদেরই বা দোষ দেব কি! এ কালের এ যুগের দোষ। বাহ্য চাকচিক্য দেখেই সকলে মোহিত – ভিতরটায় পদার্থ কিছু আছে কি না, তা কেউ খোঁজ নেয় না।.....

প্রসঙ্গত: উল্লেখ করা যায় প্রভাতকুমার তাঁর ব্যক্তিজীবনে ব্রাহ্ম এবং বিলাত উভয় সমাজেই – অন্তরঙ্গভাবে মেলামেশার সুযোগলাভ করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ এবং সরলাদেবীর সঙ্গে পরিচয় এবং অন্তরঙ্গতা সূত্রে ব্রাহ্ম সমাজের দৈনন্দিন ক্রিয়া কলাপ, আচার - ব্যবহার এবং মানসিকতাকে তিনি নিশ্চয় উপলব্ধি করেছিলেন। অপরপক্ষে - বিলাতে স্যার অসওয়াল্ডের বাড়ীতে থাকাকালীন সেখানকার পারিবারিক জীবন যাত্রার, সামাজিক আচার ব্যবহারের খুঁটিনাটি সম্বন্ধে অভিজ্ঞ হয়ে উঠেছিলেন। আবার নিজে ছিলেন নিষ্ঠাবতী হিন্দু বিধবার একমাত্র পুত্র। তাই হিন্দু ধর্মের লৌকিক আচার আচরণ পূজা পার্বন ইত্যাদি সম্বন্ধেও তাঁর অভিজ্ঞতা ছিল, এই ধর্মের আচার আচরণের মধ্যে যে উদারতা বা অনুদারতা তিনি লক্ষ করেছেন তাঁর রচনার বিভিন্ন ক্ষেত্রে এসবের পরিচয় রয়েছে।

'খোকার কান্ড'(আশ্বিন, ১৩২১) গল্পের হরসুন্দরবাবু 'বউচুরি' (বৈ:, ১৩০৭) গল্পের অনাথশরণ 'মনের মানুষ'(১৩২৯) উপন্যাসের অমূল্য

চরিত্রগুলি ব্রাহ্মধর্মমত বিশ্বাসী বা অবলম্বী হলেও অনেক সময় হিন্দু সংস্কারমুক্ত হতে পারেন নি । পরন্তু প্রভাতকুমারের সমসাময়িক কালে অনেকেই পৌত্তলিকতাকে বিসর্জন দিয়ে ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষিত হয়ে আধুনিক চিন্তাধারার ধারক বাহক বলে নিজেকে গর্বিত মনে করিতেন । এই হুজুগে পড়ে অনেকেই ব্রাহ্ম ধর্মে দীক্ষিত দীক্ষাও নিয়েছিলেন কিন্তু পূর্বার্জিত সংস্কার বিসর্জন দিতে পারেন নি । নব্যতন্ত্রে দীক্ষিত হওয়ায় তাদের মধ্যে সব বিষয়েই একটি বিশেষ বাড়াবাড়ি ভাব দেখা যেত , প্রভাতকুমার সেটা সহ্য করতে পারেননি । তাই হরসুন্দরবাবু নব্য ব্রাহ্ম হয়ে যেহেতু আইন ব্যবসায়ে মিথ্যা কথা বলতে হয় তাই আইন পাশ করেও ওকালতি ব্যবসা করেন নি । তিনি নব্যব্রাহ্মদের মতানুযায়ী বিধবা বিবাহ সমর্থন করেন , কিন্তু অসুস্থ অবস্থায় তার এই মত পরিবর্তিত হতে দেখা যায়। তার মৃত্যুর পর স্ত্রী পঙ্কজিনী পুনর্বিবাহ করবেন এটা ভাবতে কষ্ট পেয়েছেন । প্রকৃত সত্য এই কোন স্বামীই মনের গভীরে ভাবতে পারেন না যে তার মৃত্যুর পর স্ত্রী পরপুরুষের সঙ্গলাভ করবে । যুক্তি-তর্কের সত্য এবং হৃদয়ের সত্য যে এক নয় প্রভাতকুমার এটা বিশ্বাস করতেন । সেজন্য অনাথশরণকে বউচুরি করতে হয়েছে - যে অনাথশরণ মূর্তিবিদ্বেষ বশত: পূজার ঘরে প্রবেশ করে না , ভালবেসে বিয়ে হয়নি বলে স্ত্রীকে ভগিনী জ্ঞান করার মত অমূলক চিন্তাধারায় বিশ্বাসী । যাহোক নব্য ব্রাহ্মদের মধ্যে এধরণের কিছু কিছু প্রচলিত মতবাদকে প্রভাতকুমার প্রয়াশ:ই সমর্থন করতে পারেন নি ।

আবার দেখা যায় 'প্রত্যাবর্তন' (বৈ: ১৩১৩) গল্পে নিম্নবর্ণের হিন্দু ধোপাজাতীয় যুবক রামানিধি নিজ বন্ধুস্থানীয় উচ্চবর্ণের হিন্দুদের কাছ থেকে লাঞ্ছিত হয়ে খৃষ্টান হবার মনস্থ করেছেন । কিন্তু সেখানেও দেশীয় খৃষ্টানদের দুরবস্থা দেখে এবং শ্বেতাঙ্গ খৃষ্টানগণ দেশীয় খৃষ্টানগণকে যে অবজ্ঞার দৃষ্টিতে দেখেন সে সমস্ত উপলব্ধি করে ইংরাজী পোষাক ফেলে দিয়ে , ধুতি চাদর পরে মাথা মুড়িয়ে প্রায়শ্চিত্ত করে স্বগৃহে এবং স্বধর্মে প্রত্যাবর্ত্তন করেছে ।

প্রকৃতপক্ষে প্রভাতকুমার ধর্মের প্রকৃত অর্থ যে মানবকল্যাণ তাতেই বিশ্বাসী ছিলেন । প্রতিটি ধর্মের বাহ্যিক আচার আচরণের মধ্যে যে কিছুটা গলদ থাকে তাকে সযত্নে পরিহার করে নিজ নিজ ধর্মে আত্মনিষ্ঠ হয়ে জীবনযাপনেরই পক্ষপাতী ছিলেন । সাময়িক উত্তেজনাবশে পরধর্ম গ্রহণকে ভয়াবহ বলেই তিনি মনে করেছেন ।

প্রভাতকুমারের গল্প উপন্যাসে কৌতুক হাস্যের অবতারণার মাধ্যম প্রধানই হয়েছে তথাকথিত ব্রাহ্মধর্মাবলম্বী অথবা বিলাতফেরত সামাজিকদের অসঙ্গতিপূর্ণ আচার আচরণ । স্বাদেশিকতার উন্মত্ততার মধ্যে যে অসঙ্গতি অনেক সময়

লক্ষ্য করা যায় প্রভাতকুমারের রসসৃষ্টি তাকেই আবিষ্কার করে অনেক ক্ষেত্রে সাহিত্য-রস সৃষ্টির প্রয়াস পেয়েছেন ।

ব্যবহারিক জীবনে কলকাতা থেকে দূরে গয়াতে জীবন যাপন করলেও প্রভাতকুমারের যোগসূত্র কিন্তু কলকাতার সঙ্গে কোন দিনই ছিন্ন হয়নি । জ্যেষ্ঠ-পুত্র অরুণকুমার তখন কলকাতায় থেকে পড়াশুনা করতেন । সেই সূত্রে এবং অন্যান্য সাহিত্যিক বন্ধুদের সঙ্গে সংযোগ রক্ষার্থে তাকে প্রায়শই কলকাতায় আসতে হতো । গয়ায় থাকাকালীন তাঁর দুইটি উপন্যাস' নবীন সন্ন্যাসী' (ভাদ্র, ১৩১৯)'রত্নদীপ' (আষাঢ়, ১৩২২) এবং দুইটি গল্পগ্রন্থ ' দেশী ও বিলাতী'(আশ্বিন, ১৩১৩) গল্পাঞ্জলি (আশ্বিন, ১৩২০) প্রকাশিত হয়েছিল । বলাবাহুল্য এগুলি সবই কলকাতা থেকে প্রকাশলাভ করে এবং প্রকাশনা ব্যাপারে — তাঁর কলকাতা আগমন অনিবার্য্য হয়ে উঠেছিল ।

এছাড়া রবীন্দ্রনাথের প্রতি আন্তরিক শ্রদ্ধা প্রীতি জ্ঞাপনার্থে গয়ায় থাকা কালীন তিনি যে একবার অন্ততঃ রবীন্দ্রনাথের কবি সম্বর্ধনায় উপস্থিত হয়েছিলেন তার উল্লেখ পাই তৎকালীন 'প্রবাসী' সম্পাদক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের কন্যা শ্রীমতী সীতা দেবীর 'পুণ্যস্মৃতি' গ্রন্থে । ১৯১২ খৃষ্টাব্দের ২৮শে ফেব্রুয়ারি (১৩১৮ বঙ্গাব্দ) কলকাতার টাউন হলে রবীন্দ্রনাথকে কবি সম্বর্ধনা জানান হয়েছিল। এই সভায় মাননীয় অতিথি অভ্যাগতের মধ্যে বহু জ্ঞানীগুণীর সমাবেশ ঘটেছিল । তাঁদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন গোপালকৃষ্ণ গোখলে , সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর , মহারাজ জগদিন্দ্রনাথ রায় , স্বর্ণকুমারী দেবী এবং সরলা দেবী ইত্যাদি অনেকে । এই সভায় অভিনন্দন পত্র পাঠ করেছিলেন মহারাজ জগদিন্দ্রনাথ রায়। এই অভিনন্দনের উত্তর দেবার পর সমবেত সাহিত্যরসিক রবিভক্তের দল একে একে কবিকে পুষ্প অর্ঘ্য নিবেদন করেন । সীতাদেবী স্বয়ং এখানে উপস্থিত ছিলেন ।ঘটনার আনুপূর্বিক বর্ণনায় লিখেছেন —

' ইহার পর ডাক পড়িল মেয়েদের পুষ্পঅর্ঘ্য দিবার জন্য । অনেক ঠেলাঠেলির পর একটা রাস্তা পরিষ্কার হইল এবং বালিকারা সকলে অগ্রসর হইয়া গেলাম । দুই চারিজন মহিলাও আসিয়া আমাদের সঙ্গে যোগ দিলেন । রবীন্দ্রনাথ হাস্য মুখে উঠিয়া দাঁড়াইয়া পুষ্প উপহার গ্রহণ করিলেন । তাহার পর সাহিত্যিকবৃন্দ তাঁহাদের পুষ্প অর্ঘ্য লইয়া অগ্রসর হইলেন । প্রসিদ্ধ সাহিত্যিক প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়কে এইখানে একবার মাত্র দেখিয়াছিলাম । তিনি লোকের ভিড়ে কিছুতেই অগ্রসর হইতে না পারিয়া বড়ই ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছিলেন । অবশেষে চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ কয়েজন তাঁহাকে উদ্ধার করিয়া সামনে আনিয়া উপস্থিত করিলেন । তিনিও কবির হাতে ফুলের তোড়া উপহার দিলেন ।' [১২৯]

এই কবি - সংবর্ধনার পর মহর্ষিভবন জোড়াসাঁকোতে কবির অন্তরঙ্গ সাতজন নিয়ে এক চিত্র গৃহীত হয় । এই সাতজন হলেন – কবি করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায় , কবি যতীন্দ্রমোহন বাগচী , কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত কবি ও ঔপন্যাসিক চারু বন্দ্যোপাধ্যায় , দ্বিজেন্দ্রনারায়ণ বাগচী , মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায় এবং প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় ।(চিত্রটি দেশ পত্রিকায় ১৩৭৫ সালের সাহিত্য সংখ্যায় 'সপ্তাশ্ববাহিত সূর্য' এই শিরোনামায় পুনর্মুদ্রিত হয়েছে)। এই প্রসঙ্গে স্মরণ করা যায় রবীন্দ্রনাথের এই ভক্ত - শিষ্যদের মধ্যে বেশ একটা অন্তরঙ্গতার সুর গড়ে উঠেছিল এবং আজীবন প্রভাতকুমার এই সৌহার্দ্য রক্ষা করায় সচেষ্ট ছিলেন। কখনও কখনও ভ্রান্তি বশত: নিজেদের মধ্যে মতান্তর ঘটলেও প্রভাতকুমার স্বভাবসুলভ উদারতায় সে সবের অবসান ঘটাতেন ।

১৩২০ - ২১ সালের কোন এক সময়ে ঔপন্যাসিক চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় একবার বৌদ্ধগয়া দর্শনে যান , সে সময়ে রবীন্দ্রনাথও গয়াতে গিয়েছিলেন । স্বাভাবিকভাবে প্রভাতকুমার রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়েন। কবিকে যথোচিত অভ্যর্থনা জানানোর জন্য প্রভাতকুমার অতিমাত্রায় ব্যস্ত থাকায় চারুচন্দ্রের প্রতি অধিক মনোযোগ দেওয়া তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়ত হয়নি । তবুও এই ব্যস্ততার ফাঁকে যখন শুনতে পেলেন চারুবাবু এসেছেন তখন তাকে স্থানীয় দ্বিজেন্দ্রলাল লাইব্রেরীতে নিয়ে যান কারণ সেখানে চারুবাবুর পুস্তকাবলী সযত্নে রক্ষিত ছিল এবং লেখকের প্রতি delicate compliment জানানোই ছিল প্রভাতকুমারের উদ্দেশ্য । কিন্তু চারুবাবু এতে সন্তুষ্ট হতে পারেন নি এবং ঘটনাটিকে কেন্দ্র করে প্রভাতকুমারকে অভিযোগ করেছিলেন যে সে সময়ে তাঁকে যথোচিত আদর - আপ্যায়ন করা হয়নি । অত্যন্ত ব্যথিত হয়ে এই প্রসঙ্গে প্রভাতকুমার চারুবাবুকে লিখেছিলেন –

'.... আপনি যখন গয়াতে আসিয়াছিলেন তখন আমি আপনার প্রতি cold ব্যবহার করিয়াছি – আপনার এই অভিযোগে আমি বড়ই ব্যথিত হইলাম । আমি ত জ্ঞানকৃত কোনও অসৌজন্যতা করি নাই । তবে কেন এই ধারণা হইল বুঝিতে পারিতেছি না । যে দিন আপনারা পৌঁছিলেন রবিবাবুকে আমরা দ্বিজেন্দ্রলাল লাইব্রেরীতে লইয়া যাইতেছিলাম । শুনিলাম আপনি নগেন্দ্রবাবুর সঙ্গে বুদ্ধগয়া যাইতেছেন । তখন আমিই আপনাকে গ্রেপ্তার করিয়া দ্বিজেন্দ্রলাল লাইব্রেরীতে লইয়া গেলাম । আপনার পুস্তকাবলী আমরা আদর করিয়া লাইব্রেরীতে রাখিয়াছি , তাহা আপনাকে দেখাইলাম । উহাও আপনার প্রতি একটা delicate compliment দিবার উদ্দেশ্যেই । আপনি এখানে যে কয়দিন ছিলেন , রবিবাবু - রূপ মহাদ্রুমের আওতায় পড়িয়া গিয়াছিলেন বলিয়াই বোধ হয় আপনার প্রতি ব্যবহারে আমাদের কোন ত্রুটি ঘটিয়া থাকিবে । আমরা রবিবাবুকে লইয়া বোধ হয় একটু বেশী

ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছিলাম – তাই আপনার প্রাপ্য আমাদের মনোযোগের অংশ কিছু কম হইয়া গিয়া থাকিবে। যদি আপনি তাহাই মনে করিয়া থাকেন, সকরপুটে আপনার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি। আপনি বিশ্বাস করুন, জানিয়া শুনিয়া, ইচ্ছা করিয়া আপনার প্রতি কোনরূপ cold ব্যবহার আমি করি নাই।...' ১৩০

লক্ষ্য করার বিষয় এই যে প্রভাতকুমারের মত লব্ধপ্রতিষ্ঠ লেখক বয়:কনিষ্ঠ বন্ধুর সামান্য অভিযোগের জন্য কতখানি ব্যথিত হয়েছিলেন এবং নিজের অজ্ঞানতাজনিত ত্রুটির জন্য বিনম্র ভাষায় কনিষ্ঠ সাহিত্যিকের কাছে মার্জনা চাইতেও কার্পণ্য করেননি।

প্রভাতকুমারের গয়া অবস্থানকালে, কলকাতার অন্যতম বিখ্যাত মাসিক পত্রিকা 'মানসী'তে তাঁর অনেকগুলি রচনা প্রকাশিত হয়েছিল। বিশেষ করে ১৩১৬ সালের পর থেকে 'প্রবাসী'তে তিনি আর লেখেননি বরং দেখা যায় যে সে স্থান দখল করেছে 'মানসী' 'সাহিত্য' ইত্যাদি পত্রিকাগুলি। এই 'মানসী' পত্রিকাতেই তাঁর অন্যতম বিখ্যাত গল্প 'রসময়ীর রসিকতা' পৌষ, ১৩১৬ সালে প্রকাশিত হয়। নাটোরের মহারাজা জগদিন্দ্রনাথ রায় ছিলেন পত্রিকাটির অন্যতম সম্পাদক। জগদিন্দ্রনাথের সঙ্গে ইতঃপূর্বেই সিমলাতে প্রভাতকুমারের পরিচয় হয়েছিল। ১৩২০ সালের ফাল্গুন - মাসে জগদিন্দ্রনাথ 'মানসী'র সম্পাদনাভার গ্রহণ করলে মহারাজের সঙ্গে প্রভাতকুমারের পরিচয় নিবিড়তর হতে থাকে। 'মানসী'র সম্পাদক হবার কিছু দিন পর 'মানসী'র পক্ষ থেকে মহারাজা একটি প্রীতি - ভোজের আয়োজন করে কলকাতার সমস্ত সাহিত্যিকদের করলেন সাদরে আমন্ত্রন। অনুষ্ঠান হয় তাঁর বালীগঞ্জের বাগান বাড়ীতে। তাঁর আমন্ত্রণ রক্ষা করেছিলেন বড়, মেজো, সেজো, ছোট প্রত্যেক সাহিত্যিকই'। ১৩১ প্রমথ চৌধুরী থেকে হেমেন্দ্রকুমার রায় পর্যন্ত। প্রভাতকুমারও এই প্রীতি ভোজে যোগদান করেছিলেন। ১৩২১ সালে অনুষ্ঠিত 'মানসী'র এই প্রীতি সম্মিলনে নাট্যকার অমৃতলাল বসুর সঙ্গে প্রভাতকুমারের সাক্ষাৎ পরিচয়ের সুযোগ ঘটে। অমৃতলাল ইতঃপূর্বেই প্রভাতকুমারের গল্প পাঠে মুগ্ধ হয়েছিলেন, এই সাক্ষাৎ পরিচয়ে তিনি প্রভাতকুমারের রচনার প্রশংসা করেন এবং তাঁর কিছু রচনার নাট্যরূপ দেবার আগ্রহ প্রকাশ করেন। সে যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নাট্যকারর কাছ থেকে এ ধরণের প্রশংসা পেয়ে প্রভাতকুমার নিজেকে ধন্য মনে করেছেন এবং কৃতজ্ঞচিত্তে সে কথা স্মরণ করে ১লা শ্রাবণ, ১৩২১ সালে গয়া থেকে তাঁকে লেখেন –

' শ্রদ্ধাস্পদেষু

' মানসীর' প্রীতি সম্মেলনে সেদিন আপনার সাক্ষাৎ পরিচয় লাভ করিয়া আমি ধন্য হইয়াছি । আপনার ন্যায় সূক্ষ্মদর্শী বিচক্ষণ সাহিত্য-চার্য্যের নিকট হইতে আমার সামান্য রচনাগুলি সম্বন্ধে যে উচ্চ প্রশংসা এবং উৎসাহবাক্য আমি পাইয়াছি তাহাতে নিজেকে বিশেষ গৌরবান্বিত মনে করিতেছি । ইহা আমার অক্ষম সাহিত্য সাধনার আশাতীত পুরস্কার ।

আমার কোন কোনও গল্প আপনি নাটকাকারে পরিবর্ত্তন করিয়া লইবার অভিপ্রায় করিয়াছেন , তাহাও আমার অল্প সৌভাগ্যের বিষয় নহে । .... কোন্ কোন্ গল্প নাটকোপযোগী তাহা নির্দ্দেশ করিতে পারি এমন ক্ষমতা আমার নাই , তবে আপনার অনুরোধ প্রতিপালনস্বরূপ , নিম্ন লিখিত গল্পগুলিরপ্রতি আপনার মনোযোগ প্রার্থনা করিতেছি ।

' মানসী' হইতে লেডি ডাক্তার' ।'গল্পাঞ্জলি' (১) বাল্যবন্ধু (২) মাদুলী (৩) রসময়ীর রসিকতা ।' দেশী ও বিলাতী' (২) আমার উপন্যাস (২) প্রত্যাবর্ত্তন ।' ষোড়শী' – (১) সচ্চরিত্র (২) খুড়া মহাশয় 'নবকথা' – (১) অঙ্গহীনা (২) পত্নীহারা (৩) বিষবৃক্ষের ফল ।

.....

.....

ভবদীয় গুণমুগ্ধ

শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় ।' [১৩২]

বলাবাহুল্য প্রভাতকুমার এখানে যে গল্পগুলির উল্লেখ করেছেন তার প্রত্যেকটিতে নাটকীয় উপাদান রয়েছে । কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও অমৃতলাল শেষ পর্যন্ত প্রভাতকুমারের কোন গল্পের নাট্যরূপ দিয়ে যেতে পারেন নি ।

প্রভাতকুমার নিজে ছিলেন অভিনয় কলা রসিক । পরবর্তী সময়ে তিনি যখন স্থায়ী ভাবে কলকাতায় বসবাস আরম্ভ করেন তখন মাঝে মাঝে অভিনয় দেখার উদ্দেশ্যে মিনার্ভা থিয়েটারে আসতেন ।' তিনি (প্রভাতকুমার) অভিনয়ে অনুরাগী ছিলেন , মিনার্ভা থিয়েটারে তাঁর সঙ্গে দেখাশুনা হতো',[১৩৩] প্রভাতকুমারের 'নিষিদ্ধ ফল' গল্প অবলম্বনে' ইন্ডিয়ান সিনেমা আর্টস' নামক এক চলচ্চিত্র সংস্থা একখানি নির্বাক ছবি তুলেছিলেন । বাঘমারির স্টুডিওতে সর্বপ্রথম যেদিন বইটির প্রদর্শনী হয় সেই দিন প্রভাতকুমার সেখানে উপস্থিত

ছিলেন । প্রভাতসুহৃদ হেমন্তকুমার রায় লিখেছেন —' আমি তখন 'নাচঘর' এর সম্পাদক । ' ইন্ডিয়ান সিনেমা আর্টস' নামক চলচ্চিত্র সম্প্রদায় প্রভাত-কুমারের' নিষিদ্ধ ফল' নামে গল্প অবলম্বন করে একখানি নির্বাক ছবি তুললে এবং তাদের বাঘমারির স্টুডিওয় ছবিখানি সর্বপ্রথম দেখাবার জন্যে আমন্ত্রিত হলুম । সেইখানেই আবার প্রভাতকুমারের সঙ্গে দেখা এবং তাঁর সঙ্গে ভালো করে কথা কইবার সুযোগ পেলুম । চিত্র প্রদর্শনী শেষ হলো । শ্রীকালীপ্রসাদ ঘোষের পরিচালনায় তোলা সেই ছবিখানি আমারও ভাল লাগলো এবং পরে জনসাধারণও তাকে সাদরে গ্রহণ করেছিল ।' [১৩৪] যাহোক অমৃতলালের প্রতিভায় তিনি যে আকৃষ্ট হয়েছিলেন যথাস্থানে তার আলোচনা করা যাবে ।

মহারাজ জগদিন্দ্রনাথ রায়ের সম্পাদনায়' মানসী' পত্রিকা প্রকাশের কাল থেকেই প্রভাতকুমার পত্রিকাটির উন্নতিকল্পে কিছু কিছু নিজ রচনা দান করেন ।' মানসী'তে গল্প রচনা মারফৎ মহারাজের সঙ্গে প্রভাতকুমারের নূতন করে সখ্যতা দৃঢ়বদ্ধ হয় ।' মানসী' প্রকাশের দেড় বৎসর পর অমূল্য-চরণ বিদ্যাভূষণকে সহযোগীরূপে গ্রহণ করে জগদিন্দ্রনাথ' মর্ম্মবাণী' নামে সাহিত্য বিষয়ক একখানি সাপ্তাহিক পত্রিকার প্রতিষ্ঠা করেন । পত্রিকাটির প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হয় ১৩ই শ্রাবণ,১৩২২(ইং ১৯১৫) সালে । প্রভাতকুমার এখানেও ছদ্মনামে রচনা দিয়ে পত্রিকাটিকে সাহায্য করেন । এই পত্রিকাতেই শ্রাবণ, ১৩২২ থেকে আশ্বিন, ১৩২২ পর্যন্ত প্রভাতকুমারের একমাত্র প্রহসন রচনা 'সূক্ষ্মলোম পরিণয়' শ্রী জানোয়ারমোহন শর্ম্মা এই ছদ্মনামে প্রকাশিত হয় । প্রহসনটির অভিনবত্ব এই, এখানকার পাত্রপাত্রীরা সব জীবজন্তু । এই রচনাটি সম্বন্ধে হেমেন্দ্রকুমার রায় জানিয়েছেন —' জন্তুদের নিয়ে তার আগে বাংলা ভাষায় আর কোন নাটক বা উপন্যাস রচিত হয়নি । রচনাটি ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়ে পড়ুয়াদের চমৎকৃত করেছিল । সকলের মুখেই শুনেছি তার সুখ্যাতি ।' [১৩৪] মর্ম্মবাণী পত্রিকাটি ছয়মাসকাল চলেছিল । এরপর'মানসী' পত্রিকাটির সঙ্গে যুক্ত হয় মানসী ও মর্ম্মবাণী' নামধারণ করে ১৩২২ সালের ফাল্গুন মাস থেকে মাসিক পত্রিকারূপে আত্মপ্রকাশ করে।মহারাজের অনুরোধে প্রভাতকুমার পত্রিকাখানির সহযোগী সম্পাদকরূপে যোগদান করেন ।

' মানসী মর্ম্মবাণী'তে যোগদান প্রভাতকুমারের জীবনের অন্যতম উল্লেখযোগ্য ঘটনা । এই সময় থেকেই প্রায় প্রায় সম্পূর্ণ ভাবে তিনি সাহিত্য সেবায় আত্মনিয়োগ করেন । এই নূতন কার্যভার গ্রহণকালে যদিও তিনি গয়ায় আইন ব্যবসায়ে লিপ্ত ছিলেন এবং পত্রিকাটি বের হবার কয়েকদিন আগে গয়া থেকে কলকাতায় আসতেন কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই তিনি সুস্থভাবে পত্রিকা সম্পাদনার জন্য স্থায়ী ভাবে কলকাতায় চলে আসেন ।

গয়া থেকে যখন কলকাতায় আসতেন তখন তাঁর আবাসস্থল প্রায়শই হত ঠনঠনিয়ার 'মমতাশ্রম' হোটেলে। মাঝে মাঝে অবশ্য তাঁর ঘনিষ্ঠ বন্ধু-বান্ধবদের বাড়ীতেও আশ্রয় নিতেন। এই সময়ে তাঁর অন্যতম বন্ধু ছিলেন 'মানসী' পত্রিকার কার্য্যাধ্যক্ষ সুবোধ চন্দ্র দত্ত। মানিকতলায় তাঁর বাড়ীতেও প্রভাতকুমার কয়েকবার আতিথ্য গ্রহণ করেছেন। ২৪শে কার্ত্তিক, ১৩২১ সালে চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়কে এক পত্রে প্রভাতকুমার লিখেছেন —' এবার আমি গিয়া ৬৫ নং মানিকতলায় সুবোধবাবুর অতিথি ছিলাম। ...' তখন 'মানসী' পত্রিকার কার্য্যালয় ছিল কলকাতার ২/৫ চৌরঙ্গী স্ট্রীটে।' কলকাতায় এলে 'মানসী'র এই কার্য্যালয়ে তাঁর উপস্থিতি অনিবার্য ছিল। পরবর্তীকালে বাংলা সাহিত্যের অনেক বিদগ্ধ মনীষার সঙ্গে তাঁর আলাপের সূত্রপাত এখানেই হয়েছিল। এখানে যাঁরা প্রায়শই আসতেন তাঁদের মধ্যে অন্যতম গল্পলেখক ফকিরচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, কবি যতীন্দ্রমোহন বাগচী, সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত বিখ্যাত জীবনী গ্রন্থ রচয়িতা মন্মথনাথ ঘোষ প্রভৃতি। শ্রদ্ধেয় মন্মথনাথ ঘোষ এই সময়ে দেবপ্রসাদ অধিকারীর ভবনে প্রভাতকুমারের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎকারের এক মনোজ্ঞ বিবরণ দিয়েছেন ——

' . ------ প্রভাতকুমার 'মানসী ও মর্ম্মবাণী'র অন্যতম সম্পাদক হইবেন বলিয়া প্রচারিত হইয়াছে কিন্তু তিনি তখনও গয়া হইতে একেবারে চলিয়া আসেন নাই — ল' কলেজের অধ্যাপক হইবেন কথা হইতেছে। সর্বাধিকারী মহাশয়ের গৃহ হইতে প্রত্যাবর্তনকালে আমরা সার্কুলার রোডে একই ট্রামে উঠিলাম। আমার তখন প্রথম বাঙ্গালা গ্রন্থ 'মহাত্মা কালীপ্রসন্ন সিংহ' প্রকাশিত হইয়াছে। সকল প্রবীণ গ্রন্থকারের ন্যায় আমারও তখন গ্রন্থখানি সম্বন্ধে সুধীগণের মতামত জানিবার জন্য প্রবল ঔৎসুক্য। জলধর দাদা (জলধর সেন)পূর্বেই গ্রন্থখানির প্রশংসা করিয়াছিলেন। 'মানসী'তে সমালোচনার জন্য একখন্ড কয়েকদিন পূর্বে 'মানসী' অফিসে দিয়া আসিয়াছিলাম। প্রভাতকুমার স্বয়ং সেই গ্রন্থের সমালোচনা করিতে প্রতিশ্রুত হইলেন এবং বলিলেন 'মানসী ও মর্ম্মবাণী' বৃহদাকারে বহুচিত্র সম্বলিত হইয়া প্রকাশিত হইবে, আমি যেন তাহাতে লিখি। বলাবাহুল্য আমার ন্যায় নবীন লেখককে প্রভাতকুমারের ন্যায় বঙ্গ বিশ্রুত সাহিত্যিক এরূপ অনুরোধ করায় আমি কতদূর আনন্দ ও গর্ব অনুভব করিলাম। আমি তখন একজন মুসলমান কর্মবীরের জীবনচরিত লিখিতে আরম্ভ করিয়াছিলাম, বোধ হয় প্রথম দুই পরিচ্ছেদ মাত্র তখন লিখিত হইয়াছিল। আমি প্রভাতকুমারকে জিজ্ঞাসা করিলাম, উহা কি মানসীতে ছাপা হইতে পারে ? তিনি দেখিতে চাহিলেন। আমি বলিলাম আমি সপ্তাহ মধ্যে আমাদের পুরুলিয়ার নবনির্মিত বাটীতে সপরিবারে স্বাস্থ্যান্বেষণে যাইতেছি, কবে দেখাইব ? তিনিও বলিলেন তিনিও সেই রাত্রে গয়ায় ফিরিবেন, সুতরাং সেইদিনই সন্ধ্যার সময় 'চৌরঙ্গী'তে 'মানসী' অফিসে যদি আমি প্রবন্ধটি লইয়া যাই

তো তিনি দেখিতে পারেন। আমি সন্ধ্যার সময় দেখা করিলাম। তিনি প্রথম দুই পরিচ্ছেদ আদ্যোপান্ত পড়িলেন, পড়িয়া সন্তুষ্ট হইলেন। প্রবন্ধটিতে ইংরেজী বাক্য উদ্ধৃত ছিল, সেগুলির মূল দেওয়া আবশ্যক তিনি স্বীকার করিলেন। তখন প্রেসে ইংরাজী টাইপ বেশী ছিল না বলিয়া স্থির হইল কয়েকমাস বাদে তিনি উহা ছাপিবেন এবং আমিও ইতিমধ্যে জীবনচরিতটি সম্পূর্ণ করিব। সেই-দিনই তিনি নাটোরাধিপতি মহারাজ জগদিন্দ্রনাথের সহিত আমাকে পরিচিত করিয়া দেন।' ১৩৬

লক্ষনীয় এই, সম্পাদক হিসাবে নূতন লেখকদের প্রতি ব্যবহারেও প্রভাত-কুমার কতখানি উদার এবং নির্ভিমান। তাঁর আন্তরিকতাপূর্ণ ব্যবহারের জন্য বন্ধুমহলেও তিনি সবার অত্যন্ত প্রিয় ছিলেন। পরবর্তীকালে মন্মথনাথ ঘোষের সঙ্গে সাহিত্য সংক্রান্ত কিছু পত্রালাপ তাঁর হয়েছিল এবং মন্মথনাথের কয়েকটি রচনার সমালোচনা 'মানসী' পত্রিকায় প্রভাতকুমার করেছিলেন। পরবর্তীকালে যখন তিনি 'মানসী ও মর্ম্মবাণী'র সম্পাদকরূপে প্রতিষ্ঠিত হন তখন মন্মথনাথের অনেক রচনা পত্রিকাটিতে প্রকাশলাভ করে।

এই সময়ে 'মানসী ও মর্ম্মবাণী' সম্পাদনার ব্যাপারে প্রতিমাসে গয়া থেকে কলকাতায় আসা প্রভাতকুমারের পক্ষে কষ্টকর হয়ে পড়ে। উপরন্তু শুধুমাত্র পত্রিকা সম্পাদনার আয় থেকে সংসার নির্বাহ করা সেই যুগে প্রায় অসম্ভব হওয়ায় মহারাজের সহযোগিতায় কলকাতায় স্থায়ীভাবে বসবাসের জন্য তিনি সচেষ্ট হন।

(৭)

মহারাজের চেষ্টায় প্রভাতকুমার কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ল কলেজের অধ্যাপক পদে নিযুক্ত হন এবং ১৯১৬ সালের ১লা আগষ্ট এই কাজে যোগদান করেন। জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত উক্ত পদে তিনি প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। অধ্যাপকের পদে নিযুক্ত হবার কিছুদিন পর ১৩২৩ সালের প্রথম দিকে গয়া থেকে স্থায়ীভাবে কলকাতায় চলে আসেন। এখানে এসে প্রথমে তিনি ১৪ এ রামতনু বোস লেনে বাড়ী ভাড়া করে বসবাস করতে থাকেন এবং কিছুদিন পরে ২৩ বি বেথুন রো

কলকাতা - ৬ তে ভাড়া বাড়াতে চলে আসেন (তৎকালীন স্যার কেদারনাথ দাসের পাশে পশ্চিম দিকের বাড়ী) ~~XXXX~~ জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত এই বাড়ীতেই তিনি বসবাস করেছেন । [১৩৭]

আইন কলেজে অধ্যাপনাকাজে যোগদানকালে তাঁর সহকর্মীদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন শ্রীআশুতোষ মুখার্জী , শ্রীবিজন কুমার মুখার্জী , শ্রীবারানসীবাসী মুখার্জী , শ্রীযোগেন্দ্রনাথ মুখার্জী ইত্যাদি প্রখ্যাত আইনবিদগণ । ১৯১৭ সালের কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যালেন্ডারে দেখি —

" Mukerjee ,Babu Asutosh .M.A.Bl.
,, ,, Bijankumar M.A.M.L.
,, ,, Baranasibasi,M.A.B.L.
,, ,, Jogendranath,M.A.B.L.
,, Mr. P.K.,Bar-at-law
..... ইত্যাদি' [১৩৮]

এখানে তিনি থার্ড ইয়ার ক্লাসে Criminal Law পড়াতেন । বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৯১৮ - ১৯ সালের ক্যালেন্ডারে দেখি সে সময়ে Criminal Law ক্লাসে পাঁচ জন অধ্যাপক ছিলেন । শ্রীযোগেন্দ্রনাথ মুখার্জী , এম.এ., বি.এল , ~~XX~~ ছিলেন চেয়াম্যান এবং প্রভাতকুমারের নাম সাধারণ অধ্যাপক হিসাবে চিহ্নিত হয়েছে । ১৯১৯ - ২০ সালের ক্যালেন্ডারেও দেখি তিনি থার্ড ইয়ার ক্লাসে Criminal Law ক্লাসের অধ্যাপক।

উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৯৩১ সালেও তিনি Criminal Law ক্লাসের অধ্যাপক ছিলেন । [১৩৯] ১৯৩২ সালেও তিনি Criminal Law পড়াতেন কিন্তু তখন তিনি ছুটিতে । "P.K.Mookerjee Esq.,B.A. (On leave) ,[১৪০] দীর্ঘদিন ধরে Criminal Law পড়িয়েছেন এ থেকে বুঝে নিতে অসুবিধা হয় না তিনি ফৌজদারী আইনকানুন সম্বন্ধে যথেষ্ট জ্ঞানার্জন করেছিলেন ।

প্রভাতকুমারের সাহিত্য রচনার ক্ষেত্রে আমরা দেখতে পাই এক সহজ সরলতা- বাংলা এবং সংস্কৃত ভাষায় প্রভূত পান্ডিত্য থাকা সত্ত্বেও ভাব বা ভাষার জটিলতা পাঠককে কোন সময়েই ক্লিষ্ট করে না। অধ্যাপনার ব্যাপারেও তাঁর মধ্যে এমনি একটি সহজ সরল মানুষের পরিচয় পাওয়া যায় । আইনের নীরস বক্তব্যগুলিও তিনি কত সরস হাসিখুশিভাবে ছাত্রদের কাছে উপস্থাপিত করতেন তার সুন্দর একটি পরিচয় পাই প্রভাতকুমারের আইন ক্লাসের জনৈক

াত্র শ্রীভবতোষ ভট্টাচার্য্যের একটি চিঠি থেকে । শ্রীভট্টাচার্য্য লিখিছেন ---

' ..... কলিকাতা ইউনিভারসিটি ল কলেজে আইন পড়িবার সময় তাঁহার নিকট ফৌজদারী আইন বিষয়টি পড়িবার আমার সৌভাগ্য হয়েছিল । কারণ , তিনি ব্যারিস্টার ছিলেন ও সেই হিসাবে উক্ত ল কলেজে অধ্যাপনা করিতেন ।........

.... ব্যারিস্টার অধ্যাপক প্রভাতকুমারের নিকট আমার অধ্যয়ন কালের দুই একটি অভিজ্ঞতার কথা জানাইতেছি ।

ভারতীয় ফৌজদারী আইন Indian penal code ও Criminal Procedure code লইয়া গঠিত । এই penal Code এর ১২৪ ধারায় Sedition অর্থাৎ রাজদ্রোহ অপরাধ বর্ণিত হয়েছে । ইংরাজ আমলে ভারতবর্ষে প্রথম রাজদ্রোহের মামলা বোম্বাই হাইকোর্টে বালগঙ্গাধর তিলকের বিরুদ্ধে মামলা । কিন্তু কলিকাতা হাইকোর্টে ঐ জাতীয় প্রথম মামলা হইতেছে 'বঙ্গবাসী' নামক সাপ্তাহিক পত্রের বিরুদ্ধে মামলা । ব্রিটিশ সরকার কর্তৃক হিন্দু ধর্মে হস্তক্ষেপকারী কোন বিশেষ আইন প্রবর্তনের ফলে কলিকাতার 'বঙ্গবাসী' পত্রিকা ব্রিটিশ সরকারকে আক্রমন করিয়া ধারাবাহিকভাবে লিখিতে থাকে । ইহার ফলে ঐ পত্রিকার সম্পাদক প্রভৃতি রাজদ্রোহ অপরাধে অভিযুক্ত হন । বঙ্গভাষায় লিখিত আপত্তিকর মন্তব্যের সরকারী অনুবাদকের দ্বারা ইংরাজীতে অনূদিত অংশের উপর ভিত্তিস্থাপন করিয়া সরকার কর্তৃক মামলা রুজু হইয়াছিল । মূল বাঙ্গালা মন্তব্যের একস্থানে ছিল :- ' আমরা কি শাস্ত্রজ্ঞানে জলাঞ্জলি দিয়া খৃস্টান হইয়া যাইব ? কিন্তু সরকারী অনুবাদক জলাঞ্জলি দিয়া শব্দদ্বয়ের আক্ষরিক অনুবাদ করিয়া বাক্যটি এইভাবে ইংরাজী করিয়াছিলেন:- 'Shall we throw a handful of water to our belief in Shastras and become christians?'

আসামী পক্ষের ব্যারিস্টার নর্টন সাহেব এই ভুল অনুবাদটির দিকে বিচারকের দৃষ্টি আকৃষ্ট করেন এবং তাঁহাকে বুঝাইয়াদেন যে , এইরূপ বহু ভুল সমগ্র ইংরাজী অনুবাদটিতে থাকিতে পারে । তাঁহার মতে , যেহেতু বাঙ্গালা মন্তব্যগুলিতেই রাজদ্রোহের অপরাধ করা হইয়াছে একথা সরকার পক্ষ বলিতেছেন , অতএব সেইগুলির ভুল ইংরাজী অনুবাদের উপর ভিত্তিস্থাপন করিয়া আসামীদিগকে উক্ত অপরাধে দোষী সাব্যস্ত করা চলেনা । ইহার ফলে আসামীরা মুক্তিলাভ করেন । অধ্যাপক প্রভাতকুমারের মুখ হইতে উক্ত ঘটনাগুলি আমরা শুনিয়াছি ।

আবার , আমরা যে প্রায়ই নিন্দাস্থলে Idiot শব্দটি ব্যবহার করিয়া থাকি তাহা আদৌ সঙ্গত নহে , ইহা Idiot like হইবে।

[চি]কিৎসক ও আইনজ্ঞ ব্যতীত সাধারণ লোক Idiot শব্দটির অর্থ [জ]ানেন না। ইহার অর্থ জড় ....

.... An idiot is a person devoid of the internal faculty not able to distinguish between right and wrong ইংলণ্ডীয় ও বর্তমান ভারতীয় ফৌজদারী আইনেও কোন অপরাধীর Idiocy (অর্থাৎ জড়ত্ব) নিঃসংশয়ে প্রমানিত হইলে কোন দণ্ড হয় না। ব্যারিষ্টারী পড়িবার সময় ইংলণ্ডে থাকার কালে অধ্যাপক প্রভাতকুমারের একটি Idiot এর খুনের দায় হইতে নিষ্কৃতির নিম্নলিখিত ঘটনাটি ঘটিয়াছিল এবং তিনি ফৌজদারী আইন অধ্যাপনাকালে ল কলেজে ইহা আমাদিগকে বলিয়াছিলেন।

বিলাতে mess কে clummery বলে। লণ্ডনের একটি Clummery তে কতকগুলি অফিসে কাজ করা লোক ও তাহাদের আশ্রয়ে একটি idiot থাকিত। একদিন সেইগুলির মধ্যে একজন অসুস্থ হইয়াছিল। তাই দুপুর বেলা সে ও idiot টি মাত্র clummery তে ছিল। অন্য সকলে অফিসে গিয়াছিল। অফিস হইতে প্রথম প্রত্যাগত ~~হয়ে~~ লোকটি ~~x~~ দেখিতে পাইল যে ~~xxxxxxxxxxxx~~ তাহাদের অসুস্থ শয্যাশায়ী বন্ধুটির গলা কাটা। ইহাতে বিস্মিত হইয়া সে idiot কে ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করায়, idiot তাহাকে চুপ করিতে বলিল, কারণ সে তখন ঘুমাইতেছে এবং যখন সে জাগিয়া উঠিয়া মাথার খোঁজ করিবে তখন ভারি মজা হইবে। তাহার পর সে সেই কর্তিত রক্তপ্লুত মুণ্ডটি আনিতে গেল। আদালতে idiot টি খুনের দায় হইতে idiocy 'র জন্য নিষ্কৃতি পাইল।' ১৪১

অধ্যাপক প্রভাতকুমারের কোন এক ক্লাসে বিবৃত গল্পগুলি তাঁর তিরোধানের প্রায় ছত্রিশ বছর পরেও ছাত্র স্মরণে রেখেছে। প্রভাতকুমার idiot কথাটির প্রকৃত তাৎপর্য্য বুঝাতে গিয়ে যে ঘটনাটির উল্লেখ করেছেন তাতে সহজেই অনুমান করা যায় তাঁর শিক্ষণ পদ্ধতিটি কত সহজ এবং সুন্দর ছিল।

যৌবনে প্রভাতকুমার একবার রবীন্দ্রনাথকে লিখেছিলেন এম.এ. পাশ করে কোন কলেজে অধ্যাপক হতে পারলে তিনি প্রচুর অবসর পাবেন এবং মাতৃভাষার সেবায় নিজেকে সম্পূর্ণভাবে নিয়োজিত করতে পারবেন। তাঁর সেই প্রথম জীবনের স্বপ্ন এসময় থেকে সফলতার পথ খুঁজে পায়। আইন কলেজের অধ্যাপনা এবং অবসর সময়ে সাহিত্যসেবা তাঁর মুখ্য কর্ম হয়ে ওঠে। 'মানসী ও মর্ম্মবাণী'র সম্পাদনা ভার নেবার ~~xx~~ সঙ্গে সঙ্গে তাঁর ধ্যান জ্ঞান হয়ে ওঠে

কিভাবে পত্রিকাটিকে সর্বাঙ্গসুন্দর করা যায় । মহারাজের নাম পত্রিকাটির সম্পাদনার ব্যাপারে যুক্ত থাকলেও প্রকৃতপক্ষে তাঁকেই সম্পাদকের সমস্ত গুরুদায়িত্ব পালন করতে হতো । প্রকাশের জন্য গল্প বাছাইকরা, বুক যোগাড় করা, প্রুফ দেখা প্রায় সব কাজই তাঁকেই করতে হতো । তাছাড়া তিনি ছিলেন অত্যন্ত দরদী - সম্পাদক। তাই নূতন লেখকরা যাতে তাদের প্রতিভা বিকাশের সুযোগ তার পত্রিকা মারফৎ পান সেদিকেও তাঁর সজাগ দৃষ্টি ছিল । সেকালের কত নবীন লেখককে তাঁর পত্রিকায় জায়গা করে দিয়েছেন, তার ইয়ত্তা নাই । নূতন লেখকের লেখায় কোন ভুল ত্রুটি থাকলে নিজ হাতে তিনি সেসব শুধরে দিতেন অথবা লেখককে দিয়ে বার বার লিখিয়ে, ব্যক্তিগতভাবে নানা পরামর্শ দিয়ে তিনি সেগুলিকে প্রকাশযোগ্য করে তুলতেন । তাঁর এই সংবেদনশীল মনের পরিচয় দিতে গিয়ে বর্ত্তমান কালের কথা সাহিত্যিক শ্রীবিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায় লিখেছেন —

' ১৯১৭ - ১৮'র মধ্যেকার কথা ।'দাদা' বলে আমার একটি গল্প মানসী ও মর্ম্মবাণীতে প্রকাশিত হওয়ার পর উৎসাহিত হয়ে আমি আর একটি গল্প কিছুদিন পর পাঠালে গল্পটি অমনোনীত হয়ে ফেরৎ আসে । তবে রূঢ় হ্রস্ব একটি'না'র লাঞ্ছনা গায়ে নিয়ে নয় । সঙ্গে প্রভাতকুমার বাবুর একখানি চিঠি । লিখেছেন - গল্পটি এমনি ভালই হয়েছে, তবে যেখানে Love interest ফোটাবার চেষ্টা করেছেন সেখানটা একটু অস্বাভাবিক হয়ে গেছে । মনে পড়ে এই পর্য্যন্ত পড়ে খুবই দমে যেতে হয়েছিল । লভ - বস্তুটি জীবনেও জুটছে না, আবার সাহিত্যেও দাঁড় করাতে পারছিনা — এ যে দু'দিক থেকে মারা যাওয়ার লক্ষণ !

দমেই গেছি, তারপর পরের লাইনটির উপর দৃষ্টি পড়ল । লিখেছেন — কিন্তু 'দাদা' গল্পের লেখকের আশা আমরা সহজে ছাড়তে পারবনা ।'

অথচ 'দাদা' গল্প আমার তেমন কিছুই নয় । ভাবালুতার বয়স সেই ধরণেরই একটি দুর্বল গল্প । নিতান্তই কাঁচা হাতের প্রয়াস, বোধহয় কুণ্ঠা কাটিয়ে এখন পর্যন্ত কোন বইয়ে নেওয়া হয়নি ।

তাহলেও এই সহৃদয়তায়, সামান্যের প্রতিও এই courtesy এটুকু আমার গতিপথে তো অনেকখানিই প্রেরণা জুগিয়েছিল, নৈলে সেদিন সৌজন্য হিসাবেও 'দাদা'র লেখকের আশা উনি ধরে না রাখলে 'দাদা' লেখককেই বোধ হয় সাহিত্যযশের সব আশা জলাঞ্জলি দিতে হোত, কে বলতে পারে ?' ১৪২

' মানসী ও মর্ম্মবাণী'র প্রতিষ্ঠাকাল থেকে বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের অন্যতম সাহিত্যিক বন্ধু শ্রীঅপূর্বমণি দত্ত তখন এই পত্রিকার নবীন লেখক।

ই সূত্রেই প্রভাতকুমারের সঙ্গে তাঁর আলাপ পরিচয় এবং অল্পদিনের মধ্যেই ই পত্রিকার লেখকগোষ্ঠীভুক্ত হয়ে পড়েন। দীর্ঘ এগারো বারো বছরকাল তিনি প্রভাতকুমারের সঙ্গে মেলামেশা করেছিলেন। অপূর্ববাবুর কাছে চিঠি লিখে শ্রীমুখোপাধ্যায় প্রভাতকুমারের এসময়ের ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবন সম্বন্ধে যে আলোকপাত করেছেন তা নিম্নরূপ :

'অপূর্ববাবুর দেওয়া পরিচিতিতে দেখছি সম্পাদক হিসাবে প্রভাতবাবু ছিলেন নবীন লেখকদের প্রতি বিশেষ সংবেদনশীল, শক্তির পরিচয় পেলে তিনি উৎসাহ দিতে কার্পণ্য করতেন না। লেখা সম্বন্ধে উপদেশ তো দিতেনই, প্রয়োজন-বোধে সংশোধন ও পরিমার্জন করেও উৎসাহিত করতেন। পদ্ধতিটা ছিল তাঁর নিজের, যতটা সম্ভব মোলায়েম এবং সরস করে তাঁর বক্তব্যটা বুঝিয়ে দিতেন।'[১৪৩]

অপূর্ববাবুর জবানীতে তিনি উদ্ধৃতি দিয়েছেন,—

' সেদিনকার কথা মনে পড়ে। একটা রোমান্টিক গল্প লিখে ফেললাম। গল্পের শেষে নায়িকাকে আফিং খাইয়ে আত্মহত্যা করানো হোল। তার এই আকস্মিক মৃত্যু নিয়ে খুব খানিকটা করুণ রসের অবতারণা করা হোল। গল্পটা প্রভাতবাবুর হাতে দিলাম।

পড়ে তিনি হেসে উঠলেন। সাধারণত তিনি ছিলেন বেশ রাশভারী প্রকৃতির লোক, হাস্যরস তাঁর লেখার মধ্যেই ফুটে বেরুতো, ঠোঁটের ফাঁকে ফাঁকে দেখা যেত কদাচিৎ। কাজেই আমার অমন করুণ রসাত্মক গল্প পড়ে তার হাসি এল দেখে হতাশ হয়ে পড়লাম। তিনি বললেন, দেখুন, রোগে, শোকে অনাহারে বহুলোক প্রতিদিন মারা যাচ্ছে, তার উপর আবার জল্লাদবৃত্তি করবার কি দরকার ? নাই বা আফিং খেয়ে মরল আপনার নায়িকা, বেঁচেবর্তে থাকুক না সে তারপর বললেন, কি দরকার করুণ রসের, বাংলা সাহিত্যে হাস্যরসটাই বরং দুর্লভ, তাই দিয়ে লিখুন না।

সাহিত্যজীবনের প্রথম অধ্যায়ে তাঁর উপদেশ শিরোধার্য করে নিয়েছিলাম।'[১৪৪]

প্রভাতকুমারের সাহিত্য আলোচনায় দেখা যাবে মাত্র দুচারটি গল্প (দেবী, ফুলের মূল্য, আদরিনী ইত্যাদি) ছাড়া সবই প্রায় মিলনাত্মক। মানুষের জীবনের শত ঝড় ঝঞ্ঝা, বিরুদ্ধ সামাজিক পরিবেশের মধ্যেও সে যে হাসতে চায় এবং হাসতে পারে প্রভাত সাহিত্য তার পরিচয় বহন করে। নিজ জীবনে প্রভাতকুমার অত্যন্ত দুঃখ পেয়েছেন, তাই দুঃখ কারও জীবনে সঞ্চারিত হোক তা তিনি চাননি। ব্যক্তিগত জীবনে তিনি যেমন ছিলেন নির্বিবাদী, এবং পরমতসহিষ্ণু, একান্ত দরদী, সাহিত্যসৃষ্টিতেও তাঁর পাত্র পাত্রীরা লেখকের করুণা থেকে বঞ্চিত হয়নি।

প্রভাতকুমারের হৃদ্যতার পরিচয় দিতে গিয়ে অপূর্বমণি দত্ত আরও জানিয়েছেন —

' রামতনু লেনের সেই বাড়ীটার একতলায় ছিল মানসী প্রেস । দোতলার ওপর কয়েকটি ঘরে ছিল কম্পোজিং রুম , একটি ঘরে ছিল অফিস । সময় নেই অসময় নেই , সকাল সন্ধ্যা , বিকাল যখন তখন তাঁর সেই অফিস ঘরটিতে গিয়ে তাঁর সঙ্গে গল্পসল্প করা যেন একটা নেশার মত হয়ে উঠলো । আর কখনও কি তাঁকে এরজন্য বিরক্ত হতে দেখেছি ? হয়তো রাশিকৃত প্রুফ কিম্বা পাণ্ডুলিপি নিয়ে ব্যস্ত হয়ে রয়েছেন , যেমনি ঘরে ঢুকেছি , সেই কাগজের রাশি একপাশে সরিয়ে রেখে বাস , গল্প আরম্ভ হোল ।'[১৪৫]

প্রভাতকুমার সাধারণভাবে ছিলেন লাজুক এবং স্বল্পভাষী । বিশেষ করে অপরিচিতদের সামনে তিনি নিজেকে সবসময়ই গুটিয়ে রাখতেন । তাই আপাতদৃষ্টিতে তাঁকে দেখাত গম্ভীর , রাশভারী । সহসা কেউ তাঁর সঙ্গে আলাপ জমানোর সাহস পেতেন না । কিন্তু একটু পরিচয় হলেই তাঁর এই গাম্ভীর্যের তিরোধান ঘটতো — তখন তিনি হয়ে উঠতেন গাল গল্পপ্রিয় একান্ত মজলিসী লোক ।

ইতঃপূর্বে প্রভাতকুমার যখন গয়া থেকে এসে 'মানসী'র কার্যাধ্যক্ষ সুবোধ কুমার দত্তের বাড়ীতে উঠেছিলেন সেই সময়ে তাঁর সঙ্গে পরিচয় ঘটেছিল 'নাচঘর' পত্রিকার সম্পাদক হেমেন্দ্রকুমার রায় মহাশয়ের । কিন্তু প্রভাতকুমারের গাম্ভীর্য দেখে হেমেন্দ্রকুমার তখন বিশেষ আলাপ জমাতে পারেন নি - প্রণাম করে দূরে থেকেই সরে পড়েছিলেন । এই পরিচয়ের কিছুদিন পর প্রভাতকুমারের 'নিষিদ্ধ ফল' গল্প অবলম্বন করে 'ইন্ডিয়ান সিনেমা আর্টস' একখানি নির্বাক ছবি তুলেছিলেন । বাঘমারির স্টুডিওয় ছবিখানির প্রদর্শনীর দিন — প্রভাতকুমারও হেমেন্দ্রকুমার উভয়েই আমন্ত্রিত হয়েছিলেন । প্রদর্শনীর শেষে ফেরার পথে মানুষ প্রভাতকুমারের যে পরিচয় তিনি সেদিন পেয়েছিলেন সেই ঘটনাটি এইভাবে লিপিবদ্ধ করেছেন :

' একই মোটরে প্রভাতকুমারের সঙ্গে ফিরে আসছি , হঠাৎ তিনি আমার কানে কানে জিজ্ঞাসা করলেন , ' হেমন্দ্রবাবু , আপনি এখন কোথায় যাবেন ?

— বাড়ীতে' ।

—'নিশ্চয় নয় । আজ আপনাকে আমার ওখানে গিয়েই রাত্রের ডান হাতের ব্যাপারটা সম্পন্ন করতে হবে । যদি আপত্তি করেন সে আপত্তি মানবো না ।

সহসা এই অপ্রত্যাশিত প্রস্তাব শুনে এতই বিস্মিত হলুম যে, কোন আপত্তিই করতে পারলুম না । নীরবে তাঁর সঙ্গে গাড়ী থেকে নামলুম এবং সেইদিনই সর্বপ্রথম লাভ করলুম আসল প্রভাতকুমারের সাহচার্য । খুলে পড়লো তাঁর গাম্ভীর্যের মুখোস, পানাহারের সঙ্গে প্রাণ খুলে গল্প করতে করতে তিনি সহচরের মতো একেবারে ঘুচিয়ে দিলেন আমাদের বয়সের ব্যবধান । পরে বুঝেছিলুম তিনি মোটেই গম্ভীর নন, একান্ত মুখচোরা মানুষ, নূতনলোক দেখলে সাবধানে নির্বাক হয়ে থাকেন, নিজেকে প্রকাশ করতে পারেন না । এই জন্যেই কেউ তাঁকে কোনদিনই কোন সভায় নিয়ে গিয়ে সভাপতি করতে বা বক্তৃতা দেওয়াতে পারে নি ।' ১৪৬

এখানে হেমেন্দ্রকুমারের বিবৃতি থেকে বোঝা যায় জীবনের এই পর্বে তিনি সভা সমিতি থেকে দূরে থেকেছেন । কিন্তু রংপুর অবস্থানকালে তিনি যে রংপুর সাহিত্য পরিষৎ শাখার বার্ষিক এবং মাসিক বহু অধিবেশনে সভাপতির পদ অলংকৃত করেছিলেন তার পরিচয় আমরা পূর্বেই পেয়েছি ।

প্রসঙ্গত: উল্লেখযোগ্য এই হেমেন্দ্রকুমার তাঁর বন্ধুমহলে অন্যতম ঘনিষ্ঠ বলে পরিগণিত হয়েছিলেন এবং জীবনের শেষদিন পর্য্যন্ত সেই অন্তরঙ্গতা বিদ্যমান ছিল । 'মানসী - মর্ম্মবানী'র কার্য্যালয়ে প্রায় প্রতি সন্ধ্যায় সাহিত্যিকদের বৈঠক বসত । এখানে নিয়মিত যাঁদের যাতায়াত ছিল তাঁদের মধ্যে ছিলেন প্রেমাঙ্কুর আতর্থী, স্বর্গীয় মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়, ও শিশির কুমার ভাদুড়ী, করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়, সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত রাখালরাজ রায় বসন্ত চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি প্রথিতযশা ব্যক্তিগণ। সেইসব মজলিসী দিনের স্মৃতি রোমন্থন করতে চাপা বেদনায় হেমেন্দ্রকুমার রায় লিখেছেন —

' তারপর কত সন্ধ্যা আমার প্রভাতকুমারের সঙ্গে কেটে গিয়েছে কত আনন্দে তার আর সংখ্যাই হয় না । এক একদিন আসরে এসে হাজির হতেন স্বর্গীয় মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়, শ্রীশিশিরকুমার ভাদুড়ী ও শ্রীপ্রেমাঙ্কুর আতর্থী প্রমুখ সুধীবৃন্দ । সে সব দিনে গল্প করতে করতে আমাদের আর হুঁস থাকতো না যে, বেজে গিয়েছে কখন রাত বারোটা । প্রভাতকুমার যখন মন খুলতেন, একেবারে মজলিসী লোক হয়ে উঠতেন । আর কতরকম গল্পই তিনি জানতেন! সাহিত্যের গল্প, অন্যান্য চারুকলার গল্প, বিলাতের গল্প, সাধারণ খোসগল্প । তার উপরে পরম স্ফূর্ত্তিরে সকলকে খাওয়ানো - দাওয়ানো, আদর আপ্যায়ন। তাও অল্প উপভোগ্যছিল না । এক একদিন আলাপ করতে করতে রাত্রি এমন গভীর হয়ে উঠতো যে, তিনি আমাকে বাড়ীতে ফিরতে দিতেন না । সেদিন তাঁর সঙ্গেই এক শয্যায় শয়ন করে কাবার হয়ে যেত বাকি রাত্রিটা । এখন সে সব

কথা মনে করি আর দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে ভাবি — হায়, সাহিত্যজগতে আর প্রভাতকুমারের মত মানুষ নেই, সে সব সুখের দিন আর ফিরে আসবেনা।[১৪৭]

রামতনু বোস লেনের 'মানসী ও মর্ম্মবাণী'র অফিসে সাহিত্যিকদের যে প্রায়শঃই সমাবেশ হ'তো এবং প্রভাতকুমারের হৃদ্যতাপূর্ণ ব্যবহার যে তাঁদের সকলকেই আকৃষ্ট করেছিল তার একটি মনোজ্ঞ বিবরণ দিয়েছেন সাহিত্যিক পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়। —

'তারই পরের রবিবার বিকেল বেলা সিমলা রামতনু বোসের লেন উদ্দেশ্য করে বেরিয়ে পড়লাম। নম্বর খুঁজে বাড়ীতে ঢুকতেই চোখে পড়ল ছাপাখানা: ইতস্তত করছিলাম, এমন সময় একজন হিন্দুস্থানী এগিয়ে এসে জিজ্ঞাসা করল, কাকে চাই। প্রভাতকুমারের নাম করা মাত্র সে জবাব করল, 'দোতালা চলা যাইয়ে'।

সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠতেই সামনে যে ঘরের দরজা খোলা দেখলাম তারই সুইংডোরটা একটু ঠেলা মারতেই চোখে পড়ল এক প্রৌঢ় ভদ্রলোক টেবিলের সামনে বসে প্রুফ দেখছেন, আর ঠিক টেবিলের অপর ধারে বসে আছেন এক গৌরবর্ণা বৃদ্ধা মহিলা। একটুকু ইতস্তত করে জিজ্ঞাসা করলাম, ভিতরে আসতে পারি কি?

মাথা তুলে গম্ভীর ভাবে আমার দিকে একবার চাইলেন ভদ্রলোক। জিজ্ঞাসা করলেন, কাকে চাই?

যাঁকে চাই তাঁর নাম বলতেই তিনি স্মিতহাস্যে জবাব দিলেন, 'আমিই প্রভাত। ভিতরে আসুন,'। আমি ভিতরে ঢুকতেই জিজ্ঞাসা করলেন, 'কোত্থেকে আসছেন?'

যেখান থেকে আসছি জানিয়ে সঙ্গে সঙ্গে আমার নিজের নাম বললাম। আমার মুখের কথা শেষ না হতেই প্রভাতকুমার সাগ্রহে প্রায় চেঁচিয়ে উঠলেন, 'আরে আপনি পবিত্রবাবু, এতক্ষণ সেকথা বলতে হয়! বসুন।'

আমি এগিয়ে গিয়ে পায়ের ধুলো নিলাম। উঠে দাঁড়াবার আগে তিনি সামনে উপবিষ্টা তাঁর মার পরিচয় দিলেন। তাঁরও পায়ের ধুলো নিলাম। এবার আমি একপাশে রাখা গুটি কয়েকচেয়ারের একটিতে আসন গ্রহণ করলাম।

দোহারা চেহারার মানুষটি। মাথায় ঈষৎ টাকের আভাস দেখা দিয়েছে, ভারী মুখে ফ্রেঞ্চকাট কাঁচা পাকা দাড়ি, চোখে চশমা, পাঞ্জাবি গায়ে

ঠোট দুটো কালো হয়ে গেছে, মুখের পানে গালের একপাশ ফুলে রয়েছে। ফ্রেঞ্চকাট দাড়ি জীবনে অনেক দেখেছি কিন্তু প্রভাতকুমারের মুখে তা এমন বিশেষত্ব অর্জন করেছিল যে, প্রথম দর্শনেই তার একটা ব্যক্তিত্বের সুস্পষ্ট ছাপ আমার কাছে ধরা পড়ল।

হাত থেকে কলমটা নামিয়ে রেখে প্রভাতকুমার চেয়ারে হেলান দিয়ে বসলেন, চেয়ারটা একটু ঘুরিয়ে নিলেন আমার দিকে। বললেন, ' পরিমলবাবুর চিঠিতে জানলাম আপনার চাকুরী হয়েছে চৌধুরী মশায়ের ওখানে। কিন্তু কই, আপনি তো আমাকে সে কথা জানান নি।

'নিজে এসে সাক্ষাতে জানাব এই ইচ্ছে ছিল।' আমি সঙ্কুচিত হয়ে জবাব দিলাম।'

' খুব খুশি হয়েছি, বললেন প্রভাতকুমার।' চৌধুরী মশায় চমৎকার মানুষ, তার উপর সেখানে বিদগ্ধজনের সমাবেশ।

আমি নীরবে তাঁর কথায় সায় দিলাম।

মা উঠে দাঁড়ালেন, ' আমি যাই প্রভাত, চা পাঠাবার ব্যবস্থা করি গে।'

মা বেরিয়ে যেতেই প্রভাতকুমার দেরাজ থেকে একটা চুরুট বার করে ধরালেন, আর একটা আমার দিকে এগিয়ে দিয়ে বললেন' চলবে নাকি ?

আমি অবশ্য তাঁকে প্রত্যাখ্যান করলাম না।

চুরুটে একটা টান মেরে তিনি বললেন, 'সবুজপত্র'এর সংশ্লিষ্ট সকলের সঙ্গে আলাপ হয়েছে নিশ্চয়।'

' সকলের সঙ্গেই হয়েছে বলতে পারি না, তবে হয়েছে কারো কারো সঙ্গে, আমি জবাব দিলাম।

খুব ভাল কথা'।

'সাহিত্য পরিষদে গিয়েছিলাম একদিন। রামেন্দ্রসুন্দর ও আরও অনেকের সঙ্গে আলাপ হয়েছে সেখানে' আমি বললাম।

চোখদুটি বিস্ময়ে সঙ্কুচিত করে প্রভাতকুমার বললেন, 'বা:, আপনি তো সব দিকে আসর জমিয়ে নিচ্ছেন! সাহিত্য পরিষদ গোষ্ঠীর সঙ্গে বা আমার সঙ্গে মেলামেশায় চৌধুরী মশায় আপত্তি করবেন না ?

' আপত্তি করবেন কেন ? আমি বিস্ময়ে হতবাক হলাম ।

' আছে ভায়া আছে । কি সাহিত্যে , কি সমাজ জীবনে তাঁরা হলেন উপর তলার লোক । ফালতু সমাজে তাঁদের কেউ মেলামেশা করলে তাঁদের একটু মর্যাদা হানি হয় বই কি ।'

অনুমান করলাম নিশ্চয়ই কোথাও একটু ক্ষত আছে । মুখে বললাম ' কিন্তু আমি তো সব চেয়ে ফালতু ।'

এমন সময় দরজা ঠেলে একটি যুবক এসে ঢুকল , দু - হাতে দু থালা খাবার নিয়ে এসে আমাদের দুজনার সামনে ধরে দিয়ে বিনা বাক্যব্যয়েই বেরিয়ে গেল ।

' এটি আমার ছোটছেলে , ' বললেন প্রভাতকুমার , চাকর বাকর দিয়ে খাবার পরিবেশন করা মা অপছন্দ করেন । আর আমার ঘরে মা ছাড়া দেখা-শুনা করার আর কেউ নেই , তা জান বোধ হয় ।'

দু'চারটি কথার ফাঁকে লুচি আলুর দম পটল ভাজা শেষ করে ফেললাম । থালার একপাশে একটু লেবুর আচার রাখা ছিল , তার স্বাদে ভোজনপর্ব মধুরেণ সমাপ্ত হল ।

চায়ের কাপ অর্ধেক প্রায় শেষ হয়েছে এমন সময় দরজা ঠেলে একজন এসে ঢুকলেন ।' আমার চা কই প্রভাতদা ?'

' আরে এসো করুণা , ভিতরে এসো'। বললেন প্রভাতকুমার ।'চা কি তোমার জন্য দরজায় সাজিয়ে রেখে দেবো !'

হো হো করে হেসে উঠলেন করুণানিধান ।

' আগে কবিতা তারপর চা ,'প্রভাতকুমার হাসি মুখে হুকুম চালালেন ।

গলাবন্ধ ছিটের কোট গায়ে , একমুখ কালো দাড়ি , সমান করে ছাঁটা চুল , কেশ-প্রসাধনের বালাই নাই । চোখেমুখে সারল্যের প্রতিমূর্তি ।

' ইনি কবি করুণানিধান ,' প্রভাতদা পরিচয় করিয়ে দিলেন ।

আর ইনি ?'চোখে মুখে হাসি ছড়িয়ে দিয়ে প্রশ্ন করলেন কবি।

'ইনি পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায় । তোমাদেরই দলের লোক , সবুজপত্র'এ প্রমথ চৌধুরীর সহকারী ইনি ।'

' বটে !' মুখে তাঁর হাসি লেগেই আছে ।'তা তুমি কবি নও , সে তো প্রভাতদা বলেই দিলেন । তবে আমাদের দলের যখন , তখন এক সঙ্গে মিলে আর এক কাপ চা খেয়ে নাও ।'

' এবার অনেক কাপই লাগবে বললেন প্রভাতদা ।'সিঁড়িতে পদধ্বনি শোনা যাচ্ছে ।'

বেশ
' আড্ডা তো জমেছে দেখছি', বলতে বলতে যিনি ঘরে ঢুকলেন তাঁকে দেখলাম করুণানিধানের বিপরীত সম্পূর্ণ মূর্তি । সুবিন্যস্ত বাবরি চুল , পরিষ্কার কামানো মুখে সযত্নরক্ষিত নুর , ধবধবে পাঞ্জাবির উপর ঢাকাই চাদর জড়ানো । সোজা এসে চেয়ারে বসে পড়লেন ।

' কবিতে কবিতে ধুন পরিমান', বললেন প্রভাতদা ।

' মাত্র দুজন', বললেন করুণানিধান , 'পবিত্রবাবু কবি নন , আপনি আগেই বলেছেন ।'

' ইনি পবিত্রবাবু' ? জিজ্ঞাসা করলেন নবাগত যুবক ।

প্রভাতকুমার বললেন , 'দেখ করুণা , দেখ বসন্ত , পবিত্রর সম্মানে আমি আপাতত: প্রুফ দেখা স্থগিত রেখেছি , তার ক্ষতিপূরণ করে আর পবিত্রর সম্মান বজায় রেখে তোমরা এই মুহূর্তে আগামী সংখ্যার কবিতা বের করে দাও ।'

বলা মাত্র বসন্তবাবু পকেট থেকে একতাড়া কাগজ বার করে প্রভাতদার সামনে এগিয়ে দিলেন , ' ক'টা কবিতা চাই , বেছে নিন ।'

বসন্ত চাটুজ্যের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে আমি পারবনা', হেসে উঠলেন করুণা-নিধান , ' আমায় আরও দুদিন সময় দিতে হবে — প্রভাতদা ।'

' হার মানলে ?' বললেন প্রভাতদা ।

'মানলাম' , হেসে করুণা নিধান ঘাড় নাড়লেন , পবিত্রসাক্ষী '

' কিন্তু পবিত্রবাবুর সঙ্গে আমাকে তো আমাকে কেউ পরিচয় করিয়ে দিলেন না? বসন্তকুমার একবার প্রভাতকুমার আর বার করুণানিধানের দিকে তাকালেন ।

'ও সব সাহেবীয়ানা তোমায় মানায় না যে, ইন্ট্রোডিউস্ করিয়ে দিতে হবে।' প্রভাতদা টিপ্পুনি কাটলেন।

....

এমন সময় দরজা ঠেলে শশব্যস্তে ঘরে ঢুকলেন আর একটি ফ্রেঞ্চকাট দাড়ি, ছোটখাট পাতলা মানুষটি পাঞ্জাবি চাদরে বসন্তকুমারের পুনরাবৃত্তি, হাতে অতিরিক্ত একটি ছাতা, আর চোখে কালো কাচের চশমা।

ঘরের মধ্যে ঢুকেই প্রভাতকুমারের সামনে গিয়ে দাঁড়িয়ে তিনি কি বলতে চাইলেন।

'বসো' বললেন বসন্তকুমার।

'একটুকুও সময় নেই, চারুর বাড়ী এখুনি যেতে হবে। জানাতে এলাম, আজকে কবিতা দেবো, কথা দিয়েছিলাম কি-না। কবিতা লেখা হয়ে গেছে, কিন্তু ঘসামাজা করে আপনাকে দিতে দু - একদিন দেরী হবে।'

'তাই দিও। তুমি তো আবার সে বিষয়ে অত্যন্ত পার্টিকুলার।'

সঙ্গে সঙ্গে তিনি বেরিয়ে গেলেন। ঘরে আর কারুর অস্তিত্ব লক্ষ্যই করলেন না যেন।

....

....

এমন সময় দরজা ঠেলে আর এক ভদ্রলোক ঢুকলেন। এঁরও একমুখ দাড়ি। শীর্ণকায় রুগ্নমূর্তি। 'সত্যেনবাবু হন্ হন্ করে চলে গেলেন ব্যাপার কি? একবার ফিরেও তাকালেন না!' বলতে বলতেই তিনি একটা চেয়ার অধিকার করলেন।

'সত্যেনকে তো তুমি জান রাখাল,' বললেন প্রভাতকুমার। 'অত্যন্ত কর্তব্যপরায়ণ লোক, ভদ্রতা করার চেয়ে কথা রাখার দাম ওর কাছে বেশী, আর তাছাড়া, এখানে সকলেই ওঁর বন্ধু, দেখানোভদ্রতার কোন প্রয়োজন নেই এখানে।' ১৪৮

সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত এসেছিলেন 'মানসী ও মর্ম্মবাণী'র জন্য কবিতা দিতে। কিন্তু কবিতাটি ঘসামাজা করে ঠিক করে উঠতে পারেন নি দেখে প্রভাতকুমারকে জানিয়ে গেলেন। প্রভাতকুমার বলেছিলেন সত্যেন্দ্রনাথের ধর্ম্ম, কথা দিয়ে কথা রাখা তাই তাকে জানাতে এসেছিলেন, কবিতা শেষ হয়নি বলে। কিন্তু সেখানে উপস্থিত রাখালরাজ রায় সত্যেন্দ্র নাথের এই আগমনকে কথা দিয়ে কথা রাখা হয়নি বলে প্রতিবাদ জানালেন।

' রাখাল , তুমি , স্কুলে মাস্টার , ' হেসে বললেন প্রভাতদা । ' কারকত-টুকু টাস্ক হয় নি তার জন্য ইউ মাস্ট টেক হিম টু টাস্ক -। কেন হয়নি তা তোমার কাছে অবান্তর । তাছাড়া , তুমি সমালোচক , সাহিত্যের সমালো-চনায় তোমার আনন্দ আর সাহিত্যিকদের সমালোচনা তোমার স্বভাব ।'

' সমালোচনা আমার পেশা নয় , ' মন্তব্য করলেন রাখালবাবু

'কিন্তু পেশাদারদের চেয়ে আপনার নেশা বেশী' , হেসে বললেন করুণানিধান করুণানিধান ।

' কে নেশা - কর , আর কে পেশা-কর সে ঝগড়া এখন থাক , ' বললেন প্রভাতকুমার ।

করুণানিধান ও বসন্তকুমার হেসে উঠলেন , কিন্তু রাখালবাবু যেন আরও গম্ভীর হয়ে গেলেন । তোমার এসব ছ্যাবলামি মানায় না প্রভাত !'

' পড়েছি পিউরিটান xxxx স্কুলে মাস্টারের পাল্লায় ,' হেসে উঠলেন প্রভাতদা । আমার দিকে চেয়ে বললেন , বুঝলে পবিত্র , লোকটিকে চিনে রাখ । কড়া মাস্টার , পাকা পিউরিটান আর ব্যাচেলার ইন্ দি স্ট্রিকেস্ট সেন্স অফ দি টার্ম ।'

' তা হলে সত্যি উনি নমস্য , ' আমি বললাম ।

'নমস্য তো বটেই, বললেন প্রভাতদা । তবে কি জান পবিত্র , ওঁর জন্য দুঃখ হয় । জড়ভরতের মত সংসার ত্যাগ করেও মায়ার বন্ধনে জড়িয়ে আছে , বিয়ে করেনি , কিন্তু পরের ছেলেকে পুত্রবৎ পালছে । তাছাড়া , বিহার গভর্ণ-মেন্টের স্কুলে মাস্টারী উপলক্ষে কত স্কুলেই ও বদলি হয় , সব জায়গায় ছাত্রদের নিয়ে ও তাদের বাপেদের চেয়েও মাথা ঘামায় ।'

' প্রকৃত আদর্শবাদী পুরুষ , ' বললেন বসন্তকুমার ।

'বুঝলাম কিন্তু তার xxx কে দায় দেয় , বল ভাই আজকে ?' বলতে বলতে প্রভাতদা গম্ভীর হয়ে গেলেন -।

.....

..... প্রভাতদা সামনের ডিবে থেকে এক সঙ্গে গণ্ডাখানেক পান মুখে পুরে দিলেন , গালের একটা পাশ আবার ফুলে উঠল, আর একটা টিনের কৌটা থেকে আঙুলে করে খানিকটা কিমাম চেটে নিলেন।' ১৪৯

..... এমন সময় আরও একজন ঘরে এসে বসলেন । বাঁকড়া চুল তবে গোঁফ দাড়ি একেবারেই কামানো । সোজা এসে প্রভাতদার টেবিল থেকে পানের ডিবেটা খুলে সেটাও গোটা দুই পান মুখে দিলেন । বেশ বোঝা গেল , পান তাঁর মুখে আগেও ছিল । কিমাম নিতেও ভুল হল না । উপরন্তু নিজের পকেট থেকে জর্দার কৌটা বার করে খানিকটা জর্দাও মুখে পুরলেন ।

'এসো কবিবর', বললেন প্রভাতকুমার । তোমার বইয়ের কদ্দুর ?'

'ছাপার কাজ চলছে', কবি জবাব দিলেন ।

' দ্বিজেনবাবুর কাব্যগ্রন্থের শুনলাম নামকরণ করেছেন' একতারা', বললেন করুণানিধান ।'বড় ভালো লেগেছে নামটি আমার । একতারার সুরের মধ্যে বাংলার চির - বিরাগী - উদাসী মনের অপূর্ব মিলন রয়েছে ।' [১৫০]

এরপর পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায় অনেকদূর যেতে হবে বলে উঠার তোড়-জোড় করেন ।

' আবার কবে আসছ ভাই ,' জিজ্ঞাসা করলেন প্রভাতদা ।

'সুযোগ পেলেই চলে আসব । এমন সুধী সমাবেশ , লোভ ত আমার প্রবল ।'

' আমাদের আড্ডা এখানে রোজই জমে' বললেন বসন্তদা ,

'সুযোগ পেলেই চলে আসবে ।' [১৫১]

পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়ের দেওয়া 'মানসী ও মর্ম্মবাণী'র অফিসের একটি সন্ধ্যার চিত্র থেকে বুঝে নিতে অসুবিধা হয় না, সেখানে নিত্যদিন কত কবি সাহিত্যিকদের আনাগোনা হত । এই সূত্রে আমরা পরিচিত হই মানুষ প্রভাত-কুমারের উন্মুক্ত উদার হৃদয়ের সঙ্গে । শুধু মাত্র সম্পাদকীয় মনোভাব নিয়েই তিনি যে 'মানসী ও মর্ম্মবাণী' পরিচালনা করতেন তা নয় । চা জলখাবারে সকলকে আপ্যায়িত করা, নিজের পানের ডিবে থেকে পান দেওয়া , অন্তরঙ্গভাবে সকলের সঙ্গে হাসি ঠাট্টার মধ্য দিয়ে ব্যক্তি প্রভাতকুমার আমাদের সামনে উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছেন ।

১৩২২ সালের ফাল্গুন মাসে মহারাজ জগদিন্দ্রনাথ রায় ও প্রভাতকুমারের সম্পাদনায় 'মানসী ও মর্ম্মবাণী' বহুচিত্র সংবলিত হয়ে বৃহৎ আকারে আত্মপ্রকাশ করে। পত্রিকা সম্পাদনার ব্যাপারে ইতিপূর্বেই প্রভাতকুমারের অভিজ্ঞতা হয়েছিল 'ভারতী'তে, সরলাদেবীর যখন পত্রিকাটির সম্পাদিকা (১৮৯৫ - ১৮৯৭ এবং ১৮৯৯ - ১৯০৭)। 'ভারতী' পত্রিকা মোটামুটিভাবে জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ীর স্নেহযত্নে লালিত পালিত এবং তখনকার লেখকগোষ্ঠী ছিলেন রবীন্দ্রভাবধারায় প্রভাবিত। প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে রবীন্দ্রনাথকে অনেকেই অনুসরণ করেছেন। 'ভারতী'র অনেক লেখক আবার 'মানসী'( )পত্রিকা প্রতিষ্ঠাকাল থেকে লেখা শুরু করেন। এঁদের মধ্যে কয়েকজনের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য — দ্বিজেন্দ্রনারায়ণ বাগচী (১৯৭৩ -১৯২৭), কবি করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৭৮ - ১৯০৫), কবি যতীন্দ্রমোহন বাগচী (১৯৭৮ - ১৯৪৮), কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত (১৮৮২ - ১৯২২) কবি কুমুদরঞ্জন মল্লিক (১৮৮২ - ১৯৭০), হেমেন্দ্রকুমার রায় (১৮৮৮ -১৯৬৩), ইত্যাদি। 'মানসী' উঠে গিয়ে যখন মানসী ও মর্ম্মবাণী'র প্রকাশলাভ করল তখন আবার দেখতে পাই তাঁরা অনেকেই সেই আসরে ভীড় করেছেন। এ থেকে বোঝা যায় 'মানসী ও মর্ম্মবাণী'র পুষ্টি কিছুটা রবীন্দ্রভাব ধারাতেই অন্ততপক্ষে রবীন্দ্রবিরোধী যে নয় সে কথা সহজেই বলা যায়। অবশ্য এর মধ্যে ব্যতিক্রমও রয়েছে কারণ রবীন্দ্রনাথকে প্রথম জীবনে অনুসরণ করলেও এ পর্যায়ে পৌঁছে তাঁরা স্বকীয় রচনাশৈলীতে অনেকেই বিশিষ্টতা অর্জন করেছিলেন — এ প্রসঙ্গে স্বয়ং প্রভাতকুমারের নাম উল্লেখ করা যেতে পারে।

বাংলার সাময়িক সাহিত্য পত্রিকার ইতিহাস আলোচনায় আমরা দেখতে পাই বিভিন্ন সময়ে বিশেষ ব্যক্তিত্বের সম্পাদনায় যখন সাহিত্য -পত্রিকা আত্মপ্রকাশ করেছে সেখানে একটি বিশেষ সাহিত্যিকদল গঠিত হয়েছে। বঙ্কিমচন্দ্রের দল গঠন হয়েছে 'বঙ্গদর্শন'এ রবীন্দ্রনাথের 'সাধনা'তে, প্রমথ-চৌধুরীর 'সবুজপত্র'তে। আবার ভারতীতে দেখি রবীন্দ্রনাথের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করতে গিয়ে সেখানেও এক অন্তরঙ্গ বন্ধুগোষ্ঠী গড়ে উঠেছে। 'নাটোরের মহারাজা জগদিন্দ্রনাথ রায় ছিলেন' মানসী'র গোষ্ঠীপতি। এখানে প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় প্রমুখ রবীন্দ্রঅনুরাগীর একাধিপত্য ছিল। .... 'মানসী - গোষ্ঠী কখনও রবীন্দ্র - বিরুদ্ধবাদী হয় নাই। তবে 'মানসী'র সাহিত্যচিন্তা পুরাতন ধারাই অনুসরণ করিয়াছিল। সেইজন্য রবীন্দ্রনাথের নূতনতর সাহিত্য সৃষ্টিতে 'মানসী' গোষ্ঠী সর্বদা খুব উৎসাহ বোধ করে নাই।[১৫২]

এ সময়ে আমরা দেখি একদিকে যেমন রবীন্দ্রানুসারী সাহিত্যিক গোষ্ঠী সৃষ্টি হয়েছে আবার অন্যদিকে ইতিমধ্যে রবীন্দ্র-বিরোধী গোষ্ঠীরও আবির্ভাব ঘটেছে। সুরেশচন্দ্র সমাজপতি শাসিত 'সাহিত্য'-গোষ্ঠী এদের মধ্যে অন্যতম। 'সাহিত্য' ছিল অনেকাংশে রবীন্দ্রবিরোধী, সুরেশ-সমাজপতির লেখনী রবীন্দ্রনাথ বা রবীন্দ্রভক্তদের তীব্র ভাষায় আক্রমণ করতে কোন কোন সময়ে কার্পণ্য করেনি। সুরেশচন্দ্রের সমালোচকের সূক্ষ্মদৃষ্টি ছিল, কিন্তু সবসময় তিনি নিরপেক্ষ ছিলেন না এবং ব্যক্তিগত আক্রোশের জন্যও তিনি অনেক সময় কর্তব্যভ্রষ্ট হয়েছেন। প্রসঙ্গত মনে পড়ছে সামান্য অনবধান-তার জন্য প্রভাতকুমারও একবার সমাজপতির লেখনীমুখে কিভাবে আক্রান্ত হয়েছিলেন।

বৈশাখ, ১৩২৩' সাহিত্য' পত্রিকায় কৈফিয়ৎ এই শিরোনামায় সাহিত্য সম্পাদক সুরেশচন্দ্র সমাজপতি লিখেছেন —

' সাহিত্যের বৈশাখ সংখ্যা সময়মত প্রকাশ করিতে পারি নাই – তজ্জন্য আমরা দুঃখিত, কিন্তু এই বিলম্বের জন্য অপরাধী নহি। সাহিত্যের জন্য প্রসিদ্ধ গল্প লেখক শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের ' আধুনিক রোমিও' নামক একটি গল্প উপযুক্ত পারিশ্রমিকের বিনিময়ে পূর্ব্বে হইতে আমাদের সংগ্রহ করা ছিল। ঐ গল্পটি বৈশাখের 'সাহিত্যের প্রায় আড়াই ফর্মা ছাপা হইয়াছিল। মুদ্রিত হইবার পর দেখা গেল, গল্পলেখক মহাশয়' নিষিদ্ধ ফল' এই পরিবর্তিত নামে ঐ গল্পটি চৈত্রের 'মানসীতে' প্রকাশ করিয়াছেন। প্রভাতবাবুর কার্য্য অসঙ্গত ও আইন বিরুদ্ধ হইয়াছে কিনা, অন্যত্র তাহার বিচার হইবে। এস্থলে আমাদের নিবেদন এই যে, মানসীতে গল্পটি ঐভাবে প্রকাশিত হইবার পর আমরা ঐ মুদ্রিত ফর্মাগুলি নষ্ট করতে বাধ্য হই, এবং কয়েকটি ফর্মা নূতন করিয়া ছাপিতে হইয়াছে। ইহাই আমাদের কৈফিয়ৎ। আশা করি, গ্রাহকবর্গ বিলম্বের ত্রুটি মার্জনা করিবেন।

সাহিত্য সম্পাদক।'[১]

' সাহিত্য পত্রিকায় এই ধরণের মন্তব্য দেখে নিশ্চয় প্রভাতকুমার কুন্ঠিত হয়েছিলেন এবং মানসী'তে'নিষিদ্ধ ফল' প্রকাশের কারণ দেখিয়ে সম্পাদক মহাশয়কে একটিচিঠি দেন। পরবর্তী মাসের সাহিত্য সংখ্যায় (জ্যৈষ্ঠ, ১৩২৩, পৃ: ১৪৮) সমাজপতি মহাশয় প্রভাতকুমারের সেই চিঠিটিকেও প্রকাশ করেন -

শ্রীযুক্ত প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় মহাশয় আমাদিগকে নিম্ন লিখিত পত্রখানি লিখিয়াছেন, —

১৭.৬.১৬

সবিনয় নিবেদন ,

আপনার দুইখানি পত্রই পাইলাম । ১৩২১ আশ্বিন সংখ্যার পর আর কোন সাহিত্য অদ্যাবধি আমি পাই নাই , শুনিলাম , সাহিত্য আর বাহির হইবে না । আধুনিক রোমিও গল্পটি আপনার কাছে দেড় বৎসর যাবৎ ধরিয়া পড়িয়া থাকিবার পর 'সাহিত্য' আর বাহির হইবার আশা নাই মনে করিয়া গল্পটি মানসীতে ছাপিয়াছিলাম ।

যাহা হউক , ঐ গল্পের পরিবর্তে আর একটি গল্প আপনাকে দিব — উহা পক্ষকাল মধ্যে আপনাকে পাঠাইব। আপনার প্রাপ্য বাকী দুইটি গল্প দুই মাস মধ্যে আপনাকে দিব ।

বিনীত

শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় ।'

কোন কারণ বশতঃ চিঠি অনুসারে একপক্ষকালের মধ্যে প্রভাতকুমার সমাজপতি মহাশয়কে গল্প পাঠাতে পারেননি । তাই দেখা যায়' সাহিত্য শ্রাবণ,১৩২৩ সংখ্যায়(পৃঃ ২৮৬) সমাজপতি মহাশয় লিখেছেন —

' জেরের জের ।

শ্রীযুক্ত প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় মহাশয়কে রেজিষ্টারী করিয়া যে পত্র লিখিয়াছিলাম , তাহা এই , —

গত ১৭ই জুন তারিখে আপনি লিখিয়াছিলেন —'একপক্ষকাল মধ্যে' আমাকে একটি গল্প পাঠাইবেন । অদ্য ১৭ই জুলাই।দুইপক্ষ অতীত হইল। স্মরণার্থ লিখি ইতি ১৭/৭/১৬

তাহার পর আরও দুইপক্ষ অতীত হইয়াছে । আমি গল্প বা পত্রের উত্তর পাই নাই ।

শ্রীসুরেশ চন্দ্র সমাজপতি ।'

এখানে কথা দিয়েও কথা না রাখতে পারার মধ্যে প্রভাতকুমারের একটু দুর্বলতা প্রকাশিত হলেও , সমাজপতি মহাশয় যে পাঠকবর্গের সামনে তাঁকে হীন প্রতিপন্ন করার চেষ্টা করেছেন সেই প্রচেষ্টাকে প্রশংসা করা যায় না ।

প্রভাতকুমার যখন 'মানসী ও মর্ম্মবাণী' সম্পাদনার দায়িত্ব নেন তখন বাংলা পত্রিকার - আসর মূলত: দুইটি দলে বিভক্ত — রবীন্দ্রভক্তের এবং রবীন্দ্র-বিরোধী দল এছাড়া 'প্রবাসী', 'ভারতবর্ষ' - মাসিক বসুমতী' তখন সগৌরবে প্রতিষ্ঠিত।

প্রভাতকুমারের সুযোগ্য পরিচালনায় এবং জগদিন্দ্রনাথের আনুকূল্যে কিছুদিনের মধ্যেই 'মানসী ও মর্ম্মবাণী' জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। বিশেষ মতবাদ প্রচারের চেষ্টা না থাকায় - সচিত্র ভ্রমন কাহিনী, সুখপাঠ্য গল্প ও উপন্যাস, আবেগবহুল কবিতা সমৃদ্ধ পত্রিকাখানি সাধারণ পাঠকের মনকে সহজেই আকর্ষণ করেছিল। প্রথমদিকে প্রায় সংখ্যাতেই প্রভাতকুমারের কিছু না কিছু রচনা থাকতো যেমন — নিষিদ্ধ ফল (ফাল্গুন, ১৩২২), সখের ডিটেকটিভ (শ্রাবণ, ১৩২৩), কুকুর ছানা (আশ্বিন, ১৩২৩), সতীদাহ (বৈশাখ, ১৩২৩), সম্পাদকের কন্যাদায় (শ্রাবণ, ১৩২৪), আত্মতত্ত্ব (কার্ত্তিক, ১৩২৪), গহনার বাক্স (ফাল্গুন, ১৩২৪), বাজীকর (পৌষ, ১৩২৪) কালিদাসের বিবাহ (আশ্বিন, ১৩২৫), মাষ্টার মহাশয় (আশ্বিন, ১৩২৬)..... ইত্যাদি। এছাড়া প্রভাতকুমারের চৌদ্দটি উপন্যাসের মধ্যে পাঁচখানি ধারাবাহিক ভাবে এই পত্রিকাতেই প্রকাশিত হয়েছে। সেগুলি যথাক্রমে (১) জীবনের মূল্য (২) সিন্দুর কৌটা (৩) গরীব স্বামী (৪) সত্যবালা (৫) মনের মানুষ। অন্যান্য লেখকদের মধ্যে ছিলেন 'দু:খ দুর্গত মানুষের' দরদী কবি যতীন্দ্রনাথ সেন গুপ্ত (১৮৮৭ - ১৯৫৪), সেকালের বিহার অঞ্চলের অর্ধশিক্ষিত খয়ের - খাঁ ও হামবড়া জাতীয় ব্যক্তির সরস পরিচয়' দিয়ে লেখা 'বেহার চিত্র)' (১ম খন্ড) এর লেখক যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত, প্রগাঢ় পল্লী-প্রীতি, সরল হৃদয়ের কবি কালিদাস রায় (জন্ম ১৮৮৯), পল্লীনিষ্ঠ ও 'পুরাপুরি ভক্ত বৈষ্ণব' কবি কুমুদ রঞ্জন মল্লিক(জন্ম ১৮৮২) 'পুরাতন প্রসঙ্গের' লেখক অধ্যাপক কৃষ্ণবিহারী গুপ্ত, চৈতন্য লাইব্রেরীর প্রতিষ্ঠাতা গৌরহরি সেন, গল্প ও উপন্যাস লেখক অপূর্বমণি দত্ত, প্রভাতবন্ধু এবং কবি বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়(১৮৯০-১৯৫৯), ছন্দের যাদুকর কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, (১৮৮২ - ১৯২২), কবি ও ঔপন্যাসিক অধ্যাপক খগেন্দ্রনাথ মিত্র (১৮৮০ - ১৯৬১), গল্প ও ঔপন্যাসিক মাণিক চন্দ্র ভট্টাচার্য্য (জন্ম ১৮৮৯), সমালোচক রাখালরাজ রায়, প্রসিদ্ধ জীবনী লেখক মন্মথনাথ ঘোষ, গল্পলেখক এবং প্রভাতবন্ধু হেমেন্দ্র কুমার রায় (১৮৮৮ - ১৯৬৩) এছাড়া বেশ কিছু মহিলা সাহিত্যিক প্রায় নিয়মিত ভাবে পত্রিকাটিতে লিখতেন তাঁদের মধ্যে অন্যতম শ্রীমতী শৈলবালা ঘোষজায়া (জন্ম ১৮৯৪), শ্রীমতী মানকুমারী(১৮৬৩-১৯৪৩) শ্রীমতী গিরিবালা দেবী, শ্রীমতী অমিয়া দেবী ইত্যাদি, বিদগ্ধ এবং পরবর্তীকালে বাংলা সাহিত্যে প্রতিষ্ঠিত লেখকগণের রচনা সমৃদ্ধ পত্রিকাখানি যে সমাদর লাভ করবে এটাই স্বাভাবিক। তাছাড়া দরদী সম্পাদক হিসাবেও প্রভাতকুমার

সেকালের অনেক তরুণ লেখক লেখিকার শ্রদ্ধার্জনে সক্ষম হয়েছিলেন। তাঁদের শ্রদ্ধা-ভক্তির গভীরতার পরিচয় পাই, প্রভাতকুমারের মৃত্যুর অব্যবহিত পরে শ্রীকিরণবালা দেবী সরস্বতীর একটি রচনায় ——

' মাসিক পত্রে প্রভাতবাবুর মধুর লেখা পড়িবার জন্য কি অধীর চিত্তেই না অপেক্ষা করিতাম। পত্রখানি বাড়ীতে আসিলে মোড়ক খুলিয়া প্রথমেই দেখিতাম প্রভাতবাবুর লেখা বাহির হইয়াছে কি না, তাঁহার লেখা দেখিলেই মন আনন্দে পূর্ণ হইয়া উঠিত। কি সরল, কি স্বচ্ছ কি সরস, কি জীবন্ত সে কাহিনী। .....
....., —— আর ত' সে লেখা পড়িবার সৌভাগ্য হইবে না!
..... প্রভাতবাবু বিদায় লইয়াছেন, — রচনা করিয়া গিয়াছেন মধুচক্র, নির্দোষ, অনাবিল, মার্জিত রস সাহিত্য, যাহা অসঙ্কোচে তরুণ - তরুণীদের হাতে তুলিয়া দেখয়া যায়।

..... আমি তাঁহার স্মৃতি পূজায় শুধু এই অর্ঘ্যটুকু নিবেদন করিতে চাই যে তিনি আমাদের মত অল্প শিক্ষিতা, অন্তঃপুরচারিণীদিগকে সাহিত্য সেবায় যেরূপ উৎসাহ দিয়া গিয়াছেন, সেরূপ - উৎসাহ আর বোধ হয় আমরা পাইব না। আমরা স্কুল কলেজে পড়ি নাই, বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রীলাভ ত করি নাই — বালিকা বয়সে অবগুণ্ঠিতা বধূরূপে সংসারে প্রবেশ করিয়াছি, সেই অবধি ঘর সংসারের খুঁটিনাটী কাজ করিতে করিতেই সময় কাটিয়া গেল, বাহিরের আলোক আর পাইলাম না। নানা কাজের অন্তরালে অতি গোপনে, অতি সঙ্কোচে, কি জানি কেন আকাঙ্ক্ষা হইল, যদি কেহ বাণী মন্দিরের পথ দেখাইয়া দিত তবে দূর হইতে দুটি ভক্তি অর্ঘ্য মায়ের চরণোদ্দেশে অর্পণ করিতাম। কি দুরাকাঙ্ক্ষা! যাহার বিদ্যা নাই, জ্ঞান নাই, বাহিরের জগতের সহিত পরিচয় নাই, সে করিতে চায় সাহিত্য সেবা! প্রভাতবাবু এই শ্রেণীর মহিলাদিগকে যথেষ্ট উৎসাহ দিয়া গিয়াছেন। তিনি নিজে কষ্ট স্বীকার করিয়া ইহাদের লেখা সংশোধন করিয়া 'মানসী - মর্ম্মবাণী'তে স্থান দিয়া গিয়াছেন। কখনও অনবসরের অভিযোগ করেন নাই। বিরক্তি বা উপেক্ষা প্রকাশ করেন নাই বা ছেঁড়া কাগজের ঝুড়ির দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করেন নাই। প্রবীণ সম্পাদক মহাশয়ের কঠিন মাপ কাঠিতে আমাদের নগণ্য লেখা প্রায়ই অমনোনীত হইয়া ফিরিয়া আসে! আবর্জনা সংস্কার করিয়া উদ্ধার করিবার প্রবৃত্তি, ধৈর্য্য বা অবসর তাঁহাদের নাই, কিন্তু যতদূর জানি প্রভাতবাবু এই শ্রেণীর লেখাকে অবজ্ঞা করেন নাই, উৎসাহ দিয়া উন্নতির পথে চালিত করিয়াছেন। তাঁহার অভাবে আজ এই কথাগুলিই বার বার মনে পড়িতেছে ও মন শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতায় তাঁহার আত্মার উদ্দেশে নত হইয়া আসিতেছে। তাঁহার আত্মা চির শান্তি লাভ করুক এই প্রার্থনা।' [১৫৩]

প্রথমদিকে মহারাজ জগদিন্দ্রনাথ রায় ও প্রভাতকুমারের সম্পাদনায় 'মানসী ও মর্ম্মবাণী' কলিকাতা, ১৪ এ রামতনু বসুর লেন, মানসী প্রেসে শ্রীশীতলচন্দ্র ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত হতো। কিন্তু পরে মানসী প্রেস স্থানান্তরিত হয় ১৬/১ বিডন স্ট্রীটে এবং সেখান থেকেই পত্রিকাখানি প্রকাশিত হয়েছে। পত্রিকা পরিচালনায় মহারাজের সহযোগিতা অনেকখানি প্রেরণা জুগিয়েছিল। কিন্তু ২১শে পৌষ ১৩৩২ সালে আকস্মিকভাবে মহারাজের তিরোধান ঘটলে প্রভাতকুমার অত্যন্ত মর্ম্মাহত হয়ে পড়েন। মহারাজের সঙ্গে প্রভাতকুমার এক গভীর স্নেহের বন্ধনে আবদ্ধ ছিলেন। যদিও তিনি মহারাজ অপেক্ষা ৪/৫ বৎসরের ছোট ছিলেন তবুও আদর করে মহারাজ তাকে দাদা বলেই সম্বোধন করতেন'(যদিও তাঁহার অপেক্ষা আমি ৪/৫ বৎসরের বয়ঃকনিষ্ঠ ছিলাম তিনি আদর করিয়া আমাকে দাদা বলিতেন। [১৫৪]) জগদিন্দ্রনাথের প্রতি শ্রদ্ধা জড়িত স্মৃতি চারণ করতে গিয়ে প্রভাতকুমার লিখেছেন :—

'..... দশ বৎসর কাল তাঁহার সহিত একযোগে এই পত্রিকা সম্পাদন করিলাম, তার পরেই বিনামেঘে এই বজ্রাঘাত! ইহা আমাদিগকে ভূমিতে লুটাইয়া দিয়া গিয়াছে। বহুকষ্টে এই সংখ্যাটি সম্পাদন করিলাম, এ মাসের মলাটের উপর, দুটি নাম একত্র ছাপা হইল না — একটি নীচে পড়িয়া রহিল, অপরটি উঠিয়া গিয়াছে!

..... সামায়িক পত্রিকা পরিচালনার ভার যাঁহার উপর, তাঁহার কর্ত্তব্য কি, তাঁহার দায়িত্ব কতখানি, তাহা দশ বৎসরকাল জগদিন্দ্রনাথের পদতলে বসিয়া আমি শিক্ষা করিবার সুযোগ পাইয়াছি, তাই আশা হয়, স্বর্গলোকবাসী তাঁহার আত্মার পানে ঊর্দ্ধমুখে চাহিয়া আমি বলিতে পারিব —

তোমারি চরণ করিয়া স্মরণ চলেছি তোমারি পথে।' [১৫৫]

প্রভাতকুমার বাংলা ভাষা ও সাহিত্যকে কত গভীরভাবে ভালবাসতেন তার পরিচয় রেখে গেছেন 'মানসী ও মর্ম্মবাণীর সম্পাদনায়। 'মানসী ও মর্ম্মবানী' সত্যই তাঁর মর্ম্মবাণীর প্রকাশ। যে কোন সাহিত্যের পুষ্টিসাধনে তার অতীত ইতিহাস এবং রচয়িতাদের ইতিহাসের প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য্য। কিন্তু মাসিক পত্র পত্রিকার পাঠক সব সময়েই চায় রসাল গল্প, উপন্যাস বা কবিতা। প্রবন্ধ বা সাহিত্যিকদের জীবনী পত্রিকা পাঠকের কাছে অনেকাংশে অনাকাঙ্ক্ষিত। সুতরাং এ ধরণের রচনা পত্রিকায় স্থান পেলে ব্যবসায়িক দিক থেকে অসাফল্য আসাই সম্ভব। সাহিত্য সেবার ক্ষেত্রে প্রভাতকুমার কিন্তু এই লাভ লোকসানের হিসাব করেননি। তাঁরই আগ্রহে এবং অনুপ্রেরনায় বাংলা সাহিত্যের নিষ্ঠাবান জীবনরচয়িতা শ্রদ্ধেয় মন্মথনাথ ঘোষ বেশ কিছু

অমূল্য জীবনচরিত রচনা করেন। তন্মধ্যে, নীরবকর্মী রমাপ্রসাদ রায়ের জীবনী ১৩২৩ সালে কার্তিক, অগ্রহায়ণ মাসে মানসী ও মর্ম্মবাণীতে প্রকাশিত হয়, দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়ের জীবনচরিত ১৩২৩-২৪ সালের ছয়টি সংখ্যায় উক্ত পত্রিকাতেই প্রকাশিত হয়েছিল। মি: এডওয়ার্ড প্রণীত ডিরোজিওর জীবনচরিতে রাজা দক্ষিণারঞ্জন ও মহারাণী বসন্তকুমারীর একটি কলঙ্কিত অধ্যায় চিত্রিত হয়েছে। মন্মথবাবু ঘটনাটির প্রতিবাদ করতে চেয়েছিলেন তাঁর রচিত দক্ষিণারঞ্জনের জীবনচরিত মাধ্যমে। কিন্তু প্রতিবাদ করতে গেলে ঘটনাগুলিকে আবার বিবৃত করতে হয় তাই একটু চিন্তিত হয়ে উপদেশ প্রার্থনা করে প্রভাতকুমারকে চিঠি ~~XXX~~ লেখেন। ~~XXX~~ পত্রোত্তরে প্রভাতকুমার জানান :—

১৪/এ রামতনু বসুর লেন
কলিকাতা। ১০ বৈশাখ, ১৩২৪

" শ্রদ্ধাস্পদেষু,

রাণী বসন্তকুমারী ঘটিত ব্যাপারটি' মানসী'তে প্রকাশ করা সম্বন্ধে মহারাজের অভিমত গ্রহণ করিয়াছি। তিনি উহা একেবারেই বাদ দিতে বলেন। তিনি বলেন অপবাদ অমূলক উহা প্রতিপন্ন করিতে গিয়া, যে অপবাদ, বহুকাল বিস্মৃত এবং আধুনিক বহুলোকের অজ্ঞাত, তাহাই জাগাইয়া তোলা হইবে। তর্ক - যুক্তি - সত্ত্বেও, অনেকেই অপবাদের দিকে হেলিয়া পড়িবে, কাহারও কিছু মাত্র উপকার হইবে না, অথচ বঙ্গদেশের একটি ~~XXX~~ প্রাচীন ও সম্ভ্রান্ত পরিবারস্থ লোকদের লজ্জা ও মন:পীড়ার কারণ হইবে। আমিও মহারাজের সহিত এ বিষয়ে একমত।.......

....

ভবদীয়

শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়।' ১৫৬

উপরের পত্রাংশে জীবনী রচনা সম্পর্কে মহারাজ জগদিন্দ্রনাথ রায়ের মতের সমর্থন জানিয়ে তাঁর সূক্ষ্ম সুরুচির পরিচয়ই দিয়েছেন। অবশ্য শেষ পর্যন্ত তদানীন্তন' বসুমতী'র সম্পাদক, সুরেশ চন্দ্র সমাজপতির প্রতিবাদে কিছু পরিবর্তিত আকারে বসন্তকুমারী ~~বসুমতীর~~ ছবি ও কথা প্রবন্ধটির অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল।

এরপর 'মানসী ও মর্ম্মবাণী'তে দাদাভাই নৌরজীর জীবন চরিত এবং প্রভাতকুমারের অনুরোধে লেখা আবদুল রসুলের জীবন চরিত মন্মথনাথ লিখেছিলেন। মন্মথনাথের তিন খন্ডে রচিত অন্যতম বিখ্যাত জীবন চরিত 'হেমচন্দ্র' ও প্রভাতকুমারের প্রেরণায় লেখা হয়েছিল। মন্মথনাথ লিখেছেন —

' ..... ১৩২৪ সালের শেষভাগে প্রভাতকুমারই প্রথম আমাকে কবিবর হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের জীবনচরিত লিখিতে বলেন। আমি হেমচন্দ্রের জীবন সম্বন্ধে কিছুই জানিতাম না এবং তাঁহার কাব্যগ্রন্থাবলীও কখনও সমালোচকের দৃষ্টি দিয়া পড়ি নাই। আমি অস্বীকৃত হইলাম। দুই একজন প্রসিদ্ধতর সাহিত্যিকের নাম করিলাম এবং তাঁহাদের কাহারও দ্বারা উহা লিখাইয়া লইতে বলিলাম।.....'[১৫৭] কিন্তু প্রভাতকুমারের বক্তব্য ছিল —'..... উৎকৃষ্টতর সমালোচনা, উচ্ছ্বাসপূর্ণ রচনা হয় তো আরও অনেকে করিতে পারেন, কিন্তু কষ্ট স্বীকার করিয়া গবেষণা করিতে কেহ অগ্রসর হইবেন না।.....'[১৫৮]

প্রভাতকুমার যোগ্য ব্যক্তিকেই উপযুক্ত কাজে উৎসাহ দিয়েছিলেন। মন্মথনাথ ঘোষ রচিত 'হেমচন্দ্র' জীবনচরিত হিসাবে বাংলা সাহিত্যে আজও অমর হয়ে আছে। 'মানসী ও মর্ম্মবাণী'তেই ক্রমাগত পাঁচ বৎসরকাল (১৩২৪ - ১৩২৯) ধারাবাহিকভাবে রচনাটি প্রকাশিত হয়েছিল। রচনাটিতে প্রভাতকুমার সামান্য কিছু সংশোধন করেছিলেন। মন্মথবাবু জানিয়েছেন —

' ... 'হেমচন্দ্র' ১ম খন্ডের পান্ডুলিপি এখনও আমার নিকট আছে, তাহাতে একটি সংশোধন করিয়াছিলেন, তাহার বিশেষ উল্লেখ করা প্রয়োজন কারণ ইহা হইতে প্রভাতকুমারের রচনার আদর্শ বুঝা যাইবে। একস্থানে আমি প্রথমে লিখিয়াছিলাম, বাল্যকালে দারিদ্র্যদশায় হেমচন্দ্র পুরাতন জালার পিঠে খড়ি দিয়া অঙ্ক কষিতেন। .....

.....' জালার পিঠে কথাটি কি সাধুভাষায় ব্যবহার্য ? সন্দেহ হইল। কাটিয়া লিখিলাম ' অলিন্দের পৃষ্ঠে'। উহা প্রভাতকুমারের দৃষ্টি এড়ায় নাই, তিনি পুনরায় 'জালার পিঠে' করিয়া দিয়াছিলেন।'[১৫৯] বলাবাহুল্য প্রভাতকুমারের এই সংশোধন কতখানি যথার্থ।

এই প্রসঙ্গে স্মরণ করা যায় প্রভাতকুমার নিজেও ছিলেন গবেষক মনোবৃত্তির সাহিত্যিক। গয়ায় থাকাকালীন তিনি ঐ প্রদেশীয় কিছু ছড়া সংগ্রহ এবং সঙ্কলনের চেষ্টাও করেছিলেন।

জগদিন্দ্রনাথ একবার প্রভাতকুমারকে জানিয়েছিলেন তাঁর মৃত্যুর পর মানসীখানি যেন বন্ধ না হয়। প্রভাতকুমার তাঁর এই অভিপ্রায়কে অপূর্ণ রাখেন নি। 'মানসী ও মর্ম্মবাণী' ১৩৩৬ সালের মাঘ সংখ্যা পর্য্যন্ত চলেছিল, মহারাজপুত্র শ্রীযোগীন্দ্রনাথ রায় ও প্রভাতকুমারের যুগ্ম সম্পাদনায়।

(৯)

ল কলেজে অধ্যাপনা' মানসী ও মর্ম্মবাণী' সম্পাদনার দায়িত্বভার থাকা সত্ত্বেও প্রভাতকুমার কিন্তু সাহিত্যসৃষ্টি থেকে কখনও বিরত হননি। মনের আনন্দে নবোদ্যমে এ বয়সেও তাঁর সাহিত্য সৃষ্টিকে অব্যাহত রেখেছেন। তাঁর পঞ্চম গল্পগ্রন্থ 'গল্পবীথি' এবং চতুর্থ উপন্যাস' জীবনের মূল্য' প্রকাশিত হয় ১৩২৩ সালে কলিকাতা ২০১ কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট হইতে শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক প্রকাশিত মূল্য ১॥•'৵ গল্পবীথি'তে রয়েছে আটটি গল্প —' খোকার কান্ড' (মানসী আশ্বিন ১৩২১), 'বায়ু পরিবর্তন' (সাহিত্য, বৈশাখ, ১৩২১) 'সম্পাদকের আত্মকাহিনী' (সাহিত্য কার্ত্তিক, ১৩২০), 'যজ্ঞভঙ্গ' (ভারতবর্ষ, আশ্বিন ১৩২১), 'লেডি ডাক্তার' (মানসী, আশ্বিন ১৩২০), 'নীলুদা' (ভারতবর্ষ, কার্ত্তিক, ১৩২০), 'যুগল সাহিত্যিক' (ভারতবর্ষ, ফাল্গুন - চৈত্র ১৩২০), 'কুমুদের বন্ধু' (ভারতবর্ষ, জ্যৈষ্ঠ, ১৩২২)।

১৩২৪ সালে প্রকাশিত হয়েছে ষষ্ঠ গল্পগ্রন্থ' পত্রপুষ্প', কলিকাতা ২০১ কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট হইতে শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক প্রকাশিত। মূল্য ১॥•। পৃষ্ঠা সংখ্যা ১৯৮। গ্রন্থটিতে ছয়টি গল্প আছে। 'নিষিদ্ধ ফল' (মা: মর্ম্মবাণী, ফাল্গুন, ১৩২২), 'সখের ডিটেকটিভ' (মা: মর্ম্ম, শ্রাবন, ১৩২৩), 'কুকুর ছানা' (মা: মর্ম্ম, আশ্বিন, ১৩২৩), অদ্বৈতবাদ (মা: মর্ম্ম:, ১৩২৩), 'সম্পাদকের কন্যাদায়' (মা: মর্ম্ম., শ্রাবণ, ১৩২৪), 'সতীদাহ' (মা: মর্ম্ম, ১৩২৩)।

১৩২৬ সালে প্রকাশলাভ করে একটি মাত্র উপন্যাস 'সিন্দুর কৌটা'।

শ্রাবণ ১৩২৮ সালে প্রকাশিত হয়েছে' গহনার বাক্স ও অন্যান্য গল্প।' ...খ্যা ১৮৮। প্রকাশক শ্রীহরিদাস চট্টোপাধ্যায় গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এন্ড ...০১ কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট, কলিকাতা। এতে সন্নিবিষ্ট হয়েছে সাতটি ...নার বাক্স (মা: মর্ম্ম, ফাল্গুন, ১৩২৪), আত্মতত্ত্ব (মান মর্ম্ম, ... ডাগর মেয়ে (ভারতবর্ষ, আষাঢ়, ১৩১৫) মাষ্টার মহাশয়

(মা: মর্ম্ম: আশ্বিন, ১৩২৬) ,'নয়নমণি' (মা: মর্ম্ম: কার্ত্তিক, ১৩২৬),'বাজীকর' (মা: মর্ম্ম: পৌষ, ১৩২৪) ,'কালিদাসের বিবাহ' (মা: মর্ম্ম: আশ্বিন,১৩২৫), বৈশাখ,১৩২৮ সালে ইণ্ডিয়ান পাবলিসিং হাউস কর্ত্তৃক প্রকাশিত হয়েছে'বরোয়ারী উপন্যাস' বইটির নবম দশম এবং একাদশ পরিচ্ছেদ প্রভাতকুমার লিখিত ।

'মনের মানুষ' উপন্যাসটি প্রকাশিত হয়েছে ১৩২৯ সালে। পৌষ, ১৩৩০ সালে একটিমাত্র গল্পগ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে'হতাশ প্রেমিক ও অন্যান্য গল্প'। গল্প সংখ্যা নয়টি । ~~x~~ 'হতাশ প্রেমিকের ডায়েরি' (মা: মর্ম্ম , আশ্বিন ১৩১৯) 'কুঙ্কুম কুমারীর গুপ্তকথা' (মা: মর্ম্ম: , অগ্রহায়ণ, ১৩২৯),'হীরালাল' (মা: মর্ম্ম: শ্রাবণ , ১৩৩০) ,'প্রেম ও প্রহার' (মা: মর্ম্ম: , কার্ত্তিক, ১৩৩০),'ঔপন্যাসিক' (বঙ্গবাণী , কার্ত্তিক, ১৩৩০),'বিনোদিনীর আত্মকথা' (মাসিক বসুমতী ,আশ্বিন, ১৩৩০) ,'অদৃষ্টপরীক্ষা' (মা: বসুমতী, আষাঢ়, ১৩২৯),'জ্যোতিষী মহাশয়' (মা: বসুমতী , আষাঢ় , ১৩৩০)'

১৩৩১ সালে প্রকাশিত হয়েছে দুইটি উপন্যাস' আরতি' এবং সত্যবালা' ।

অগ্রহায়ণ, ১৩৩৩ সালে প্রকাশলাভ করে'বিলাসিনী ও অন্যান্য গল্প' এখানে নয়টি গল্প সন্নিবিষ্ট হয়েছে । 'বিলাসিনী' (সচিত্র শিশির , বড়দিন সংখ্যা, ১৩০২) ,'চিরায়ুষ্মতী' (মা: মর্ম্ম: ,আশ্বিন,১৩৩২), 'প্রজাপতির পরিহাস' (বার্ষিকবসুমতী, আশ্বিন,১৩৩২) ,'সতী' (মা: মর্ম্ম ,বৈশাখ, ১৩৩২) ,'পুলিনবাবুর পুত্রলাভ' (মা: মর্ম্ম,আশ্বিন, ১৩৩১) ,'রেলে কলিসন' (শরতের ফুল, পূজা বার্ষিকী,ভাদ্র , ১৩৩২),'গুণীর আদর' (সচিত্র শিশির, ফাল্গুন,-চৈত্র, ১৩৩০) ,'রাণী অম্বালিকা' (মা: মর্ম্ম, ফাল্গুন , ১৩৩১),'ভোজরাজের গল্প' (স্বাস্থ্য রক্ষা সম্বন্ধে 'স্বর্গের বৈদ্যের উপদেশ' নামে প্রকাশিত সচিত্র শিশির ১৩৩১)।

প্রকাশিত হয় আশ্বিন,১৩৩৪ সালে'সুখের মিলন' নামে একটি মাত্র উপন্যাস ।

'যুবকের প্রেম ও অন্যান্য গল্প'গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে ১৩৩৫ সালে । সাতটি গল্পের সংকলন । 'যুবকের প্রেম' (মা: বসুমতী , ভাদ্র - কার্ত্তিক, ১৩৩১) 'হারাধন' (ঐ, চৈত্র, ১৩৩০ থেকে বৈশাখ, ১৩৩১) ,'উপন্যাস কলেজ' (ভারতবর্ষ, অগ্রহায়ণ, ১৩৩৩) ,'পোষ্টমাষ্টার' (মা: মর্ম্ম, চৈত্র ,১৩৩০) ,'দাম্পত্য প্রণয়' (মা: বসুমতী , জৈষ্ঠ - ভাদ্র, ১৩৩২), 'সুশীলা না পিপুলা' (বার্ষিক বসুমতী, আশ্বিন, ১৩৩৩),'বিলাতী রোহিনী' (নিরুপমা বর্ষস্মৃতি, ১৩৩২)। এই বৎসর আরও দুটি উপন্যাস প্রকাশিত হয়েছে । 'সতীর পতি' (ভাদ্র,১৩৩৫) এবং 'প্রতিমা' (১৩৩৫) । এছাড়া'নূতন বউ ~~x~~ ও অন্যান্য গল্প' ১৩৩৫ সালেই

প্রকাশলাভ করে। এখানে নয়টি গল্প সন্নিবিষ্ট হয়েছে। 'নূতন বউ' (মা: বসুমতী, আশ্বিন, ১৩৩৪), 'ভুল' (নিরুপমা, বর্ষস্মৃতি ১৩৩৩), 'যোগবল না সাইকিক ফোর্স' (মা: মর্ম্মবাণী পৌষ, ১৩৩৩), 'ডোরা' (মাসিক বসুমতী বৈশাখ, ১৩৩৫), 'ঢাকার বাঙ্গাল' (মা: মর্ম্মবাণী, জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩৩), 'বেকসুর খালাস' (মা: বসুমতী আশ্বিন, ১৩৩৫), 'বাপকী বেটী' (কুন্তলীন পুরস্কার, ১৩৩৫), 'কানাইয়ের কীর্তি' (মা: মর্ম্ম, কার্তিক, ১৩৩৫) 'পরের চিঠি' (মা: মর্ম্ম, ফাল্গুন, ১৩৩৫)।

'গরীব স্বামী' উপন্যাসটি প্রকাশিত হয়েছে ২৫শে এপ্রিল, ১৯৩০ (মা: মর্ম্মবাণী, ফাল্গুন, ১৩৩৪ - ১৩৩৬), 'নবদুর্গা' উপন্যাসের প্রকাশকাল ৩১শে জুলাই, ১৯৩০ (মাসিক বসুমতী, আশ্বিন, ১৩৩৫ - চৈত্র, ১৩৩৬)

১৩৩৮ সালে প্রকাশলাভ করে 'জামাতা বাবাজী ও অন্যান্য গল্প' গ্রন্থ। গ্রন্থমধ্যে নয়টি এবং পরিশিষ্টে তিনটি সর্বমোট বারটি গল্পের সংকলন। 'জামাতা বাবাজী' (মা: বসুমতী, কার্ত্তিক, ১৩৩৭) 'দিব্যদৃষ্টি' (মা: বসু: আশ্বিন, ১৩৩৬) 'প্রেমের ইন্দ্রজাল' (পঞ্চপুষ্প, কার্ত্তিক, ১৩৩৬), 'হারানো মেয়ে সুশোভনা' (মা: বসুমতী, পৌষ, ১৩৩৬), 'ঘড়ি' (মা: বসুমতী ১৩৩৭), 'একালের ছেলে' (নিরুপমা বর্ষস্মৃতি, আশ্বিন, ১৩৩৭); 'সুধার বিবাহ' (মা: বসুমতী, বৈশাখ, ১৩৩৪), 'বি.এ. পাশ কয়েদী' (মা: বসুমতী বৈশাখ, ১৩৩৪)। পরিশিষ্ট আইনের গল্প — (ক) মাতঙ্গিনীর কাহিনী (খ) বেশ্যা খুন

সর্বশেষ উপন্যাসটি 'বিদায় বাণী' তিনি শেষ করে যেতে পারেন নি। উপন্যাসটির ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ পর্য্যন্ত প্রভাতকুমার লিখেছেন। বাকী অংশ সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়র লেখা। প্রভাতকুমারের মৃত্যুর পর ৬ই পৌষ, ১৩৪০ সালে এটি প্রকাশিত হয়। প্রকাশক শ্রীগিরীন্দ্র চন্দ্র সোম, কাত্যায়নী বুক স্টল ২০৩ কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট কলিকাতা। পৃষ্ঠা সংখ্যা ২৬৮। উপন্যাসটি দুই অংশে বিভক্ত। পূর্বাংশ প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় বিরচিত, উত্তরাংশ শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় বিরচিত। ১৫২ পৃষ্ঠা অবধি প্রভাতকুমারের রচনা।

গল্প উপন্যাস ছাড়াও এ সময়ের (১৩২২–চৈত্র, ১৩৩৮) মধ্যে বেশ কিছু প্রবন্ধ নিবন্ধ তিনি রচনা করেছেন। (১) 'চন্দ্রের কলঙ্ক' (মানসী, ভাদ্র, ১৩২২) (২) 'পশ্চিমাঞ্চলে প্রচলিত কালিদাসের গল্প' (মা: মর্ম্মবানী, ভাদ্র, ১৩২৫) (৩) 'সংস্কৃত বিদ্যাসুন্দর' (সচিত্র শিশির, আষাঢ়, ১৩২২)

(৪) 'কালিদাসের বাঙ্গালীত্ব সূচক একটি কিম্বদন্তী' (মা: মর্ম্ম, পৌষ, ১৩২৮) (৫) 'চিত্তরঞ্জনের বাণী' (মা: বসুমতী, আষাঢ়, ১৩২২) (৬) 'অমৃতলালের স্মৃতিতর্পণ' (মা: বসুমতী, শ্রাবণ, ১৩৩৬) (৭) 'দুধমা' (গল্প) (মা: বসুমতী চৈত্র, ১৩৩৮) (৮) 'কাজির বিচার' (রামধনু, মাঘ, ১৩৩৪) (৯) 'বীরবলের গল্প' (রামধনু, কার্ত্তিক, ১৩৩৫) (১০) 'রসসাগরের সমস্যাপূরণ' (মা: মর্ম্ম-ভাদ্র, ১৩২৮) ইত্যাদি।

প্রভাতকুমারের প্রথম গল্পগ্রন্থ 'নবকথা'র প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হয় কার্ত্তিক, ১৩০৬ বঙ্গাব্দে (২০ ডিসেম্বর, ১৮৯৯) অর্থাৎ তাঁর বিলাত যাত্রার আগে ই। নানা রসে পূর্ণ ষোলটি গল্পের সংকলন 'ষোড়শী'র প্রথম প্রকাশকাল আশ্বিন, ১৩১৩, তখন তিনি রংপুরে। গ্রন্থটির দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছে যথাক্রমে ১লা জ্যৈষ্ঠ, ১৩১৮ এবং অক্টোবর, ১৯১১, এ সময়ে তিনি ছিলেন গয়াতে। ষোড়শী এবং 'নবকথা'র দ্বিতীয় সংস্করণের দুইটি বই লেখক রবীন্দ্রনাথ কে উপহার পাঠিয়েছিলেন। ইতঃপূর্বেই রবীন্দ্রনাথ সমস্ত গল্পগুলি পড়েছিলেন। দ্বিতীয়বার গল্পগুলি পড়ে আনন্দে অধীর হয়ে প্রভাতকুমারকে লিখেছেন —

শান্তিনিকেন, বোলপুর।

' কল্যাণীয়েষু,

তোমার গল্পের বই দুটি এখানে আসিয়া পাইয়াছি। মনে ভাবিলাম সব গল্পই ত পূর্বে পড়া হইয়াছে ইহা আর পড়িব কি। অন্যান্য সাধারণ লোকের মত অপূর্বের প্রতি আমার একটু বিশেষ টান আছে। সময় তখন সন্ধ্যা, হাতে কাজ ছিল না তাই নিতান্ত অলসভাবে বইয়ের পাতা উল্টাইতে উল্টাইতে শুরু করিলাম — দেখিতে দেখিতে মনটা আটকা পড়িয়া গেল। দ্বিতীয়বার যেন নূতন করিয়া আবিষ্কার করিলাম তোমার গল্পগুলি ভারি ভাল। হাসির হাওয়ায় কল্পনার ঝোঁকে পালের উপর পাল তুলিয়া একেবারে হু হু করিয়া ছুটিয়া চলিয়াছে, কোথাও যে কিছুমাত্র ভার আছে বা বাধা আছে তাহা অনুভব করিবার জো নাই। ছোটগল্প লেখায় পঞ্চপান্ডবের মধ্যে তুমি যেন সব্যসাচী অর্জুন, ...।
যাহা হউক তোমার প্রথম সংস্করণের পাঠকেরা দ্বিতীয় সংস্করণেও যে ভিড় করিয়া দাঁড়াইবে নিজের মধ্যে তাহার প্রমাণ পাওয়া গেল। ইতি ১লা অগ্রহায়ণ ১৩১৮।

শুভানুধ্যায়ী
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।' ১৩০

রবীন্দ্রনাথের এই উক্তি মিথ্যা হয় নাই । বাংলা সাহিত্যের তৎকালীন পাঠক বই দুটিকেই সাদরে গ্রহণ করেছিল । 'নবকথার সর্বমোট চারটি সংস্করণ (১৩৪৩ বঙ্গাব্দে, প্রভাতকুমারের মৃত্যুর পর) এবং প্রভাতকুমারের জীবৎকালেই 'ষোড়শী'র পঞ্চম সংস্করণ (এপ্রিল, ১৯৩০) প্রকাশিত হয়েছে ।

প্রভাতকুমারের তৃতীয় গল্পগ্রন্থ 'দেশী ও বিলাতী' প্রথম প্রকাশকাল আশ্বিন, ১৩১৬। প্রভাতকুমার তখন গয়াতে । ইতিমধ্যে তিনি ছোটগল্প লেখক হিসাবে বাংলা সাহিত্যে সুনাম অর্জন করেছেন। কিন্তু দশটি দেশী এবং চারটি বিলাতের পটভূমিকায় লেখা 'দেশী ও বিলাতী'র এই গল্পগুলি যেমন বাংলা সাহিত্যে এক নূতনত্বের স্বাদ বহন করে এনেছে তেমনি প্রভাতকুমারকে দিয়েছে সত্যকারের প্রতিষ্ঠা । বিলাতের পটভূমিকায় রচিত গল্পগুলি সে সময়ে গল্প রচনার আসরে আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। দ্বিজেন্দ্রলাল ঠাকুর ২৯.৯.১৯০৯ তাং এক পত্রে প্রভাতকুমারকে জানিয়েছেন , —

'আপনার দেশী ও বিলাতী' গ্রন্থোপহার আনন্দের সহিত সকৃতজ্ঞচিত্তে সাদরে গ্রহণ করিলাম ।আমার অবকাশের একটি অতি উপাদেয় ভোগসামগ্রী ভাগ্যক্রমে আমার হস্তে আসিয়া পড়িল এইরূপ জ্ঞানে আমি ইহাকে অতিশয় যত্ন সমাদরের সহিত দপ্তরে গুছাইয়া রাখিলাম । আমি অল্প অল্প করিয়া স্বাদগ্রহণ পূর্বক পাঠ করিব এইরূপ তো মনে করিতেছি কিন্তু পড়িতে পড়িতে আগ্রহ বাড়িয়া উঠিলে দুইদিনেই গ্রন্থখানির চরমে পৌঁছিয়া পৃথিবী জয় করিয়া Alexander কে যেরূপ কাঁদিতে হইয়াছিল আমার সেইরূপ দশা হইবার কিছুই বিচিত্র নাই , যাহাই হউক না কেন আপনার উপহারটিকে আমি হৃদয় পাতিয়া গ্রহন করিলাম — এবং তজ্জন্য আপনাকে অন্তরের সহিত ধন্যবাদ প্রদান করিলাম ।' [১৬১] প্রসঙ্গতঃ মনে রাখা দরকার দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর 'দেশী ও বিলাতী'র গল্পগুলি ইতিপূর্বে পড়েছিলেন । এবং এখানে সন্নিবিষ্ট 'প্রত্যাবর্তন' গল্পটি পাঠ করে 'ডাঙ্গায় বাঘ জলে কুমীর' [১৬২] শীর্ষক সমালোচনাটি লেখেন । স্বয়ং প্রভাতকুমার 'দেশী ও বিলাতী'র প্রথম সংস্করণের ভূমিকায় লিখেছেন —

' ...... লক্ষ্ণৌ 'নগরী - প্রচারিণী সভা'র শ্রীযুক্ত রূপনারায়ণ পাণ্ডেয় এবং এলাহাবাদ 'অভ্যুদয়' সংবাদ পত্রের শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকান্ত মালবীয় এই পুস্তকের কয়েকটি গল্প হিন্দিতে অনুবাদ করিয়া , ভিন্ন ভিন্ন পুস্তকাকারে প্রকাশ করিয়াছেন । পুণার শ্রীযুক্ত টি.আর বিদ্বাংশ মারাঠী ভাষায় , পন্ডিচারীর শ্রীযুক্ত বালকৃষ্ণ আয়ার তামিল ভাষায় , দেরা- ইস্মাইল খাঁর শ্রীযুক্ত ভজিরাম গান্ধী উর্দুভাষায় এই পুস্তকের কোন কোন গল্প

অনুবাদ করিয়া মাসিক পত্রাদিতে প্রকাশ করিয়াছেন । .....!

১৯২৪ খৃষ্টাব্দে দ্য ইন্ডিয়ান প্রেস লিমিটেড , এলাহাবাদ থেকে গল্পগ্রন্থটির হিন্দি অনুবাদ প্রকাশিত হয়েছিল । এছাড়া 'নবকথা,' ষোড়শী' এবং 'দেশী ও বিলাতী' থেকে দশটি গল্প ইংরাজীতে অনূদিত হয়ে Stories of Bengali Life নামে ১৯১২ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়েছিল । 'চারিটি গল্পের অনুবাদ করিয়াছিলেন স্বয়ং লেখক —' উকীলের বুদ্ধি' ("The wiles of a pleader) 'খালাস' (His Release) ' হাতে হাতে ফল (Swift Retribution) ও 'কাশীবাসিনী' (The Lady from Benares) । বাকী ছয়টি ভাষান্তরিত করিয়াছিলেন মিসেস নাইট (Mrs.M.S.Knight) 'কলির মেয়ে' (The Signs of the time), বনশিশু (The forest Child), ভুল শিক্ষার বিপদ' (The danger of Being wrongly Taught) এবং 'ছদ্মনাম' (Pseudonyms) । পরবর্তীকালেও প্রভাতকুমারের কিছু গল্প ইংরেজীতে অনুবাদ করা হয় । — যেমন —

1. The Prodigate Return - by Amiya Chakrabirty - The Hindustan,1945
2. A Shilling for Flowers -by Hiran Moy Ghoshal, The Hindustan,1945
3. Price of Flowers -by Lila Roy - Contemporary Indian Short Stories series No.i July,59
4. The Beggar Saheb.by Lila Roy-Broken bread 1957

দিল্লীর সাহিত্য একাদেমি প্রভাতকুমারের একটি নির্বাচিত গল্প - সংগ্রহ প্রধানতম ভারতীয় ভাষায় অনুবাদ করে প্রকাশের ব্যবস্থা করেছেন। Stories of Prabhat Kumar Mukharjee নামে Indian Literature এর Vol.2 No.1,Oct-March,1958-59 এ প্রকাশিত হয়েছে ।

সমকাল থেকে আধুনিক কাল অব্দি প্রভাতকুমারের গল্প শুধু বাংলা নয় অন্যান্য ভাষাতেও কতখানি সমাদর লাভ করেছে এখানে দেওয়া বিবরণ থেকে তা বুঝে নিতে অসুবিধা হয় না ।

প্রসঙ্গত: উল্লেখ করা যেতে পারে যে প্রভাতকুমারের ইংরাজী সাহিত্যেও দখল ছিল প্রচুর । এখানে তাঁর অনুবাদের নমুনা কিছুটা দেওয়া যেতে পারে। রবীন্দ্রনাথের এবং নিজেরও কয়েকটি গল্প তিনি ইংরাজীতে অনুবাদ করেছিলেন

(১০)

মাঘ, ১৩৩৬ সালের পর 'মানসী ও মর্ম্মবাণী' আর প্রকাশ লাভ করে নাই। এসময় থেকে প্রভাতকুমারের সাহিত্য সৃষ্টিতে বেশ কিছুটা ভাটা পড়ে। একটি মাত্র গল্পগ্রন্থ 'জামাতা বাবাজী ও অন্যান্য গল্প' ১৩৩৮ সালে প্রকাশিত হয়। (তন্মধ্যে আবার ৪টি গল্প মাঘ, ১৩৩৬ সালের পূর্বে লেখা লিখিত।) কোন গল্পগ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত হয়নি এমন একটি গল্প 'দুধ মা' মাসিক বসুমতী'তে চৈত্র, ১৩৩৮ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছে। অন্য কোন গদ্য পদ্য রচনার উল্লেখও কোথাও পাওয়া যায় না। শুধু মাত্র আশ্বিন ১৩৩৫-মাং বসুমতীতে ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত 'নবদুর্গা' আশ্বিন, ১৩৩৭ থেকে 'বসুমতী'তে ধারাবাহিকভাবে (*) প্রকাশিত 'বিদায়বাণী' উপন্যাসের কিয়দংশ ছাড়া।

১৩৩৭ সালের শেষ দিকে উচ্চরক্তচাপ হেতু প্রভাতকুমার অসুস্থ হয়ে পড়েন। অসুস্থ অবস্থাতেও তিনি সাহিত্য চর্চ্চা থেকে বিরত থাকেননি, সেই চর্চ্চা আলাপ আলোচনার মাধ্যমেই হোক অথবা লেখনী মুখেই হোক। ১৩৩৮ সালের মাঝামাঝি থেকে তাঁর রক্তচাপ বৃদ্ধি পায় এবং প্রায়শই শয্যাশায়ী হয়ে পড়তেন। কিন্তু একটু সুস্থ হলেই সাহিত্য চর্চ্চায় আবারও নিমগ্ন হতেন। ২২ শে চৈত্র, সোমবার, ১৩৩৮ সালের রাত বারটার সময় রক্তচাপের আক্রমনে তিনি বিছানা থেকে পড়ে যান এবং পৌণে দুইঘন্টার মধ্যেই তাঁর অমর আত্মা ইহধাম ত্যাগ করে। মৃত্যুকালে তাঁর শয্যাপার্শ্বে অশীতিপর বৃদ্ধা মাতা, যশস্বী চিকিৎসক দুই পুত্র শ্রীমান অরুণকুমার ও প্রশান্ত কুমার এবং বহু আত্মীয় স্বজন উপস্থিত ছিলেন। হঠাৎ অসুস্থ হবার পর তাঁর বাক্‌শক্তি-রহিত হয়ে যায় মাথায় তিনি প্রচন্ড বেদনা অনুভব করেন ইঙ্গিতে পুত্রদের সে কথা জানাতে চেষ্টা করেন। [১৬৩] কিছুদিন থেকে তাঁর শরীর বিশেষ সুস্থ ছিল না, তবে সোমবার সকালেও নিত্য নৈমিত্তিক সাহিত্য চর্চ্চা করেছিলেন এবং সেদিনই যে তাঁর জীবনের শেষদিন সেকথা কেউ আশা করেনি।

প্রভাতকুমারের মৃত্যুতে সমসাময়িক সাহিত্য সমাজে এক গভীর শোকের ছায়া নেমে আসে। সাহিত্যিক প্রভাতকুমারকে হারিয়ে বাংলা সাহিত্য জননী যেমন তার একজন হাসিখুশিভরা একনিষ্ঠ সেবককে হারিয়েছে তেমনি এমন একজন মানব-দরদী বন্ধুবৎসল ব্যক্তিত্বের অবসানে তাঁর সুহৃদসমাজে নেমে আসে এক গভীর শোকের ঘোর কাল মেঘ। নিমতলা শ্মশানঘাটে তাঁর শেষকৃত্য সম্পন্ন হয়েছিল। [১৬৪]

'মানসী ও মর্ম্মবাণী'র অন্যতম লেখক এবং প্রভাত জগদিন্দ্রনাথের অন্যতম সাহিত্যিক বন্ধু চারুচন্দ্র মিত্র প্রভাতকুমারের তিরোধানে শোক সন্তপ্ত চিত্তে লিখেছেন —

' গত ২২ শে চৈত্র সোমবার রাত্রি পৌনে দুই ঘটিকার সময় বঙ্গবাণীর একনিষ্ঠ সাধক কথা সাহিত্যিক সাহিত্যের অত্যুজ্জ্বল রত্ন প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় মহাশয় অত্যধিক রক্তচাপে ইহলোক ত্যাগ করিয়াছেন । মৃত্যুর সময় রক্তচাপের পরিমাণ ছিল ২৬০ ।..... রাত্রি বারটার সময় তিনি শয্যা হইতে উঠিয়া পড়িয়া যান ও পৌণে দুইঘন্টার ভিতরই ইহলীলা সাঙ্গ করেন । তাঁর আকস্মিক বিয়োগে বিয়োগব্যথায় আমরা অধীর । তিনি ছিলেন আমাদের পরমাত্মীয় — অগ্রজকল্প ' প্রভাতদা' । তিনি ছিলেন আমাদের বন্ধু পরামর্শদাতা ও পথ প্রদর্শক । মৃত্যুকালে তাঁহার বয়ঃক্রম হইয়াছিল ৬০ বৎসর দুই মাস ।

তাঁহার সম্বন্ধে আজ কেবল মনে পড়িতেছে তাঁহার চরিত্রের মহানুভবতা উদারতা ও বাণীর ঐকান্তিক সেবার কথা । যৌবন কাল হইতে যে বাণী সেবায় তিনি আত্মপ্রাণ নিয়োগ করিয়াছিলেন জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত অকুণ্ঠচিত্তে সে সেবা করিয়া গিয়াছেন — এ সাধনায় কোন দিন তাহাকে কেহ বিরত হইতে দেখে নাই । বাণীর চরণে প্রত্যগ্র পুষ্পাঞ্জলি তিনি প্রত্যহই দান করিতেন , তাহা লিখিয়াই হউক যে কোন ভাবেই তিনি করিতেন । তাঁহার ন্যায় নিরহঙ্কার অজাতশত্রু মানুষ বড় কমই দেখিতে পাওয়া যায় । তাঁহার ন্যায় মিষ্টালাপী, মিষ্টভাষী , সদাশয় বন্ধুর বিয়োগ অশনিপাতের ন্যায়ই আমাদের নিকট আসিয়াছে , কারণ দশ মিনিটের ব্যবধানের পথে থাকিয়াও জন্মের মত তাঁহাকে শেষ দেখা - দেখা দেখিতে ও তাঁহার চরণে ভক্তি-শ্রদ্ধার পুষ্পচন্দন দিতে পারি নাই এ দুঃখের তীব্রতা এখনও কমে নাই ।

....

.....

বহু বৎসর পরিচয়ের ভিতর বিলাত ফেরৎ প্রভাতকুমারকে কোন দিন সাহেবী আনা করিতে দেখি নাই , ...

..... তাঁহার ন্যায় মত - সহিষ্ণু বন্ধুও বড় কম দেখিতে পাওয়া যায় ।

..... তাঁহার ন্যায় চিন্তাশীল সাহিত্যিকের তিরোধানে বঙ্গ সাহিত্যের যে ক্ষতি হইল তাহা অপূরণীয় । .....[১৬৫]

প্রভাতকুমারের মৃত্যু সংবাদ জানিয়ে The Modern Review পত্রিকা লিখেছে — ' Prabhat Kumar Mukherjee, one of the leading story-writers and novelists of Bengal, passed away the other day

after a long ~~sickness~~ illness at the age of Sixty. The short-story was his forte rather than the novel. ... He was a qualified lawyer, having been called to the bar in England and had some practice in some mufassal towns in Bengal and Bihar. But he soon gave it up for a purely literary career, his only remaining connection with the law being Lecturship at the university Law college, Calcutta. ... He was a good writer of English too. ...' ১৬৬

'পুষ্পপাত্র' পত্রিকায় লেখা হয়েছে , ——

' বাংলার খ্যাতনামা গল্পলেখক ও ঔপন্যাসিক প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় মহাশয় স্বর্গারোহন ~~xx~~ করিয়াছেন । রবীন্দ্রনাথের যুগে ৩/৪ জন গল্পলেখক নিজ ~~xxxxxxx~~ বিশেষত্বে গল্প সাহিত্যে আপনাদের আসন সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন প্রভাতকুমার তাঁহাদের মধ্যেই প্রধান একজন ছিলেন । এমন সুন্দর হাস্যরসোজ্জ্বল গল্প যে কোন সাহিত্যেরই অলঙ্কার । ..... রবীন্দ্রনাথ ছাড়া আর কাহারও গল্পের বই বোধ হয় এত বেশী বিক্রী হয় নাই । ..... প্রভাতকুমার অতি আমায়িক সুরসিক লোক ছিলেন । বাহিরে তাঁহাকে খুব ~~xx~~ গম্ভীর দেখাইত , যাহাদের সঙ্গে অন্তরঙ্গতা ছিল না তাহাদের সঙ্গে প্রাণ খুলিয়া মিশিতেও পারিতেননা ..... ' ১৬৭

প্রভাতকুমারের মৃত্যুর অব্যবহিত পরে শ্রদ্ধেয় কবি কালিদাস রায় 'কথাশিল্পী প্রভাতকুমার' নিবন্ধে লিখেছেন :—

' প্রভাতকুমার বাঙ্গালা দেশের একজন প্রথম শ্রেণীর সাহিত্যরথী । রবীন্দ্রশিষ্যগণের মধ্যে ইনিই ছিলেন সর্বজ্যেষ্ঠ ।

প্রভাতকুমার যখন গল্প লিখিতে আরম্ভ করেন — তখন কেবলমাত্র রবীন্দ্রনাথের গল্পগুলি প্রকাশিত হইয়াছে । অথচ প্রভাতকুমারের গল্পগুলি রবীন্দ্রনাথের গল্পের অনুকরণ মাত্র নহে । গল্পগুলির ~~xx~~ আকৃতি প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্য সম্পূর্ণ মৌলিক না হইলেও বঙ্গসাহিত্যে নূতন ।

..... আমাদের যৌবনে প্রভাতকুমার ও তাঁহার দুইএকজন সহযোগীর গল্পই ছিল সম্বল । গল্প সাহিত্যের আজ যত উন্নতিই হউক ~~xxx~~ — রবির উদয়ের সঙ্গে সঙ্গে প্রভাতের মাধুর্য্যের কথা আমরা ভুলিতে পারিবনা — বঙ্গ সাহিত্যও তাহা ভুলিবেনা ।

প্রভাতকুমার ছিলেন খাঁটি কথক — খাঁটি কথা সাহিত্যিক — উপকথাবলার ভঙ্গিটি ছিল তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ — এমন ~~xx~~ করিয়া কথায় কথায় শেষ পর্য্যন্ত টানিয়া লইবার শক্তি —পাঠকের কৌতূহলকে শেষ পর্য্যন্ত সজীবিত রাখিবার কৌশল অতি অল্প সাহিত্যিকেরই আছে । কথাসাহিত্যের নামে এখন অনেক প্রকার সাহিত্য চলিতেছে । প্রভাতবাবুর মত খাঁটি কথাসাহিত্যিক আজিও দুর্লভ । ~~xxxx~~

তিনি কথা সাহিত্যের মধ্যে আর কোন ভেজাল মিশান নাই — কথাসাহিত্যের মারফতে তিনি অন্য কোন কথা শুনান নাই, কথা সাহিত্যের নামে তিনি কোন তত্ত্ব বা তথ্য, কোন প্রশ্ন, কোন সমস্যা, সিদ্ধান্ত বা মন্তব্যকে গলাধঃকরণ করিতে বাধ্য করেন নাই। নিছক আনন্দ ছাড়া আর কিছু দেওয়ার চেষ্টা তাঁহার ছিল না। তাঁহার রচনাভঙ্গি এমন কৌতুক-রসে স্নিগ্ধ যে আমরা তাঁহার গল্পে দ্বিগুণিত আনন্দ লাভ করিয়াছি — উপকথা শোনার আনন্দ ও রসিকতা — সম্ভোগের আনন্দ — দুইই একসঙ্গে পাইয়াছি। .....।

আজ সাহিত্যিক প্রভাতকুমারের চেয়ে মানুষ প্রভাতকুমারের জন্য বেদনা গাঢ়তর।

মিতভাষী জ্ঞানগম্ভীর প্রভাতকুমার চিরদিন আপনার আত্মমর্য্যাদা অক্ষুন্ন রাখিয়া গিয়াছেন — সাহিত্যের হাটে তাঁহাকে কেহ কখনও বেচাকেনা করিতে দেখে নাই, সাহিত্য সেবকদের জনতায় কোনদিন মণ্ডলতা করেন নাই — যশমান প্রতিষ্ঠার জন্য কোনদিন উদগ্রীবতা দেখান নাই — যেখানে মর্য্যাদালাভের আশঙ্কা থাকিত সেখান হইতে চিরদিন দূরে দূরে থাকিতেন — কোন সভাসমিতির বেদী মণ্ডিত করিবার জন্য তিনি ব্যগ্র ছিলেন না। তাই বলিয়া তিনি অসামাজিক আত্মম্ভরী গর্বোদ্ধত ব্যক্তি ছিলেন না — যিনি তাঁহার কাছে দুই দণ্ডের জন্যও গিয়াছেন তিনিই তাহা জানেন। তাঁহার সম্পাদিত মানসী পত্রের অফিসে অথবা মানসীর বৈঠকে যাঁহারা তাঁহার সহিত মিশিয়াছেন — তাঁহারা ত ভাল করিয়াই জানেন — তিনি কিরূপ সদালাপী অমায়িক, রসিক, অনুদ্ধত ও শান্ত প্রকৃতির বন্ধুবৎসল ব্যক্তি ছিলেন।

সরস্বতীর এই একনিষ্ঠ সেবকটি কোনদিন সাহিত্য ক্ষেত্রের দ্বন্দ্ববিরোধ বিসংবাদের মধ্যে আসেন নাই। কখনও দায়িত্বশূন্য মতামত ব্যক্ত করিতেন না — বিশেষ গভীর ভাবে বিবেচনা না করিয়া কোন দিন কোন মন্তব্য প্রকাশ করিতেন না। যদি বা কখনও কোন মন্তব্য প্রকাশ করিতেন তাহাও লিখিয়া নয় — মুখে যথেষ্ট বিনয় দ্বিধা ও সতর্কতার সহিত অন্তরঙ্গ বন্ধুদের কাছে। মুরুব্বিয়ানা করা, *mandate* বা *message* দেওয়া তাঁহার স্বভাব বিরুদ্ধ ছিল। ..... আইন কলেজে সসম্মানে অধ্যাপকতা করিয়া গিয়াছেন — নিঃশব্দ ধীর অচঞ্চল অনাড়ম্বর তাঁহার কর্মজীবন। তাঁহার মত খাঁটি বাঙ্গালী প্রকৃতির ব্যারিষ্টার কখনও চোখে পড়ে নাই। তাঁহার চরিত্রের ইহাই প্রধান বৈশিষ্ট্য যে, তিনি দেশশুদ্ধ লোককে স্ফূর্তি দিয়াছেন — হাসাইয়া মাতাইয়া দিয়াছেন — কিন্তু কোন দিন নিজের আত্মগৌরব বিন্দুমাত্র ক্ষুন্ন করেন নাই।

শোক সংবাদ জানিয়ে 'ভারতবর্ষ' পত্রিকায় লেখা হয়েছে, 'বাঙ্গালার - কথাসাহিত্যের পাঠকপাঠিকাগণ আজ একটি মর্ম্মান্তিক শোকের কাহিনী শুনিয়া মর্মে মর্মে দু:খানুভব করিবেন — তাঁহাদের অতিপ্রিয় কথাশিল্পী প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় মহাশয় সহসা পরলোকে মহাপ্রয়াণ করিয়াছেন । গত ২২শে চৈত্র, (১৩৩৮) সোমবার. রাত্রি পৌণে দুইঘটিকার সময় এই শোকাবহ ঘটনা ঘটে । সোমবারপ্রাতেও তিনি সুস্থশরীরে নিত্য নৈমিত্তিক সাহিত্য-চর্চা করেন। তখন কে ভাবিয়াছিল — চব্বিশ ঘন্টা অতিক্রান্ত হইবার পূর্বেই তিনি চির-যাত্রা করিবেন ! ..... প্রভাতকুমারের এমনভাবে পরলোক গমনে আমরা যে কি শোক পাইয়াছি, তাহা কি করিয়া বুঝাইব ?

.... তিনি ছিলেন জন্ম - সাহিত্যিক, সাহিত্য ছিল তাঁহার কর্মক্ষেত্র — সাহিত্যক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠা লাভই ছিল তাঁহার কর্মফল । বিদ্যালয়ে অধ্যয়নকালে — ছাত্রাবস্থাতেই তিনি যে সাহিত্য চর্চা শুরু করেন, জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত তাহাই করিয়া গিয়াছেন ।' ....

.... ছোটগল্প রচনায় তিনি ছিলেন সিদ্ধহস্ত । বিশেষত: তাঁহার বিলাতী অভিজ্ঞতার ফলে তিনি যে সব ছোট গল্প লিখিয়াছেন তাহার তুলনা হয় না । বাঙ্গালাসাহিত্য ক্ষেত্রে ছোটগল্প রচনায় রবীন্দ্রনাথের পরে তিনি অপ্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন বলিলে অত্যুক্তি করা হয় না ।

...... পাঠক সমাজে তাঁহার উপন্যাসগুলির যে সম্যক্ আদর হইয়াছে— উহাদের একাধিক সংস্করণই তাহার পরিচয়। প্রভাতকুমার ছিলেন মিতভাষী ও মিষ্টভাষী, সদালাপী ও ধীমান্ ব্যক্তি ।

কিছুদিন ধরিয়া তাঁহার শরীর বেশ সুস্থ যাইতেছিল না, তাই বলিয়া তাঁহার যে অকস্মাৎ মৃত্যু হইতে পারে ইহাও কেহ আশা করেন নাই ।'[১৬৯]

প্রভাতকুমারের মৃত্যুতে আক্ষেপ ও শ্রদ্ধা জানিয়ে 'প্রবাসী' পত্রিকায় লেখা হয়েছে —

.... তিনি প্রায় একবৎসর কঠিন পীড়ায় ভুগিতেছিলেন, কিন্তু আরোগ্যলাভও করিবার সম্ভাবনা ছিল । তিনি আরও কয়েক বৎসর বাঁচিয়া থাকিলে ছোটগল্প লিখিয়া বাংলা সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করিতে পারিতেন ।

.... আমাদের ধারণা, উপন্যাস অপেক্ষা ছোটগল্প রচনাতেই তাঁহার কৃতিত্ব বেশী ।..........

.... প্রভাতবাবু সাধারণ যে সব চিঠিপত্র লিখিতেন, তাহাতেও সাহিত্যিক বৈশিষ্ট্য লক্ষিত হইত ।' ....[১৭০]

প্রভাতকুমারের তিরোধানে 'মাসিক বসুমতী' লিখেছে —

বঙ্গজননীর একনিষ্ঠ সাধক, বাণীর বরপুত্র, বাঙ্গালা কথা সাহিত্যের মোপাঁসা প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় অকস্মাৎ অত্যধিক রক্তের চাপে ইহলোক ত্যাগ করিয়াছেন। জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত তিনি দেবী ভারতীর চরণে প্রত্যগ্র পুষ্পভার নিবেদন করিয়া গিয়াছেন। প্রভাতকুমার কথা সাহিত্যের যে দিক পরিপুষ্ট এবং অলঙ্কৃত করিয়াছেন, সে দিকে তাঁহার প্রতিভা অভ্রভেদী গিরিশৃঙ্গের মত উন্নতশীর্ষে কল্পান্তকাল দ্যুতিমানভাবে স্থায়ী হইবে। এ বিষয়ে তাঁহার তুলনা তিনি স্বয়ং। তাঁহার আকস্মিক বিয়োগে আমরা প্রিয়জন-বিয়োগ-বেদনায় অধীর এ সময়ে — এ সময়ে তাঁহার প্রতিভা বিশ্লেষণ সম্ভবপর নহে। প্রভাতকুমার কোনও দিন ডঙ্কানিনাদসহ আপনার বিজয়বার্তা ঘোষণা করেন নাই। নীরবে, শ্রদ্ধানত - হৃদয়ে আরাধ্য দেবীর তপস্যায় সারাজীবন মগ্ন ছিলেন। রস পিপাসু, পাঠকবৃন্দ তাঁহার রচিত সাহিত্যের অমৃতধারা পানে পরিতৃপ্ত হইত। .....

প্রভাতকুমার যুগসাহিত্য সৃষ্টি করেন নাই, কারণ, তাহা তুচ্ছ এবং ক্ষণস্থায়ী। তাঁহার রচিত কথাসাহিত্য সকলযুগের জন্যই রচিত এবং যত দিন সভ্য মানব ভাষাসাহিত্যের সমাদর করিবে, সাহিত্যরস পানে অমর হইতে চাহিবে, ততদিন প্রভাতকুমার মানুষের স্মৃতিতে বাঁচিয়া থাকিবেন।

.... এখন বাঙ্গালা সাহিত্যে অবাধ' না বলিয়া 'গ্রহণ চলিতেছে, এখন গাউন ও স্কার্টএর বর্ণানুলেপ শাড়ীর ভিতর হইতে আত্মপ্রকাশ করিতেছে, খদ্দরের ধুতি ও চাদরের আবরণ ভেদ করিয়াও নেকটাই, কলার, কোট -প্যাণ্টের বিসদৃশ মূর্ত্তি উঁকি মারিতেছে। বাঙ্গালা ভাষা বিদেশীয় মনোবৃত্তি ও আবহাওয়াকে ঢাকিয়া রাখিতে পারে নাই। সুতরাং এ যুগে প্রভাতকুমারের রচনার নিরপেক্ষ সমালোচনা অসম্ভব। বাঙ্গালী সাহিত্যরসিকগণ যখন পশ্চিমদিক্‌চক্রবাল হইতে দৃষ্টি ফিরাইয়া আবার ঘরের দিকে চাহিবেন, তখন প্রভাতকুমারের জীবনব্যাপী তপস্যার অপূর্বদান দেখিয়া বিস্মিত ও অভিভূত হইবেন। প্রভাতকুমার জীবনে যাহা দেখিয়াছেন, যাহা ভোগ করিয়াছেন, যাহা উপলব্ধি করিয়াছেন, বাঙ্গালার প্রাণ ধারায় অভিষিক্ত করিয়া তাহাই তিনি বঙ্গবাণীর চরণে অঞ্জলি দিয়াছেন। বিদেশী মূর্ত্তিকে তিনি বাঙ্গালার পরিচ্ছদে ভূষিত করিয়া দেবী ভারতীর পূজা প্রাঙ্গনকে কলুষিত করেন নাই। ইহা সাহিত্যিকের পক্ষে কম গৌরব, শ্লাঘা ও আত্মপ্রসাদের হেতু নহে।

দীর্ঘ দিনের সাহিত্য সুহৃদের স্মৃতি চিত্তকে বিচলিত করিয়া তুলিতেছে। সৌম্যদর্শন, মিষ্টভাষী বন্ধু অকস্মাৎ ইহলোক ত্যাগ করিয়া গেলেন। ২২শে চৈত্র,

সোমবার দ্বিপ্রহরে' মাসিক বসুমতী'র জন্য 'বিদায় বাণী' লিখিয়া পাঠাইয়াছিলেন । কে জানিত সেই দিন রাত্রি পৌনে দুই ঘটিকায় তিনি এই শেষ বিদায়বাণী লিখিয়া দিয়া ইহধাম ত্যাগ করিবেন ? প্রভাতকুমার জীবনে কাহারো সহিত বিরোধ করেন নাই, বন্ধুবর্গের সহিত তর্কযুদ্ধের সম্ভাবনা সর্বদাই এড়াইয়া চলিতেন । কোনও মানুষের ব্যক্তিত্ব সম্বন্ধে একটা অস্পষ্ট বিরুদ্ধ ধারণার ইঙ্গিত পর্য্যন্ত প্রভাতকুমারের নিকট হইতে কেহ কখনও পায় নাই । স্বল্পভাষী হইলেও প্রভাতকুমার সদালাপী ছিলেন । হাস্যরসের ফল্গুধারা তাঁহার রচনাতে যেমন সরস করিয়া রাখিয়াছে, তাঁহার সহিত আলাপকালেও তাহার সুস্পষ্ট অভিব্যক্তি দেখা যাইত ।

প্রভাতকুমারের রচনা জাহ্নবী ধারার ন্যায় হৃদ্য ও পবিত্র, সামান্য অশ্লীলতার ইঙ্গিত তাঁহার বিপুল সাহিত্য - সম্পদের মধ্যে নাই । দেবী ভারতীর পূজা প্রাঙ্গণে অমেধ্য ও অস্পৃশ্য বস্তুর প্রবেশাধিকার নাই, ইহা প্রভাতকুমার জানিতেন, বিশ্বাস করিতেন এবং বলিতেন । তিনি দেবীর চরণে শুধু চন্দন-সিক্ত সুগন্ধি কুসুম ও বিল্বপত্রই নিবেদন করিয়া গিয়াছেন । তিনি বেশে ও মনে বাঙ্গালী ছিলেন । বাঙ্গালীর বৈশিষ্ট্য য়ুরোপীয় শিক্ষায় কিছুমাত্র ক্ষুন্ন হয় নাই ।

.... প্রভাতকুমারের তিরোধান আকস্মিক ও মর্মবিদারক। এ শোকে সান্ত্বনার ভাষা নাই ।' ১৭১

ব্যক্তি প্রভাতকুমারের তিরোধানের পর চার দশক কাল অতিক্রান্ত, কিন্তু বাংলা সাহিত্যে তাঁর রসাবেদন আজও সুরক্ষিত । বাংলা সাহিত্যের বিদগ্ধ পাঠক আজও তাঁকে ভুলতে পারেনি । আজও তাঁরা সশ্রদ্ধ চিত্তে প্রভাতকুমারকে স্মরণ করে তাঁর জন্মশতবার্ষিকী পালন করেছেন ।

গত ৩রা ফেব্রুয়ারী, ১৯৭৩ সালে প্রভাতকুমার জন্মশত বৎসর উৎসব সমিতি বৈকাল ৫ টায় মহাবোধি সোসাইটি হলে প্রভাতকুমারের জন্মশতবার্ষিক অনুষ্ঠান পালন করেন - অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন — শ্রী অন্নদাশঙ্কর রায় এবং সভাপতির আসন অলংকৃত করেছেন প্রখ্যাত সাহিত্যিক শ্রীপ্রেমেন্দ্র মিত্র । এই জন্মশত বৎসর পূর্তি উৎসব উদ্‌যাপনর জন্য অধুনাকালের বিদগ্ধ সাহিত্যিক এবং বিদ্বৎজনদের নিয়ে এক কমিটি গঠন করাহয়েছে । এর মধ্যে রয়েছেন — শ্রী বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায় (বনফুল) সভাপতি, প্রেমেন্দ্র মিত্র, অচিন্ত্যকুমার সেন গুপ্ত, মনোজ বসু দক্ষিণারঞ্জন বসু, অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, শান্তি কুমার মিত্র, মিহির কুমার মুখোপাধ্যায় (প্রভাতকুমারের পৌত্র), সনৎকুমার গুপ্ত, নিত্যানন্দ সাহা, জয়ন্ত সেন ও মনোজ দত্ত (সম্পাদক) ।' ১৭২

১লা এপ্রিল, ১৯৭৩, বুধবার, কলিকাতায় বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে প্রভাত-কুমারের জন্মশতবার্ষিক উৎসব পালিত হয়েছে।' এখানে পৌরোহিত্য করেন জাতীয় অধ্যাপক সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়। তিনি বলেন – প্রভাতকুমার ছিলেন বাংলা গল্প সাহিত্যের সার্থক রূপকার। এই সভায় ডাঃ বিজন বিহারী ভট্টাচার্য, 'প্রভাতকুমার ও রবীন্দ্রনাথ' শীর্ষক ও বনফুল একটি নিবন্ধ পাঠ করেন। এ ছাড়া প্রভাতকুমারের জীবন ও সাহিত্য সম্পর্কে বিস্তৃত ও জ্ঞানগর্ভ আলোচনা করেন অধ্যাপক ধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, ডঃ অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।[১৭৩] এই সভায় পঠিত শ্রীবলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়ের লেখা' আমাদের প্রভাতকুমার' ডঃ বিজন বিহারী ভট্টাচার্যের ' প্রভাতকুমার ও রবীন্দ্রনাথ' এবং শ্রীধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের প্রদত্ত ভাষণের অনুলিখন' প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় :(১৮৭৩ - ১৯৩২)' শীর্ষক রচনাগুলি পরবর্তী সময়ে সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকায়[১৭৪] প্রকাশিত হয়েছে।

তাঁর জন্মশতবার্ষিকী উৎসব উদ্‌যাপনের মধ্য দিয়ে একটি কথাই আজ বার বার মনে হয়, রবীন্দ্র - শরৎ উত্তর যুগে, জীবন যন্ত্রনায় পর্য্যুদস্ত বাঙ্গালী আজও যে প্রভাতকুমারকে স্মরণ করেছে তার মূল কারণ – প্রভাতসাহিত্যের আনন্দরসের স্নিগ্ধ প্রস্রবণটি।

১। রবীন্দ্রনাথকে লিখিত প্রভাতকুমারের ১২ চৈত্র, ১৩০২ সালের পত্রাংশ - দেশ, সাহিত্য-সংখ্যা, ১৩৭৫ পৃঃ সংখ্যা ১৫৮

২। ঐ ঐ ১১ মাঘ, ১৩০১ সালের পত্রাংশ ঐ ঐ ১৪১

৩। প্রভাত - স্মৃতি — মন্মথনাথ ঘোষ, পথপুষ্প, আশ্বিন, ১৩৩৯।

৪। 'নবকথা' (ডিসেম্বর, ১৮৯৯) গল্পগ্রন্থের প্রথম সংস্করণের ভূমিকায় প্রভাতকুমার লিখেছেন 'বঙ্কিমবাবুর কাজির বিচার' লেখাটি আমার নহে। উহা আমার পূজনীয় পরমাত্মীয় শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের লিখিত এবং তাঁহার অনুরোধক্রমে ইহা নবকথা'র পরিশিষ্টাংশে সংলগ্ন হইল।

৫। রবীন্দ্রনাথকে লিখিত প্রভাতকুমারের ২৭ আষাঢ়, ১৩০২ সালের পত্রাংশ - দেশ, সাহিত্যসংখ্যা, ১৩৭৫ পৃঃ সং ১৫০

৬। প্রভাতকুমারের পৌত্র কলিকাতানিবাসী শ্রীযুক্ত মিহিরকুমার মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের সঙ্গে সাক্ষাৎকার।

৭। ঐ ঐ ঐ ঐ

৮। রবীন্দ্রনাথকে লিখিত প্রভাতকুমারের ১১মাঘ, ১৩০১ সালের পত্রাংশ - দেশ, সাহিত্য সংখ্যা, ১৩৭৫ পৃঃ সং ১৪১

৯। ঐ ঐ ঐ ১৭ ফাল্গুন, ১৩০১ ঐ পৃঃ সং ১৪৩

১০। ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ পৃঃ সং ১৪৩

১১। ঐ ঐ ঐ ৪ ফেব্রুয়ারি, ১৮৯৫ ঐ পৃঃ সং ১৪১

১২। ঐ ঐ ঐ ২৭ আষাঢ়, ১৩০২ ঐ পৃঃ সং ১৫০

১৩। ঐ ঐ ঐ ২৯ জ্যৈষ্ঠ, ১৩০২ ঐ পৃঃ সং ১৪৯

১৪। ঐ ঐ ঐ ৪ ফেব্রুয়ারি ১৮৯৫ ঐ পৃঃ সং ১৪২

১৫। মণীষা মন্দির — কৃষ্ণবিহারী গুপ্ত, সঙ্কলন, অগ্রহায়ণ ১৩২১।

১৬। রবীন্দ্রনাথকে লিখিত প্রভাতকুমারের ২২ ফাল্গুন, ১৩০৩ সালের পত্রাংশ - দেশ, সাহিত্য সংখ্যা, ১৩৭৫ পৃঃ ১৬৩

১৭। ঐ ঐ ঐ ২৩ জ্যৈষ্ঠ, ১৩০২ সালের ঐ পৃঃ ১৪৮

১৮। ঐ ঐ ঐ ২৯ জ্যৈষ্ঠ, ১৩০২ ঐ ঐ পৃঃ ১৪৯

১৯। বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস (চতুর্থ খণ্ড) — সুকুমার সেন পৃঃ সং ৪

২০। রবীন্দ্রনাথকে লিখিত প্রভাতকুমারের ১২ই কার্ত্তিক, ১৩০২ সালের পত্রাংশ - দেশ, সাহিত্য সংখ্যা, ১৩৭৫ পৃঃ সং ১৫৩

২১। ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ পৃঃ সং ১৫৩

২২। ঐ ঐ ঐ ১৬ বৈশাখ, ১৩০২ ঐ ঐ পৃঃ ১৪৬

২৩। ঐ ঐ ঐ ১৭ ফাল্গুন, ১৩০১ ঐ ঐ পৃঃ ১৪৪

২৪। ঐ ঐ ঐ ১৯ চৈত্র, ১৩০১ ঐ ঐ পৃঃ ১৪৪

২৫। হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (তৃতীয় খন্ড)–মন্মথনাথ ঘোষ পৃ: সং ৪০৮ (পরিশিষ্ট সংযোজিত প্রভাত কুমারের 'স্মৃতিকথা'র অংশবিশেষ।

২৬। রবীন্দ্রনাথকে লিখিত প্রভাতকুমারের ২৮ মাঘ, ১৩০১ সালের পত্রাংশ - দেশ, সাহিত্যসংখ্যা, ১৩৭৫ পৃ: ১৪৩

২৭। ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ

২৮। ঐ ঐ ঐ ২৯চৈত্র, ১৩০১ সালের পত্রাংশ ঐ পৃ: ১৪৪

২৯। ঐ ঐ ঐ ১৬ বৈশাখ, ১৩০২ ঐ ঐ পৃ: ১৪৫

৩০। ঐ ঐ ঐ ১২ বৈশাখ, ১৩০২ ঐ ঐ পৃ: ১৪৬

৩১। ঐ ঐ ঐ ১৮ কার্ত্তিক, ১৩০২ ঐ ঐ পৃ: ১৫৪

৩২। ঐ ঐ ঐ ৯ অগ্রহায়ণ, ১৩০২ ঐ ঐ পৃ: ১৭৩

৩৩। রবীন্দ্রনাথকে লিখিত প্রভাতকুমারের ১৮ জ্যৈষ্ঠ, ১৩০২ সালের পত্রাংশ, দেশ-সাহিত্য সংখ্যা, ১৩৭৫ পৃ: ১৪৭

৩৪। প্রভাত - কথা, — কৃষ্ণবিহারী গুপ্ত, বিচিত্রা — আষাঢ়, ১৩৩৯।

৩৫। রবীন্দ্রনাথকে লিখিত প্রভাতকুমারের ২২ বৈশাখ, ১৩০২ সালের পত্রাংশ - দেশ সাহিত্য সংখ্যা ১৩৭৫ পৃ: ১৪৬

৩৬। প্রভাত - কথা — কৃষ্ণবিহারী গুপ্ত, বিচিত্রা — আষাঢ়, ১৩৩৯

৩৭। রবীন্দ্রনাথকে লিখিত প্রভাতকুমারের ২৩ জ্যৈষ্ঠ, ১৩০২ সালের পত্রাংশ - দেশ, সাহিত্য সংখ্যা পৃ: ১৪৮

৩৮। ঐ ঐ ঐ ২৬ জ্যৈষ্ঠ, ১৩০২ সালের পত্রাংশ-ঐ-পৃ: ১৪৮ - ১৪৯

৩৯। ঐ ঐ ঐ ২৯ জ্যৈষ্ঠ, ঐ ঐ ঐ পৃ: ১৪৯

৪০। প্রভাতকুমার : জীবন ও সাহিত্য'গ্রন্থে ডা শিবেশকুমার চট্টোপাধ্যায় এ বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা করেছেন।

৪১। রবীন্দ্রনাথকে লিখিত প্রভাতকুমারের ১৬ আষাঢ়, ১৩০২ সালের পত্রাংশ - দেশ, সাহিত্যসংখ্যা পৃ: ১৫০

৪২। ঐ ঐ ঐ ১১ ফাল্গুন, ১৩০২ ঐ ঐ পৃ: ১৫৫

৪৩। ঐ ঐ ঐ ১৬ আষাঢ়, ১৩০২ ঐ ঐ পৃ: ১৫০

৪৪। মনীষা মন্দিরে — কৃষ্ণবিহারী গুপ্ত, সঙ্কল্প, অগ্রহায়ণ, ১৩২১।

৪৫। ঐ ঐ ঐ ঐ

৪৬। রবীন্দ্রনাথকে লিখিত প্রভাতকুমারের ১৬ আশ্বিন, ১৩০২ সালের পত্রাংশ - দেশ, সাহিত্যসংখ্যা ১৩৭৫ পৃ:১৫২

৪৭। ঐ ঐ ঐ ১১ ফাল্গুন, ১৩০২ সালের পত্রাংশ ঐ পৃ: ১৫৫

৪৮। ঐ ঐ ঐ ২৪ ফাল্গুন, ১৩০২ ঐ ঐ পৃ: ১৫৬

৪৯। ঐ ঐ ঐ ১১ ফাল্গুন ঐ ঐ ঐ পৃ: ১৫৫

৫০। ঐ ঐ ঐ ১২ চৈত্র, ১৩০২ ঐ ঐ পৃ: ১৫৮

৫১। রবীন্দ্রনাথকে লিখিত প্রভাতকুমারের ২৩ আষাঢ় ১৩০৩ সালের পত্রাংশ - দেশ -সাহিত্য-সংখ্যা ১৩৭৫ পৃঃ ১৬১

৫২। ঐ ঐ ঐ ১৪ আষাঢ়, ১৩০৩ ঐ ঐ ঐ পৃঃ ১৬০

৫৩। ঐ ঐ ঐ ২৬ আশ্বিন, ১৩০৩ ঐ ঐ ঐ পৃঃ ১৬২

৫৪। ঐ ঐ ঐ ২২ ফাল্গুন ১৩০৩ ঐ ঐ ঐ পৃঃ ১৬৩

৫৫। হেমচন্দ্র (তৃতীয় খণ্ড)— মন্মথনাথ ঘোষ, পৃঃ সং ৪০৮ (পরিশিষ্টে সংযোজিত প্রভাতকুমারের স্মৃতিকথার অংশ বিশেষ)

৫৬। সম্পাদকের নিবেদন — প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়' মানসী ও মর্ম্মবাণী, মাঘ, ১৩৩২ পৃঃ সং ৬৭১ - ৬৭২

৫৭। রবীন্দ্রনাথকে লিখিত প্রভাতকুমারের ১৫ মাঘ, ১৩০৪ সালের পত্রাংশ - দেশ, সাহিত্যসংখ্যা ১৩৭৫, পৃঃ ১৬৪

৫৮। নববর্ষের নিবেদন - প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় ,'মানসী ও মর্ম্মবাণী' ফাল্গুন , ১৩৩২

৫৯। সাহিত্য সাধক চরিতমালা (৫৪ নং পুস্তিকা) ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় - পৃঃ ৬

৬০। প্রভাত গ্রন্থাবলী (চতুর্থ খণ্ড) শ্রীভবন প্রকাশিত। সনৎকুমার গুপ্ত লিখিত 'গ্রন্থপরিচয়' বিভাগ পৃঃ ৫৬৮

৬১। প্রভাতকুমারের পৌত্র কলিকাতা নিবাসী শ্রীযুক্ত মিহির কুমার মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের সঙ্গে সাক্ষাৎকারে এই সংবাদ জানা যায়।

৬২। রবীন্দ্রনাথকে লিখিত প্রভাতকুমারের ২১ভাদ্র, ১৩০৫ সালের পত্রাংশ - দেশ, সাহিত্য সংখ্যা ১৩৭৫, পৃঃ ১৬৪

৬৩। ঐ ঐ ঐ ৪ চৈত্র, ১৩০৫ ঐ ঐ ঐ পৃঃ ১৬৪ - ১৬৫

৬৪। মনীষামন্দির — কৃষ্ণবিহারী গুপ্ত, সংকলন, অগ্রহায়ণ, ১৩২১

৬৫। রবীন্দ্রনাথকে লিখিত প্রভাতকুমারের ২৪ জ্যৈষ্ঠ, ১৩০৬ সালের পত্রাংশ- দেশ, সাহিত্যসংখ্যা ১৩৭৫, পৃঃ ১৬৬

৬৬। ঐ ঐ ঐ ১৮ আষাঢ়, ১৩০৬ ঐ ঐ ঐ ঐ পৃঃ ১৬৬

৬৭। ঐ ঐ ঐ ৬ আশ্বিন, ১৩০৬ ঐ ঐ ঐ ঐ পৃঃ ১৬৭

৬৮। পত্রটি অদ্যাপি অপ্রকাশিত, বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের রবীন্দ্র সদনে সংরক্ষিত।

৬৯। রবীন্দ্রনাথকে লিখিত প্রভাতকুমারের ১ পৌষ, ১৩০৬ সালের পত্রাংশ- দেশ, সাহিত্য সংখ্যা ১৩৭৫ পৃঃ ১৬৯

(উল্লিখিত অংশটি বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের রবীন্দ্র সদনে রক্ষিত মূল পত্রটিতে বিধৃত হয়েছে)

৭০। রবীন্দ্রনাথকে লিখিত প্রভাতকুমারের ১পৌষ, ১৩০৬ সালের পত্রাংশ - দেশ, সাহিত্যসংখ্যা ১৩৭৫ পৃঃ ১৬৯

৭১। ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ

৭২। ঐ ঐ ঐ ঐচৈত্রঐ ১৩০৬ সালের পত্রাংশ ঐ ঐ পৃঃ ১৬৯

৭৩। ঐ ঐ ঐ ২৫ আশ্বিন, ১৩০৬ ঐ ঐ ঐ ঐ পৃঃ ১৬৭

৭৪। ঘরের কথা -ফটিক চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। প্রভাতকুমার লিখিত ভূমিকা অংশ পৃঃ ৮/.

হেমেন্দ্র কুমার রায় , পৃ: সং ৭৩।

৭৬। প্রভাত স্মৃতি – মন্মথনাথ ঘোষ , পথ৩পুষ্প , আশ্বিন , ১৩৩৯ ।

৭৭। য়ুরোপে পদার্পণ – প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় , প্রবাসী , জ্যৈষ্ঠ , ১৩১৫ ।

৭৮। ঐ – ঐ ঐ

৭৯। ঐ – ঐ ঐ

৮০। ঐ – ঐ ঐ

৮১। ঐ – ঐ ঐ

৮২। ঐ – ঐ ঐ

৮৩। ঐ – ঐ ঐ

৮৪। ঐ – ঐ ঐ

৮৫। ঐ – ঐ ঐ

৮৬। ঐ – ঐ ঐ

৮৭। ষ্ট্রাট্ফোর্ড - অন -এভ্নে একবেলা – প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় , ভারতী , ভাদ্র ১৩১০।

৮৮। ঐ ঐ ঐ ঐ

৮৯। ব্রাইটন – প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় , প্রবাসী , পৌষ , ১৩১৫ ।

৯০। বিলাতী থিয়েটার – প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় , প্রবাসী , ভাদ্র ১৩১৩।

৯১। রাজ কাহিনী – ~~প্রভাতকুমার~~ প্রভাতগ্রন্থাবলী (চতুর্থ খন্ড) শ্রীভবন প্রকাশিত পৃ: সং ৪৫৭

৯২। রমেশচন্দ্র স্মৃতি — ঐ (চতুর্থ খন্ড) ঐ পৃ:সং ৫৩৮

৯৩। প্রভাত - স্মৃতি – মন্মথনাথ ঘোষ , পথ৩ পুষ্প , আশ্বিন ১৩৩৯।

৯৪। রবীন্দ্র - সঙ্গমে – সতীশ চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় , মানসী , মাঘ ১৩২১ ।

৯৫। ইংরাজ রমনী – প্রভাতগ্রন্থাবলী (চতুর্থ খন্ড) শ্রীভবন প্রকাশিত পৃ: সং ৪৪৯

৯৬। প্রভাতকুমারের পৌত্র কলিকাতানিবাসী শ্রীযুক্ত মিহিরকুমার মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের সঙ্গে সাক্ষাৎকার ।

৯৭। ঐ ঐ ঐ ঐ

৯৮। অনুসন্ধান করে এখানে প্রভাতকুমারের দেওয়া কোন বইয়ের সন্ধান পাওয়া যায় নাই। সম্ভবত:সেইগুলি স্থানান্তরিত অথবা বিনষ্ট হয়েছে ।

৯৯। রমেশচন্দ্র স্মৃতি – প্রভাত গ্রন্থাবলী(তৃতীয় খন্ড) শ্রীভবন প্রকাশিত , পৃ: সং ৫৪৬

১০০। সাহিত্য জিজ্ঞাসা – সরলাবালা সরকার (প্রকাশক, মিত্র ও ঘোষ)পৃ: সং ৫৬ - ৫৭।

১০১। ঐ ঐ ঐ ঐ

১০২। ঐ ঐ ঐ ঐ

১০৩। রঙ্গপুরশাখা সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা(ত্রৈমাসিক)– প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগ (১৩১৩ - ১৩১৪)

১০৪। ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ

XXXX (রঙ্গপুর শাখার প্রথম সাংবৎসরিক কার্য্য বিবরণী (১৩১৩) পৃ ৵ – ॥৵)

১০৫। প্রভাত - কথা – কৃষ্ণবিহারী গুপ্ত , বিচিত্রা , আষাঢ় , ১৩৩৯ ।

১০৬। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ রংপুর শাখার প্রথম সাম্বৎসরিক কার্য্য বিবরণী (১৩১৩)

পৃ: নং ৮৫ তে উল্লেখিত হয়েছে — 'সাধারণ সভ্য প্রথম শ্রেণি' স্তম্ভে ক্রমিক নং ১২ তে 'প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় , বার - অ্যাট -ল , ডাকবাঙ্গলা , রঙ্গপুর ।'

১০৭। প্রভাতকুমারের পৌত্র কলিকাতানিবাসী শ্রীযুক্ত মিহির কুমার মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের সঙ্গে সাক্ষাৎকার ।

১০৮। উনিশ শতকের সমাজ ও সংস্কৃতি - অমিতাভ মুখোপাধ্যায় পৃ: ১৬২

১০৯। ঐ ঐ ঐ ঐ পৃ: ১৬৪

১১০। ভারতে জাতীয় আন্দোলন - প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় পৃ: ৯৬

১১১। ঐ ঐ পৃ: ৯৬

১১২। ঐ ঐ পৃ: ৯৯

১১৩। বঙ্গবিভাগ — রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর , বঙ্গদর্শন, জ্যৈষ্ঠ , ১৩১১ ।

১১৪। উকীলের বুদ্ধি — প্রভাত গ্রন্থাবলী-(তৃতীয় খন্ড) শ্রীভবন প্রকাশিত পৃ: ৭০

১১৫। ঐ ঐ (ঐ) ঐ পৃ: ৭৪

১১৬। খালাস — ঐ (ঐ) ঐ পৃ: ১১৭

১১৭। ঐ ঐ (ঐ) ঐ পৃ: ১২১

১১৮। ঐ ঐ (ঐ) ঐ পৃ: ১২২

১১৯। শ্রদ্ধেয় ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর 'সাহিত্য - সাধক -চরিত মালা - ৫৪ নং পুস্তিকায় (২য় সং পৌষ, ১৩৭০ পৃষ্ঠা নং ৮) প্রভাতকুমারের গয়া গমন সম্বন্ধে' ব্যারিষ্টারী' শিরোনামায় উল্লেখ করেছেন , 'গয়া তাঁহার কর্মস্থল হয় (মে,১৯০৮)' কিন্তু বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ রঙ্গপুর শাখার তৃতীয় বর্ষ অষ্টম মাসিক অধিবেশন, স্থান রঙ্গপুর টৌন হল গৃহ রবিবার, ৩২ জ্যৈষ্ঠ, ১৩১৫ বঙ্গাব্দ , ১৪ জুন , ১৯০৮, সময় অপরাহ্ন ৫।। . টা , উপস্থিত ব্যক্তিগণের তালিকায় শ্রীযুক্ত প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় , বার - অ্যাট - ল, সভাপতি' হিসাবে ছিলেন । ঐ সভাতেই তিনি রঙ্গপুর ত্যাগ করে গয়া গমনের কথা ঘোষণা করেন । অতএব প্রভাতকুমার ১৪ জুন, ১৯০৮ অব্দি রঙ্গপুরে ছিলেন একথা সহজেই বোঝা যায় ।

১২০। প্রভাতকুমারের পৌত্র কলিকাতানিবাসী শ্রীযুক্ত মিহির কুমার মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের সঙ্গে সাক্ষাৎকার ।

১২১। পরলোকে প্রভাতকুমার — শ্রীচারুচন্দ্র মিত্র এম.এ, বি.এল, পঞ্চপুষ্প , চৈত্র, ১৩৩৮।

১২২। প্রভাত স্মৃতি - মন্মথনাথ ঘোষ , পঞ্চপুষ্প , আশ্বিন , ১৩৩৯ ।

১২৩। ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ

১২৪। সামগ্রিক দৃষ্টিতে প্রভাতকুমার — বিভূতি ভূষণ মুখোপাধ্যায় পৃ: ৩৪ - ৩৬

১২৫। রত্নদীপ — প্রভাত গ্রন্থাবলী (তৃতীয় খন্ড) শ্রীভবন প্রকাশিত পৃ: ২৫০ - ২৫১

১২৬। প্রভাত - স্মৃতি — মন্মথনাথ ঘোষ, পথঃপুষ্প , আশ্বিন ১৩৩৯।

১২৭। ঐ ঐ ঐ ঐ

১২৮। নেড়ী ডাক্তার — প্রভাতগ্রন্থাবলী (চতুর্থ খন্ড) শ্রীভবন প্রকাশিত পৃঃ ৯৭।

১২৯। পুণ্য স্মৃতি — সীতা দেবী পৃঃ ৪৭

১৩০। প্রভাত - গ্রন্থাবলী (ষষ্ঠ খন্ড) — শ্রীভবন প্রকাশিত পৃঃ ৪৩৩ - ৪৩৪

১৩১। যাঁদের দেখেছি — হেমেন্দ্র কুমার রায় পৃঃ ৮৯ — ৯০

১৩২। অমৃতলাল বসুর জীবনী ও সাহিত্য — ডঃ অরুণ কুমার মিত্র , পৃঃ ১১২

১৩৩। যাঁদের দেখেছি — হেমন্দ্র কুমার রায় - পৃঃ ৭৬

১৩৪। ঐ ঐ পৃঃ ৭৬

১৩৫। ঐ ঐ পৃঃ ৭৬

১৩৬। প্রভাত - স্মৃতি — মন্মথনাথ ঘোষ , পথঃপুষ্প , আশ্বিন , ১৩৩৯

১৩৭। প্রভাতকুমারের পৌত্র শ্রীমিহির কুমার মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের সঙ্গে সাক্ষৎকার।

১৩৮। University of Calcutta, The calender for the year 1917 Part I, Chapter VI., University Law College - page 119

১৩৯। University of Calcutta, The Calender for the year 1931, University Law College, Chapter IX - page 210

১৪০। Calcutta University Calender 1932 — page 214.

১৪১। প্রভাতরবি — শ্রীভবতোষ ভট্টাচার্য , দেশ (সাপ্তাহিক সাহিত্য) ২৫ জ্যৈষ্ঠ, ১৩৭৫ পৃঃ ৭১০ - ৭১১

১৪২। সামগ্রিক দৃষ্টিতে প্রভাতকুমার — বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায় পৃঃ৪৩ - ৪৪

১৪৩। ঐ ঐ পৃঃ ৩৭ - ৩৮

১৪৪। ঐ ঐ পৃঃ ৩৮

১৪৫। ঐ ঐ পৃঃ ৩৯

১৪৬। যাঁদের দেখেছি — হেমন্দ্রকুমার রায় পৃঃ ৭৭

১৪৭। ঐ ঐ পৃঃ ৭৭

১৪৮। চলমান জীবন — পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায় পৃঃ ১৪৬

১৪৯। ঐ ঐ পৃঃ ১৪৬ - ১৪৭

১৫০। ঐ ঐ পৃঃ ১৪৮

১৫১। ঐ ঐ পৃঃ ১৪৮

১৫২। বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস (চতুর্থ খন্ড) — সুকুমার সেন , পৃঃ ১৬৯

১৫৩। প্রভাত প্রয়াণে — কিরণ বালা দেবী সরস্বতী , পথঃপুষ্প , জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩৯

১৫৪। সম্পাদকের নিবেদন — প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, মানসী ও মর্ম্মবাণী ১৩৩২ পৃঃ ৬৭

১৫৫। ঐ ঐ ঐ

১৫৬। প্রভাত স্মৃতি – মন্মথনাথ ঘোষ , পথঃপুষ্প , আশ্বিন, ১৩৩৯

১৫৭। ঐ ঐ ঐ ঐ

১৫৮। ঐ ঐ ঐ ঐ

১৫৯। ঐ ঐ ঐ ঐ

১৬০। প্রভাতকুমারকে লিখিত রবীন্দ্রনাথের ১৬ ই অগ্রহায়ণ, ১৩১৮ তারিখের পত্র
দেশ, সাহিত্য সংখ্যা ১৩৭৫ পৃঃ ১৭৬

১৬১। প্রভাত গ্রন্থাবলী (তৃতীয় খন্ড)-শ্রীভবন প্রকাশিত , গ্রন্থ পরিচয় বিভাগ পৃঃ ৫৫৩

১৬২। প্রবাসী – জ্যৈষ্ঠ, ১৩১৬

১৬৩। প্রভাতকুমারের পৌত্র কলিকাতানিবাসী শ্রীযুক্ত মিহিরকুমার মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের
সঙ্গে সাক্ষাৎকার ।

১৬৪। ঐ ঐ ঐ ঐ

১৬৫। পরলোকে প্রভাতকুমার – শ্রীচারুচন্দ্র মিত্র , পথঃপুষ্প , চৈত্র, ১৩৩৮

১৬৬। The modern Review for May, 1932 - page 596

১৬৭। পরলোকে প্রভাতকুমার – পুষ্পপাত্র (সাময়িক প্রসঙ্গ), বৈশাখ ১৩৩৯ পৃঃ ১০১

১৬৮। কথাশিল্পী প্রভাতকুমার } – শ্রীকালিদাস রায় , উপাসনা , বৈশাখ ১৩৩৯ পৃঃ ২৩ - ২৪

১৬৯। ভারতবর্ষ - বৈশাখ, ১৩৩৯ পৃঃ ৮৩১ - ৮৩২

১৭০। প্রবাসী – বৈশাখ, ১৩৩৯ পৃঃ ১৪৬

১৭১। মাসিক বসুমতী – চৈত্র, ১৩৩৮ পৃঃ ১০৪৭ - ৪৮

১৭২। দৈনিক যুগান্তর ৩১ শে জানুয়ারী, ১৯৭৩ ।

১৭৩। সাহিত্যিক বর্ষপঞ্জী ১৩৮০ (তৃতীয় বর্ষ, তৃতীয় খন্ড) সম্পাদক অশোক কুন্ডু পৃঃ ২১৮

১৭৪। সাহিত্য - পরিষৎ পত্রিকা (ত্রৈমাসিক) অশীতিতম বর্ষ, ১ম সংখ্যা , বৈশাখ-আষাঢ়,
১৩৮০।

—